চন্দনরেখা

অনিতা অগ্নিহোত্রী

It isn't cover

banglabooks.in

চন্দনরেখা

অনিতা অগ্নিহোত্রী

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.banglabooks.in
Click here

—ষাট টাকা—

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন—কৃষ্ণেন্দু চাকী

মুদ্রণ—ইম্প্রেশান হাউস

CHANDANREKHA

A collection of short stories by Sm. Anita Agnihotri.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd,
10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073

Price Rs. 60/-

ISBN : 81-7293-395-9

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ নিরালা প্রেস, ৪, কৈলাস মুখার্জি লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅনিল কুমার চট্টোপাধ্যায়
মা ও বাবা-কে,
মানুষ ও সাহিত্যকে ভালোবাসতে
যাঁদের কাছে শিখেছি।

এই লেখকের অন্যান্য বই

চন্দন গাছ (কবিতা)
বৃষ্টি আসবে (কবিতা)
চক্রব্যূহ (গল্পগ্রন্থ)
আকিম ও পরীকন্যে (গল্পগ্রন্থ)
আকিম ও দ্বীপের মানুষ (উপন্যাস)
সাঁজোয়া বাহিনী যায় (কবিতা)
মহুলডিহার দিন (উপন্যাস)

সূচীপত্র

চন্দনরেখা ১
নিরুদ্দেশ যাত্রা ৪৬
সুখ-দুঃখের ছবি ৬১
ফানুস ৭১
প্রত্নবিষাদ ও জল ৮৩
অঘ্রাণের স্বর ৯১
অলীক বসন্তদিন ১০৩
রূপনগরের কোজাগর ১১২
সুদে-আসলে ১২০
বন পাহাড়ের রাজা ১৩০
পদাতিক ১৩৭
তুমি কবে আসবে ১৪৬
দেহরক্ষী ১৫৪

চন্দনরেখা

পারিজাত

নয়ানজুলির এ পারে
আমি আজ এক সকালকে কুড়িয়ে পেয়েছি
চুমো খেয়েছি তার ভিজে চোখের পাতায়
নীল পাথরের মতো ঠাণ্ডা তার দুই ঠোঁট
জাগেনি।
বুকের খাঁচায় কান রেখে শুনেছি
নিঃস্তব্ধ।
চুলে তার রক্তের পিছল গন্ধ
বাহুতে রক্তের উল্কি
স্পন্দহীন শূন্যতা তার দুই চোখের মণিতে
লিখে রেখেছে
গত রাত্রের যুদ্ধের কাহিনী
সাইরেন…পাতা পোড়ার গন্ধ…সিপ্লনটার
নয়ানজুলির ধারে
আমার দুই পা গেঁথে গেছে আজানু দুঃস্বপ্নে
আকাশ থেকে দ্রুত নেমে আসছে
বর্ষার মতন খরা, খররোদ ও বোমারু বিমানের তলপেট।
ধানের দুধের গন্ধে, হায়, সকাল জাগবে না আর!

এই কবিতাটা কবে লিখেছিলাম এখন আর মনে নেই। বোধহয় জাজমেণ্ট লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে কোনও এক মাঝরাতে। কিছুদিন পর ১৪৫-এর একটা কেস-এর অর্ডারের নকল বার করতে গিয়ে আমার পেশকার শিবু ওটা পায়। অবশ্য পড়তে পারেনি, ভেবেছে ব্যক্তিগত চিঠি হবে কোনও। সকালে উঠে দেখি বাইরের বারান্দায় উদ্ভাসিত মুখে দাঁড়িয়ে। 'আপকা এক বহোৎ জরুরি কাগজ ফাইলওয়াকে আন্দর রহ গয়া থা। হমনে নিকাল লিয়া।' ওকে থ্যাংকু বলে বিদায় করে আবার কবিতাটা পড়লাম।

আমাদের এই সারাণ্ডাঘাটে সকাল বড় সুন্দর। দু'চোখের সামনে বেতোয়ার বাঁধের সবুজ জল সকালের রোদ লেগে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। যতদূর চোখ যায় নিবিড় ময়ূরকণ্ঠী জল—মাঝে মাঝে পিঙ্গল ডুবো পাথর মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে। তিরিশ বছর আগে এখানে গ্রাম ছিল, গোপালপুর, হায়াগঞ্জ, মোতিয়া…মানুষ জন ছিল, তাদের ঘরদুয়ার, সুখদুঃখ। বেতোয়ার

খর জলস্রোতে জীবনের উত্তাপে ভরা সেই সভ্যতার ছবি কোথায় তলিয়ে গেছে। সরকারি ক্ষতিপূরণের টাকা গুনে নিয়ে ম্লান মুখে পরিবারকে পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়ে চলে গেছে অন্য গাঁয়ে বসত করতে। কেই বা জানে তারা আজ কোথায়? এখন চারিধারে শুধু গাছেদের অস্পষ্ট বার্তালাপ। আকাশের ঘননীল, জলের গন্ধ হাওয়ায়। দারাং পাহাড়ের ওপরের জঙ্গলে অজস্র বন্য পাখির কোলাহল—ঝাপসা সুগন্ধের মতন সেই শব্দ এই বারান্দা পর্যন্ত ভেসে আসছে। বাঁধকে আদরের মতো ঘিরে আছে নিশ্চিন্ত দারাং পাহাড়। গলা পর্যন্ত শরীর জলে ডুবিয়ে। নীচের জঙ্গলে পোড়াপাতার স্তূপে কেউ আগুন দিয়ে থাকবে—গন্ধটা ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে আসছে—সমস্ত আবহাওয়ায় একটা গা-শিরশিরানিভাব, মন-কেমন করা দিন।

এই জল আর জঙ্গল যেন ক্রমশই আমাকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে আমার স্বপ্নের শহরের থেকে দূরে। কলকাতা আজকাল কেবল স্বপ্নেই আসে। যে সময়ের স্মৃতিতে কবিতাটা লিখেছিলাম—সেই সময়ও জলরঙের ছবির মন ফিকে হয়ে এসেছে। কবিতাটা এখন পালকের মতন হালকা…ওর কোনও দায় নেই…উড়িয়ে দিই? উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করল। বাঁধের জল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না…নীচের গাছগাছালির ঝোপে আটকে থাকবে।

জগ্গু পিওন নীচের ঘোরানো রাস্তা ধ'রে সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে উঠে আসছে। বেগুনি গামছায় কপালের ঘাম মুছে গুনে গুনে সাতটা চিঠি দিল। আর একটা টেলিগ্রামের কাগজ। টেলিগ্রামটা সন্তু সই করে টেবিলের ওপর রেখেছে। বেরবার আগে দেখে নিলাম। হিন্দিতে পাঠিয়েছে টেলিগ্রামটা। পড়তে পড়তে নিজের অজান্তেই ভুরুদুটো কুঁচকে উঠল—শব্দগুলো মাথার মধ্যে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে—

'রতন ঘাসির মৃত্যু চাই'

মুন্না যাদব ॥

ফোনরুম থেকে বেরিয়ে ক্লান্ত হরদয়ালবাবু বললেন, ডি এস পি টাউনে নেই। কোথায় গেছেন তাও কোন ডিউটি বলতে পারছে না। কাকে লাগাব?

ঘণ্টাখানেক পর, কোর্টে ঢুকব, ইন্সপেকটর রামদহিনবাবু দেখলাম ওঁর পুরনো রাজদূতে গাঁক গাঁক করতে করতে আসছেন। বিশাল দেহ, পুরুষ্টু সাদা পাকানো গোঁফ, মাথার চুল বিরল ও সাদা, মুখ পরিষ্কার কামানো, অতি শান্ত। ভুরু না কুঁচকেই টেলিগ্রামের কাগজটা দেখলেন। তারপর বললেন—স্যার, মনে পড়ছে না। বাড়িডির ও সি কিছু রিপোর্ট করেনি রিসেণ্টলি। কোনও ক্র্যাশ বা কিছু। আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এখুনি খোঁজ নিচ্ছি।

তিনটে বাজতে চলল। শেষ কেসটায় ক্রস এগজামিনেশন লম্বা হতে হতে অবান্তর হয়ে উঠেছে। দু'বার উকিলকে তাড়া দিলাম। হরদয়ালবাবু টেবিলের ওপর গতানুগতিক চিরকুট পাঠালেন—সার, অব্ থোড়া জলদি উঠা যায়।

অফিসে হরদয়ালবাবু রীতিমতন অভিভাবক। ওঁকে কে যেন সম্প্রতি বলেছে তিনটের পর লাঞ্চ খেলে আমাকে পেপটিক আলসার ধরতে পারে। দেরি হলেই চিরকুট পাঠিয়ে দেন এবং মানা করলেও শোনেন না। উস্কো-খুস্কো চুলে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ফোনরুমের পাখাটা ভাল চলে না। আঠাশ বছর হল। এবার বদলাতে হবে গ্রীষ্মের আগে।

'সামন্তপুর থেকে জি এম ফোন করছেন। তিনবার ট্রাই করে লাইন দিল...'

ফোনের মধ্যে প্রচুর শব্দ, শোঁ শোঁ আওয়াজ। ম্যানুয়াল এক্সচেঞ্জ, ফোন করা এবং পাওয়া নরকযন্ত্রণার মতন দীর্ঘ ও কষ্টকর। জি এম বোধহয় কপালের শির ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছেন। গুড আফটারনুন—নমস্তে জি! স্যার! প্রভু সিং-এর ইউনিয়ন পরশু থেকে স্ট্রাইকের কল দিয়েছে—হ্যাঁ, আবার ওপেন কাস্টএ, স্যাবোটেজ নট রুল্‌ড্ আউট—দয়া করে ফোর্স পাঠিয়ে দেবেন, উইথ ম্যাজিস্ট্রেট—মরে যাব না হলে।

চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে ফোর্স চাইছেন। পুরো দু'প্লাটুন লেগে যাবে ওপেন কাস্টে। আগে জানান না কেন?

'হ্যালো? হাঁ জি। আজই ওদের ক্লোজড্ ডোর মিটিং-এ ঠিক হল। আজই। আমি এস পিকে ট্রাই করছি একঘণ্টা হল। আপনি একটু কাইণ্ডলি বলবেন। রাখছি। নমস্তে।'

বেদপ্রকাশের কোনও খবর নেই। আর একটা ব্যস্ত দিন শেষ হল। পাখিরা উড়ে চলেছে দারাং পাহাড়ের জঙ্গলের দিকে...তাদের বাসায়। কালচে সবুজ জলরাশিতে ভেঙে চুরমার হতে থাকে উড়ন্ত ছায়ারা। সূর্য ডুববে। লাল আলোয় মায়াবী হয়ে উঠছে পৃথিবী। বেতোয়ার ব্যারেজের ওপর সোডিয়াম আলোগুলো জ্বলে উঠল। চেকপোস্টের একটু নীচে একটা খালি ড্রেজার ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। জিপটা টিলার ওপর চড়ছে আস্তে আস্তে। আমার অফিসঘরের খালি আলো জ্বলছে—বাকি সারা বাড়িটা অন্ধকার। বারান্দায় বসে লখন নিবিষ্টচিত্তে হ্যারিকেনের কাচ পরিকার করে চলেছে। পরিধানে শুধুই একটা লুঙ্গি। ভাবেনি আমি এত তাড়াতাড়ি এসে যাব, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'সন্ধেবেলা আলো জ্বালাও না কেন ঘরে?'

আজ কি অসময়ে বৃষ্টি হবে? লাইন করে পিঁপড়েরা চলেছে দেওয়াল জুড়ে কোণাকুণি। বাথরুমের চৌকাঠের সামনে তিনটে ব্যাঙ বসে। শোওয়ার ঘরে শ্রীকৃষ্ণের ছবি। স্নান সেরে রোজ প্রণাম করার কথা এখানে। মা নিজেই টাঙিয়ে দিয়ে গেছেন গতবার। প্রথমদিকে অনেক বেনামী চিঠিপত্র আসত। অপাঠ্য হাতের লেখা। ভুলভাল ভাষা। বেশির ভাগই থ্রেট্‌নিং। রাত্রে ব্যারেজের ওপর গেলে বোমা মারা হবে। কোর্টরুমে অদৃশ্য আততায়ী লুকিয়ে থাকবে। চার নম্বর মাইনস্-এ গেলে লাশ ফেলে দেব ইত্যাদি।

অবশ্য আমি কখনও বাবা-মাকে জানাইনি এসব কথা। মনে হয় বেদপ্রকাশের বউ ইঙ্গিত দিয়ে থাকবে মা-কে। বেদপ্রকাশ দেখতে চেয়েছিল চিঠিগুলো একসময়।

'ঠাকুরের ছবিতে প্রণাম করবি রোজ। সকালে বেরবার সময় একবার আর একবার সন্ধেবেলা ঘরে এসে।' কী একটা স্তবও কয়তে বলেছিল, মা-র হাতের লেখা কাগজটা হারিয়ে ফেলেছি।

খাবার টেবিলের কাছে বিব্রত লখন দাঁড়িয়ে। আজ কী বানাব? ওঃ, রোজ রোজ এই এক ঝামেলা! ওকে সব বলে দিতে হবে। আলু না বেগুন, ঝিঙে না পটল। কিসের সঙ্গে কী চলে আর কী চলে না আমি কি জানি? লখনের রান্নাটা বেশ প্রাগৈতিহাসিক ধাঁচের। একবার পুঁইশাক রেঁধেছিল ঢেঁড়স দিয়ে। লখন একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল—'দুপুরে মাঈজি এসেছিল। দুটো কী বেঁধে রেখেছে।'

'নিয়ে আয় দেখি! রোজ রোজ মাঈজিকে দিয়ে বাঁধাস কেন?'

'আমি মানা করেছিলাম।' লখন দুটো ছোটো বাটি টেবিলের ওপর রাখে। ঝিঙে আলু পোস্ত। কুমড়োর তরকারি। 'শুনল না মাঈজি।'

'তবে আর কী, ব্যস্! তুমি খালি রুটি বানাও, তাহলেই হবে!'

জ্যোৎস্নাদেবী তা হলে আজও এসেছিলেন। বিছানার চাদর টান-টান। আলনার জামাকাপড়গুলো নিভাঁজ নিশ্চিন্ত। টেবিলে ধুলো নেই। মাঝে মাঝে দু'তিনদিন একটানাও আসেন। আমি থাকলে পারতপক্ষে আসেন না। তবু মাঝে মাঝে দেখা হয়েই যায়। জিনিসটা কলোনির সবাই ভাল চোখে নেয় না। কেউ কেউ বলে, তেল লাগাতে আসে। বেদপ্রকাশের বউ সীমা বলে ওদের সঙ্গে আমাদের আবার মেশামেশি কী, হেডক্লার্কের বউ! আকাশের চাঁদ চায় নাকি!

চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে আছেন ভদ্রমহিলা। অথচ টুঁশব্দটি নেই মুখে, মাসের শেষ কটা দিন কী করে কাটান প্রতিবেশীরাও জানতে পারে না। এসব হল সন্তুর নিউজ সার্ভিস। আমায় কখনও নিজের সংসারের বৃত্তান্ত বলেন না জ্যোৎস্নাদেবী। আমিই দু-একবার ওঁকে বলেছি, কেন কষ্ট করেন রোজ রোজ! লখন তো মন্দ রাঁধে না, আমার ভালই লাগে!

শুনে উনি অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়েছেন। কষ্ট! কষ্ট কী বাবা। এই তো আমাদের কাজ! ছেলেমেয়েদের জন্যও তো রাঁধি। তবে হ্যাঁ, তোমার জন্যে বাড়ি থেকে রেঁধে আনতে পারি না, গঙ্গাজলেই গঙ্গাপুজো সেরে নিই। হাসতে হাসতে বলেছেন, কাল অফিস যাবার সময় লখনকে দশটা টাকা দিয়ে যেও তো, মাংস রাঁধব একটু।

বাড়িতে ভাল জিনিস বেশি করে আনিয়েছি, ভেবেছি রান্না হয়ে গেলে ওঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। উনি নিয়ে যাননি। বুঝতে পেয়েছি ওঁদের আত্ম-সম্মানজ্ঞান অতি টনটনে। প্রতিদান দেবার কোনও রাস্তা নেই। একদিন দেখি, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি মাথায় বাগানে।

'আপনি এখানে কী করছেন ?'

'এই ঢেঁড়সের বীজ এনেছিলাম, লাগিয়ে দিয়ে যাই। তোমার মালি তো বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ার জোগাড় হল। বাড়িতে গিন্নি নেই আর সাহেব বাড়ি থাকেন না। এইসব আগাছা কেটে সাফ করিয়েছি ওকে দিয়ে।'

আমাদের দামোদর মালি কেন যে আজকাল এত মনমরা এবার বোঝা গেল।

'শীতকালে আলু পিঁয়াজের বিহন আনিও, লাগিয়ে দেব। ছ'মাস আলু পেঁয়াজের বাজারমুখো হতে হবে না। হাসছ যে, পেঁয়াজের কেজি কত করে জানো ?'

লখন ও পাশ থেকে বলে উঠল, 'হুজুর, সাড়ে চার টাকা।'

ব্যাটা নিষ্কর্মার ঢেঁকি, তরজার ধুয়ো দিতে আছেন।' বললাম, 'যাও মাসিকে ছাতা নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত দিয়ে এসো। বর্ষা বাড়ছে।'

মাসি শুনে মুখ টিপে হেসে চলে গেলেন। কালোপাড় শাড়ি পরা রোগা শরীরটা ছায়াটাকে সঙ্গে টানতে টানতে ঘোরানো পথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খেয়ে উঠে কন্ট্রোল রুমে ফোন করলাম। তারপর বেদপ্রকাশের বাড়িতে। প্রায় সাড়ে ন'টা বাজতে চলল। এখনও ফেরেনি। আশ্চর্য তো! সীমা, ওর বউ বলে, ওঁর তো ঘরে ঢুকতে ইচ্ছেই করে না, নেহাত আমাদের এই সারাণ্ডা-ঘাটে সরাইখানা নেই তাই ফিরে আসে। সীমা ভারি ঠোঁটকাটা মেয়ে, বাইরের লোকের সামনেই মাঝে মাঝে কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ে না। বেদপ্রকাশ অল্প অল্প হাসে—একেবারেই দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু বিগতস্পৃহ টাইপ। বড় বড় দুই চোখের মধ্যে কত কী যে ভাবনা চিন্তা খেলা করে হদিশ পাওয়া মুশকিল। তবে দারুণ স্মার্ট, কাজকর্মে অতি চৌকশ। প্রথম প্রথম এসে ওকে প্রায়ই সরকারি চিঠি লিখতাম। মাইনস-এ স্ট্রাইক। অজয়পুরে ঝাড়খণ্ড সমাবেশ। এক্সপ্লোসিভ। এ এম ডি ঘেরাও। আমরা আবার একটু লেখালিখি করতে ভালবাসি, যাকে বলে ব্রিনগিং-অন রেকর্ড। সব ঘটনাতেই বেদপ্রকাশ দ্রুত ও নিশ্ছিদ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং অ্যাকশন, তবে চিঠির কোনও জবাব আসেনি। বরং আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছে, স্যার, আপনি 'ডেকোরাম' চান না কাজ ? আমি কাজ করে দেব, কাগজ চালাচালি করে সময় নষ্ট করতে পারব না। জবাবটা সরল ও অসঙ্কোচ। এর ওপর আর কথাই চলে না।

এখানকার এই মাফিয়া-বেষ্টিত পরিমণ্ডলেও বেদপ্রকাশ টিকে আছে, এবং মন্দ করছে না। ওকে একবার নির্বাসনে পাঠাল তারণগঞ্জ। লোকে ভাবল ও পৈরবী নিয়ে পাটনা দৌড়বে, এস্টাবলিশমেণ্ট ক্লার্ককে ওবেরয় হোটেলে লাঞ্চে নিয়ে যাবে। সীমা আর বাচ্চাদের মুঙ্গেরে পাঠিয়ে হাড়কাঁপানো শীতে আর্মি স্টাইলে ওভারকোর্ট চাপিয়ে একটা ট্রাঙ্ক ও হোলডল নিয়ে বেদপ্রকাশ এসে হাজির তারণগঞ্জ। টিকে গেল বছর দুয়েক, দুঃসহ শীত, দুর্বিষহ গরম। বেদপ্রকাশের আর নড়ার নামগন্ধ নেই। তারণগঞ্জের মাফিয়া আবার দৌড়ল রাজধানী। ঘাড় থেকে ভূত কি নামে সহজে! দুই নেতার ঝগড়া লেগে গেল

শেষে। ব্যাটাকে ওখানে পাঠাতে কে বলেছিল! এবার তাড়াবে কী করে, তাড়াও! কালো কুচকুচে গোঁফের নীচে ধারালো হাসিটি শানিয়ে বেদপ্রকাশ এসে লাভ করল সারাণ্ডাঘাটে।

আজ ফিরতে বড্ড দেরি করছে বেদপ্রকাশ।

পরশু সামন্তপুরে স্ট্রাইক। ফোর্স-এর জন্য জয়েণ্ট মেসেজ যাবে জেলায়। আর সকালের সেই টেলিগ্রামটার জন্য তো ওকে কখন থেকে খুঁজছি।

রতন ঘাসির মৃত্যু চায় মুন্না যাদব। কে রতন ঘাসি? রতন ঘাসি একজন হরিজন। নেতা কি? কী ওর অ্যাকটিভিটি? ইণ্টেলিজেন্স-এর কোনও রিপোর্টে তো ওর নাম সম্প্রতি দেখিনি?

হু হু করে ঝোড়ো হাওয়া ছুটে আসছে বাঁধের বুক থেকে। ঝড় আসছে। আকাশটা গন গন করছে লাল। চৈত্র মাসে বৃষ্টি! উথাল পাথাল হয়ে যাচ্ছে নীচের জঙ্গল—কত পাখি যে বাসা ভেঙে মরে পিষ্ট হয়ে থাকবে ঘাসের ওপর—কত বৃক্ষশিশু মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে সোঁদা মাটির ওপর! তোলপাড় করা হাওয়া। লখন জানলাগুলো বন্ধ করতে আসছিল, ওকে মানা করলাম—ভিজুক, কীই বা ভিজবে এই ঘরে!

এগারোটা নাগাদ শুতে যাচ্ছি, নীচের রাস্তার জিপের শব্দ। লখনটা ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে রান্নাঘরের সামনে। দূরে ফটকের কাছে এসে জিপের লাল আলোটা দপ্‌দপ্‌ করছে। জিপ থেকে নেমে একজন গেট খুলল—বেদ-প্রকাশ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি, হাঁটতে হাঁটতে আসছে। ওর সারা শরীরে জল, রগ বেয়ে জলের ফোঁটা, বারান্দার বার্চ-এর নীচে স্যালুট করে এসে দাঁড়াল।

'আমার মেসেজটা পেয়েছিলেন সকালে?' আমি ওকে আশ্চর্য হয়ে দেখছি।

হ্যাঁ। হাসল বেদপ্রকাশ। হাতের রুমালটা দিয়ে বেশ করে মুছে নিল কপাল, ঘাড়।

'দেরি হয়ে গেল একটু, আপনি বোধহয় শুয়ে পড়েছিলেন। রতন ঘাসির বডিটা একেবারে পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে এলাম।'

জ্যোৎস্না

সন্ধেবেলা বাড়ি ঢুকছি, দেখি বড় মেয়ে লম্বা হয়ে খাটের ওপর শুয়ে, বুক পর্যন্ত চাদরটানা। জ্বরটর হ'ল নাকি? কপালে গলায় হাত ছোঁয়াতেই বিদ্যেধরী ফোঁস করে উঠলেন—আবার গেছিলে ওখানে?

গেছিলাম তো, তোর কোনও আপত্তি আছে?

নাঃ, বলে মেয়ে আমার বালিশের পাশ থেকে বই তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন, লোকে তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, আমায় না।

অফিস যায় বলে তনুর কাছ থেকে আমি কোনও কাজ পাই না। সকাল আটটা সাড়ে আটটায় ঘুম থেকে ওঠে, কোনও মতে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে এক কাপ চা খেয়েই সোজা অফিস। এক একদিন চান করে সন্ধেবেলা এসে। দুপুরে খোকনকে দিয়ে ডেকে পাঠাই তবে এসে খায়। চুলে তেল নেই, চিরুনি নেই। ওর বাবা ওর নাম আদর করে মুকুট রেখেছিলেন। কেমন সুন্দর মেয়ে কী হয়ে গেল তিন চার বছরে। ওর কাকারা বলেছিল, চাকরি করাচ্ছ কেন, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। ওদের কথা শুনব, তেমন অবস্থাই ছিল না তখন। উনি মারা গেলেন, একটিও গয়না বাকি ছিল না আমার, চারটে ছেলেপুলে নিয়ে এই বিদেশ বিভূঁয়ে কী সময় গেছে! তবু সরকারের আইনটা ছিল। মেয়েটাকে চাকরিতে ঢোকাতে পারা গেছিল। বয়স সবে আঠেরো হয়েছিল—ওর কি চাকরি করার বয়েস? ফ্যামিলি পেনশনের মাত্র চারশো পঞ্চাশটি টাকা—তনুর মাইনেটা না থাকলে আমরা না খেয়ে মরতাম!

তাই বলে, যারা বলে মেয়ের টাকায় খাচ্ছি বলে মেয়ের সুখ দুঃখের কথা ভাবি না, তারা মিথ্যেবাদী। আমরা উপোস করে মরলে তারা ফিরেও দেখবে নাকি? আমি কি বলেছি তনুর বিয়ে দেব না? ও ছেলেমানুষ, বোঝার বয়স হয়নি, ওর কান ভাঙাচ্ছে কারা সে আমি জানি। ওকে এই রাস্তায় কী করে যেতে দিই। শুধু কি ধর্মটা আলাদা, ছোকরার পঁয়ত্রিশের ওপর বয়স হয়ে গেছে, চেহারা নাহয় দড়কচা মারা। নন্দলিও তো হয়ে গেছিল, কী ক'রে রয়ে গেল এখানে? শত্তুরের অভাব নেই আমাদের। সেবার যখন তনু জেলায় গেল অ্যাকাউন্টস পরীক্ষা দিতে, বাড়িতে ডেকে ছোঁড়াকে বলেছিলাম, তুমি নিজের জাতেধর্মে বিয়ে করে নাও, আমার মেয়েটাকে ডুবিও না। বলে কিনা, আপনি খালি ওর চাকরিটাই দেখছেন, আমি ওর ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। ওর সুখদুঃখের দায়িত্ব আমাকেই নিতে দিন। মরুক্ গে। ফিরে এসে তনুও দু'চার কথা শোনাল। ওকে কেন ডেকে অপমান করেছি! শান্তি বলে, মা তুমি কেন সেধে এসব গায়ে নিতে যাও! যা ক'রে করুক না দিদি। ক'দিন গেলে ওর মাথা আপনা থেকেই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে।

শান্তি ওর বাবার ঠাণ্ডা মাথা পেয়েছে। তনুর মতো ধারালো অবশ্য ও-ও না, মনীষাও না। তবে দু'জনেই ভারী বুঝদার মেয়ে। সকালের সব কাজকর্ম করে, আমি খালি রান্নাটা, একাদশীর দিন ওরাই রাঁধে। সন্ধেবেলা খোকনকে পড়াটা দেখিয়ে দিতে হয়, সেটাতে তেমন সুবিধে করতে পারছে না, হয়তো মাস্টার একটা রাখতেই হবে। হপ্তায় একদিন পড়ানোর জন্য বি এস সি মাস্টার চাইছে একশো টাকা। মাস্টার রাখলে কি পেটে গামছা বেঁধে থাকব?

এই পাথরের দেশে পারিজাত কোথা থেকে এল, কেন এল? প্রথম যখন তনু অফিস থেকে এসে বলল, মা জানো আমাদের নতুন সাহেব আসছে, বাঙালি ছেলে। তখনই বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠেছিল আমার! তারপর ক্যাশিয়ার বাবুর বউ এসে বলল, শুনছেন তো দিদি, বিয়েথা করেননি নাকি, আপনি একটু চেষ্টাচরিত্র করুন না।

এদের কী করে বোঝাব ? আকাশের চাঁদ ধরার স্বপ্ন ছেড়ে দিয়েছি কবেই। অনেক কিছু ছিল আমাদের। অনেক কিছু এক এক করে গেল। এখন ছেলেমেয়েগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই হয় কোনও মতে। কালোকোলো রোগা ছিলাম, পিসি বলত বর জুটলে হয়, ওঁর মতো রূপবান কন্দর্পকান্তি স্বামী পেলাম, সেই স্বামী আবার কংকালসার রক্তশূন্য হয়ে আমারই চোখের সামনে বিছানায় মিশে গেল। ছেলে হয় না করেও খোকন এল। ওকে তো পেট ভরে দু'বেলা খেতেই দিতে পারি না মাসের শেষ কটা দিন। স্কুলে ওর বয়সী ছেলেরা আইসক্রিম খায়, আলুকাবলি খায়, ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তনুটা ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করল, সেও লেগে গেল সংসারের ঘানি টানায়। কোনদিন যে মনের আক্রোশে কী করে ফেলবে, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

তবু তো আমি কখনও ভাবিনি পারিজাত এ দেশে আসবে, বাড়িতে আসবে ডাকতে না ডাকতে। গতবার দুর্গা অষ্টমীর দিন, তখন ওর সঙ্গে আমাদের ভাল করে আলাপও হয়নি, ওকে খেতে ডেকেছিলাম। মনীষা আর খোকাকে পাঠালাম, ওরা গিয়ে ডেকে নিয়ে এল। পারিজাত এল, গল্প করল কত ব'সে, লুডো খেলল ওদের সঙ্গে। খাওয়া দাওরার পর আমরা সবাই পায়ে হেঁটে ওকে এগিয়ে দিতে গেছিলাম। মনে হচ্ছিল খোকার বাবা চলে যাবার পর এই প্রথম যেন আমাদের বাড়িটা সব ভাঙাচোরা জোড়া লেগে ভরভরন্ত হয়ে উঠেছে।

সারাদিন কাজে কাজে ঘোরে ছেলেটা। পিওনগুলো দিনেরবেলা নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। শোবার ঘরটা মাগো কী অগোছালো! বইয়ের তাকে পুরু ধুলো। কি না, সাহেব কিছু বলে যাননি। আরে, মানুষের নুন খেলে এইটুকু তো করে মানুষ। আর কী যে ওদের রান্না। এই লখনটা দু'বছর ধরে রাঁধছে, এখনও কিসে ফোড়ন দিতে হয় জানে না।

আমি ওখানে যাই বলে তনু রাগ করে। অফিসে নাকি লোকেরা হাসাহাসি করে। হেড টাইপিস্টের বউ নাকি ওকে বলেছে—তোমরা এই ছোট কোয়ার্টারে গাদাগাদি করে না থেকে টিলায় গিয়ে ওঠো না—অতগুলো ঘর খালি! দেখ কথা।

বুড়ো মেয়েমানুষ, মেয়ের বয়সী তনুকে অমন খারাপ কথাটা বলতে মুখে বাধল না। অর্ধেক লোকই এই রকম এখানে—নোংরা, স্থূল কথাবার্তা, খারাপ রুচি। উনি যতদিন ছিলেন, বাইরে বেরিয়েছি খালি শখের কেনাকাটা করতে, কী সিনেমায় গেলাম। কোনওদিন নিজের অনিচ্ছেয় দরজার বাইরে পা রাখিনি। মানুষের মুখের পালিশ করা দিকটাই খালি দেখেছি। এখন তো সবই একা হাতে করতে হচ্ছে, সবরকম মানুষ সইতে হচ্ছে প্রতিদিন।

খিড়কির দরজার পাল্লাটা কব্জা থেকে ভেঙে পড়ে ঝুলছে। রাত্তিরে শোবার সময় চিন্তা হয়। মানুষ না হোক শেয়াল টেয়াল ঢুকলেই চিত্তির! আমি তো মাঝরাতের পর থেকেই উঠে চক্কর মারতে থাকি—দরজাটা দেখে

নেই। ছুতোর মিস্ত্রিকে ডেকেছিলাম, সে চারশো টাকা হেঁকে চলে গেল। এ বছরটা চেপেচুপে রয়ে যেতে হবে। সরকারি রিপেয়ারের টাকা শেষ হয়ে গেছে গত বছরেই। বড়বাবু বলছে এ বছরকার টাকা দিয়ে আমাদের দরজাটাও করিয়ে দেবে।

হ্যাঁ, উনি বেঁচে থাকতে সত্যি বলব ছেলেমেয়েদের জন্য এতটা কখনও করিনি। ওরা যখন ছোট ছিল, উনি মেয়েদের একপাতে খাইয়ে নিজে খেয়ে অফিস গিয়েছেন। আমার মনটা ওঁর চারদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। পাঁচটা বাজল কি না বাজল, গা ধুয়ে সাবানে মুখ ধুয়ে খোঁপা বেঁধে আমি দরজায়—চার ছেলের মা! সন্ধেবেলা ছুতোনাতায় ছেলেমেয়েদের এদিক ওদিক পাঠিয়ে ওর কাছে ঘেঁষে বসতাম। উনি হেসে বলতেন—শুরু হ'ল তো পাগলের পাগলামি! পাগলামিই বটে। পাগল না হলে কী অমন করতে পারতাম!

মহকুমা হাসপাতাল যখন জানিয়েই দিল ওঁর চিকিৎসা এখানে আর হতে পারবে না, ঘর খোলা রেখে তনু আর শান্তিকে জিম্মা দিয়ে দুটো সুটকেস গুছিয়ে ওঁকে নিয়ে কলকাতা চলে গেলাম। ওদের কাকা-কাকিমারা কেউ আসতে রাজি হল না। বলে, মেয়েদের এখানে পাঠিয়ে দাও। আমাদের কাছে থাকবে। আমি না ক'রে দিয়েছিলাম। বড় দেওরের স্বভাবচরিত্র ভাল নয়। তারপর বারোয়ারি বাড়ি, একা মেয়েদের পেয়ে ভূতের মতো খাটাবে। নতুন বিয়ের পর আমার অমন হয়েছে কতবার। এই ধাড়ি ধাড়ি মুস্কো মুনিষগুলো খেত থেকে আসবে, তাদের ভাত রাঁধো হাঁড়ি হাঁড়ি, তাদের চা দাও। তারপর গোরুর জাবনা, ধানসেদ্ধ। দম ফেটে মরার জোগাড়।

এখানে কলোনির লোকেরা তবু দেখবে দরকারে—আর যদি ভগবান নাই দেখেন, তবে মানুষ কি করতে পারে কিছু। সাজানো সংসার পড়ে রইল—ছ'মাস আমি রয়ে গেলাম কলকাতায়। এখানকার ডাকঘরের মাস্টারমশাই একজনের ঠিকানা দিয়েছিলেন—তাঁর ঘরে পেয়িংগেস্ট হয়ে আমি, আর উনি পি জি হাসপাতালে। এই ছ'টা মাস আমার দিনরাতের খেয়াল থাকত না, তারিখের হিসেব থাকত না। সকালে ঘুম থেকে উঠে হাসপাতালে যাবার জন্য তৈরি, দুপুরে কোনওমতে দুটো খেয়ে আবার বিকেলে হাসপাতাল—সন্ধেবেলা যতক্ষণ না সবাইকে বার করে দিত ততক্ষণ ওঁর বেডের পাশে চেয়ার নিয়ে বসে থাকতাম।

ওঁর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল ক্রমশ, শেষদিকে মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইতেন, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ত। আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে ঠোঁট চেপে বসে থাকতাম। ওঁর সামনে কখনও চোখের জল ফেলতে পারিনি উনি বেঁচে থাকতে।

তনু আর শান্তি খুব খেটেছে এই ছ'টা মাস। ঘরের কাজকর্ম, রান্নাবান্না সব করে স্কুলে গেছে, খোকাকে দেখেছে। ওদের লেখা পোস্টকার্ড আসত সপ্তাহে একটা, ওকে হাসপাতালে পড়ে শোনাতাম। দুঃসময়ে ভগবানই কাউকে না কাউকে জুটিয়ে দেন। ওঁর ভাইয়েরা তো এল মাঝে দু'বার, কোনও মতে

দায়সারা চোখের দেখা দেখে পরের দিন পুরুলিয়া চলে গেল। একবারও শুধাল না হাতে টাকা পয়সা আছে কিনা, কোনও সাহায্য দরকার কিনা। অথচ যাঁদের বাড়িতে আমি থাকতাম, এক বিধবা বুড়ি আর তাঁর ছেলে, মাসে সাড়ে তিনশো করে নিত, আগে জানাশুনো নেই, অথচ কী মায়মমতা। সকাল ন'টায় হাসপাতালে বেরতাম, ভোর ভোর ছেলেকে বাজারে পাঠিয়ে মাছ আনিয়ে কুটে ঝোলভাত রাঁধতেন। আমার ভারি খারাপ লাগত। ওঁর ছেলে দুপুরে অফিসের ক্যান্টিনে খায়, নিজে একবেলা নিরামিষ খান। কতবার বলেছি, মাসিমা, কেন মিছিমিছি সকালবেলা আঁশ হাত করবেন, আমার দুটো ভাত হলেই চলে যায়, আর কি ভালমন্দ খাওয়ার ইচ্ছে আছে, মানুষটা হাসপাতালে পড়ে। উনি বলতেন, না মা, এখন তুমি পুরো সংসারটা দেখছ, শরীরটা ঠিক রাখা দরকার, আমার মেয়ে থাকলে তাঁর জন্যেও তো রাঁধতাম। রাত্তিরে আমি ফেরা পর্যন্ত জেগে থাকতেন, খুটখাট কাজ করে বেড়াতেন। শোবার সময় কাছে এসে বলতেন—অ মেয়ে, জামাই কেমন আছে ? এটটু ভাল বলল তো ডাক্তার ? শনিবার শনিবার পুজো দিচ্ছি কালীঘাটে।

আর একজন ছিল। এলগিনের মোড়ে এক বুড়ো স্যাকরা। কলকাতায় আসার সময় সবকটা গয়না নিয়ে এসেছিলাম। আমার বিয়ের সময়ের গয়না সব—কানপাশা, মফচেন, নাকের নথ, টিকলি, হাতের আংটি, পুরনো খাঁটি সোনার জিনিস। অর্ধেকই আমার মায়ের গায়ের। একটি একটি করে বিক্রি করেছি ওঁকে লুকিয়ে, ওষুধ কিনেছি, রক্ত, অপারেশনের খরচ, বাড়িতে মানি অর্ডার। প্রথম দিন দোকানের ছোকরাটা ভেতরে গিয়ে বুড়োকে ডেকে এনেছিল। আমার আধময়লা কাপড়, প্রায় খালি গলা, খালি হাত, অবশ্য কাচের চুরি ছিল—দেখে বুড়ো অপলক আমাকে জরিপ করল। গয়না বেচতে এসেছ ! ঘাড় নাড়লাম। কানপাশাটা হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ করল। খাঁটি সোনা। হাতে টাকাটা এনে দিতে দিতে বলেছিল, খুব দরকার না পড়লে আর এসো না। অথচ ওর কাছেই যেতে হয়েছে বার বার। যেদিন বিছেহারটা ওজন হল, গলায় পুঁতির মালা পরে গেছিলাম, বললাম, দাদু আসি, আর বোধহয় আসার দরকার হবে না। চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ তুলে বুড়ো বলেছিল, চিকিচ্ছা হয়ে গেল ?

চিকিৎসা এখনও শেষ হয়নি দাদু, আমার আর কিছু নেই। তারপর অবশ্য অফিস থেকে টাকা ওরা পাঠিয়েছিল—ছুটি বিক্রি, জমা টি এ. নাহলে ভারী আতান্তরে পড়তে হত।

বারোই মে। সেদিনও সকালে গেছি। কেমন আচ্ছন্ন মতন, অনেক ডাকলে যেন দূর থেকে একটু উঁ বলে আওয়াজ আসে। সিস্টারকে ডাকলাম। এসে ব্লাডপ্রেসার নিয়ে ইনজেকশন দিয়ে গেল। অমন সুন্দর শরীরটা কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে গেছিল, মুখটায় খালি হাড়ের কাঠামো, তার মধ্যে চোখ দুটো আর নাকটা জেগে। মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। চোখ খুলে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললেন, 'খো-কা, তনু ওরা আসবে ? বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, তোমার দেখতে ইচ্ছে করছে? ওদের লিখে দিই—এখানে থাকার জায়গা নেই বলে আনিনি।

উত্তর নেই।

আবার মনে হল যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন, ভারী নিঃশ্বাস। চোখের পাতা দুটোর ফাঁক দিয়ে বাদামি মণি দুটো যে কত কী দেখছে। অনেকক্ষণ বসে বসে উঠলাম। বই এনেছিলাম, পড়লাম। আজ আর দুপুরে খেতে যাওয়া নেই। বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে আসছে চারদিকে, ঘুলঘুলিতে পায়রাদের ডাকাডাকি। এরই মধ্যে ঝুলমাখা লম্বা লম্বা বাতির ছায়া দুলতে লেগেছে, হাসপাতালে বিকেলের চা-দুধ দিচ্ছে। ডানদিকের বেডে দুই পা ভাঙা একজন গুণ্ডামতন লোক, চাউনিটা কেমন যেন। বলে উঠল, এরই মধ্যে চললেন? সিঁড়ি দিয়ে নেমে তলায় এসেছি, সামনে দিয়ে মনে হল ছিয়াত্তর নম্বর চলে গেল, বেজায় ভিড়।

হঠাৎ দেখি পেছনে ওয়ার্ডবয়টা দৌড়তে দৌড়তে আসছে। বলল—ঊনত্রিশ নম্বর! ওপরে যান। ওপরে যান। পেশেণ্ট খুঁজছে আপনাকে।

খুঁজছেন? ঘুমিয়ে ছিলেন তো?

দোতলা পর্যন্ত পৌঁছতে বুকের ভেতরটা ধক্ ধক্ করে বাজছে, পা যেন আর চলে না।

হিমের মতো ঠাণ্ডা কপাল, বরফের মতন দুই পা, ঘাড়টা একদিকে হেলে আছে, আমার সব টানাপোড়েন শেষ হয়ে গেল। প্রাণবায়ু বেরতে বেবতে শেষ মুহূর্তে ডেকে গেছিলেন কি আমায়? কেন শুনতে পাইনি, কেন চলে গেলাম? বারান্দার রেলিঙে মাথা রেখে অনেকক্ষণ চেষ্টা করলাম, চোখের জল বেরল না। ঘাড় পিঠ ফেটে যাচ্ছিল দারুণ ব্যথায়।

রাঁচি-হাতিয়া প্যাসেঞ্জারে একা একা ফিরে এলাম। গরমে ধুলোর ঘূর্ণি উঠেছে খোলা মাঠে, চারপাশের জঙ্গলে ধু ধু রোদ্দুর। বাংলাদেশ পেরিয়ে এলে খালিই থাকে ট্রেনটা, দেহাতি কাঠুরেরা ভার নিয়ে মাঝে মাঝে উঠছে নামছে। ওঁর সুটকেসটার দিকে তাকাচ্ছি আর মনে হচ্ছে মানুষটা কতদূরে চলে গেল কোথায়! ফাঁকা থাকে বলে ওঁকে এই ট্রেনে কলকাতা নিয়ে এসেছিলাম; আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে দেখছিলেন শীতশেষের আকাশ, মাঠবন। বলছিলেন—যেন নতুন বিয়ের পর বেড়াতে যাচ্ছি, কি গো!

দোতলার মাসিমা শাঁখা ভাঙতে রাজি হলেন না, শেষকালে পাশের বাড়ির এক বুড়ি এসে নিয়ে গেল। এই দুটো সুটকেস বিছানা কুলির মাথায় চাপিয়ে ওভারব্রিজ পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্টেশন। সারাণ্ডা ঘাটের বাস। ঝরঝরে বাসটার মাথায় বোঝাই বিড়ি আর কাঁঠাল পাতার গাঁঠরি। সূর্য ডুবে যাচ্ছিল খালপাড়ে। বুকের ভেতরটা একদম খালি। মাথাটা পাথরের মতো ভারী। খালের চিকচিকে ঠাণ্ডা জল দেখে চিরতরে হারিয়ে যাবার ইচ্ছে কি আর হয়নি? মনে হচ্ছিল, বাড়তি একটি দিনও বোধহয় বেঁচে থাকতে পারব না! মানুষ কি নিজেকেই চেনে?

পেনশন, সাকশেসন সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্কের লকার, মেয়ের চাকরি,…কী হাঁটা! সারাণ্ডাঘাট থেকে সাহেবগঞ্জ, বাস থেকে কাছারি, কাছারি থেকে ট্রেজারি। কালোপাড় শাড়ি, খালি হাত, দুপুর রোদ্দুরে, কাকভেজা বর্ষায়… হেঁটেই চলেছি সেদিন থেকে। দেওয়ালের ছবিতে তনুর বাবার ডাগর দুই চোখ। যেন ভেতর পর্যন্ত আমায় দেখে নেন। না, আমার কোনও কষ্ট নেই। তোমাকে নিজের মধ্যে নিয়ে আমি চলে বেড়াচ্ছি। কাচের ওপর খালি পায়ে হেঁটে যাদের থাকতেই হয় আমি আজ তাদের ভিড়ে মিশে গেছি।

বেদপ্রকাশ

রাত সাড়ে এগারোটা বাজে এখন। জিপটা গ্যারেজে রেখে আমায় চাবি দিয়ে জয়রাম সিং এইমাত্র চলে গেল। ডাইনিং হলে আলোটা জ্বলছে। আমার রাত্রের খাবার টেবিলের ওপর ঢাকা দেওয়া। শোবার ঘরে তুমুল শব্দে পাখা চলছে, সীমা ঘুমিয়ে আছে পুতলি আর বাবুয়াকে নিয়ে। ভরদ্বাজ আজ আমার বিছানাটা করতে ভুলে গেছে। বিছানাটা পাতলাম, মশারি টাঙালাম, আজকে আর কিছু খাওয়া সম্ভব নয়। থালাটা সামনে নিয়ে বসেও ছিলাম, একটা বিশ্রী বিতৃষ্ণার ভাব ভেতর থেকে উঠে এল, একটু চা খেতে পারলে হত—কিন্তু নিজে বানিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারটা বাইরে এনে বসলাম। অনেকক্ষণ বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ ভিজে মাটি থেকে সুগন্ধ উঠছে, আর্দ্র হাওয়া এসে আমাদের গেটের কাছের বোগেনভিলিয়া গাছটাকে নাড়িয়ে দিচ্ছে—টপ টপ করে চোখের জল ঝরে পড়ল গাছটার।

আমাদের এই শরীর, যার এত ঘষামাজা, পালিশ, তদ্বির তদারক—কী বীভৎস তার পরিণতি! রতন ঘাসির ডেডবডি আমাকে পালাতে দিচ্ছে না। মাথাটা ধড় থেকে কেটে আলাদা করে পুঁতে দিয়েছিল। হাতপাগুলোকেও টুকরো টুকরো করে কেটেছে, যেন ছাগল ভেড়ার মাংস। আর বডিটা না পেলে ভানু সিংহের পুরো জ্ঞাতিগুষ্টিকে টেম্পোরারি জেল বানিয়ে রাতভর রেখে দিতাম। বদমাশ। সবকটা জোয়ান ছেলে গাঁ ছেড়ে ফেরার। রামদহিনবাবুকে বলে এসেছি, সারারাত যেন বুড়োকে স্ক্রু টাইট দিয়ে ছেলেগুলোর হদিস বার করে। বুড়োর হাত পা কাঁপছিল, নাহলে স্পটেই ওকে আড়ংধোলাই দিতাম। ইয়েস, আজ আমি রাগে অন্ধ হয়ে গেছিলাম। আপাদমস্তক কাঁপছিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে আজ বারিডির ও সি ভয় পেয়ে গেছিল। আমাদের অবশ্য কোনও ব্যক্তিগত ইমোশন থাকতে নেই—সরকারি চাকরি যে। সমভাব, ডিস্প্যাশনেট, নির্বিকল্প মনোভাব। একটা জোয়ান ছেলেকে সাত-আটজন গুণ্ডা মিলে ছাগলের মতো জবাই করে দিল। দিন থাকতে থাকতে। আইনের মুখে এরা থুতু দেয়, পরম বিশ্বাস ও অবজ্ঞায়। ভানু সিংহের ঘরের পেছনে গোয়ালের মাটির নীচে যখন রতনের ধড়টা পাওয়া গেল, হাত পা কাটা, চটে

সেলাই করে বাঁধা, তখনও জানি না রতনের ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কী অগ্নি-পরীক্ষা দেবে আমার পোকায় কাটা আত্মসম্মানবোধ, আমার বিক্রিত বিবেক!

নিচু আটপৌরে মাটির ঘর, খড়ের চাল, বাইরে খাটিয়ায় শুয়ে আশি বছরের বুড়ো রতনের বাপ, অন্ধ, তেলচিটে কাঁথা-বালিশে মিশে আছে। উলঙ্গ একটা দুধের বাচ্চা নীচে ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। চার-পাঁচটা বিবর্ণ নোংরা শুয়োর আঙিনায় ইতস্তত চরে বেড়াচ্ছে। বুড়োর খাটিয়ার নীচে অ্যালুমিনিয়মের সানকিতে শুকনো ভাত, বোধহয় গতরাত্রের। আমাদের আসার খবর পেয়ে রতনের বউ বেরিয়ে এল—ময়লা একটা সাদা শাড়ি, লাল লাল ক্লিষ্ট চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে এলোমেলো, বাঘিনীর মতো জ্বলন্ত দুই চোখে সে আমাদের দেখল কয়েক সেকেন্ড। আমার সামনে থানাবাবু ছিল, তিনজন কনস্টেবল আর এ এস আই। তারপর সোজা ছুটে এসে দুমদাম কিলচড় মারতে লাগল আমার বুকের ওপর—ওর শরীর থেকে উঠে আসা ঘাম ও ময়লার জটপাকানো গন্ধটা গা গুলিয়ে তুলছিল আমার—আমার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছিল কয়েক লহমার জন্য। উপস্থিত চার-পাঁচজন মেয়েবউ ভেতর থেকে দ্রুত এসে হাত দুটো চেপে ধরেছে ওর। ভয় পেয়ে বাচ্চাটা কাঁদতে আরম্ভ করেছে। বুড়ো শ্বশুর হতবুদ্ধি হয়ে উঠে বসেছে খাটিয়ায়, চোখে দেখতে পাচ্ছে না বুড়ো কিন্তু বুঝতে পারছে ভীষণ কী একটা গণ্ডগোল হতে যাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতেই পড়শীদের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠেছিল রতনের বউ—বাহ্ রে পুলিশওয়ালা। দিনদহারে মেরে মরদ কো বকরিকে তরহ্ কাট দিয়া, ঔর তুমলোক বৈঠ্‌কর তামাশা দেখতে রহ্ গয়ে!

প্রতিবেশীর এক বউ এবার ওকে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল ঘরের ভেতর, গা থেকে আঁচল খসে পড়ে যাচ্ছিল। ঘরের ভেতর বসে গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদছিল রতনের বউ। আর আমার মনে হচ্ছিল আমরা শালা সব নপুংসক ক্লীব হয়ে গেছি। খানিকক্ষণ পর বারিডির ও সি একটা কাচের গ্লাসে জল এনে ভয়ে ভয়ে বলেছিল, স্যার, হাতটা ধুয়ে নিন—উর্দিটা, আমি বলেছিলাম, থাক।

আমি চেয়েছিলাম, রতনের বউয়ের কান্নার দাগ, ঘেন্নার ছেটানো থুতু, ওর শরীরের ময়লা, বাসি গরিবির গন্ধ আমার ইউনিফর্মের ওপর চিরতরে লেগে থাক। শুতে বসতে খেতে যেন আমি এর থেকে পরিত্রাণ না পাই।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পরশু পেয়ে যাব। কেস চার্জশিট হতেও দেরি হবে না। কিন্তু এখনও দশজনের আটজনই ফেরার—অ্যারেস্ট না করতে পারলে এস ডি ও সাহেবকে মুখ দেখাতে পারব না। তার চেয়ে বড় কথা, নিজের কাছে আর মানসম্মান রইবে না। এরা ফেরার থাকতে থাকতেই জেলা থেকে, পাটনা থেকে ফোন আসতে থাকবে।

সেদিন বস ডেকে বললেন, আমার সঙ্গে পারিজাত সাহেবের মেলামেশা লোকে ভাল চোখে নিচ্ছে না। আমি নাকি আনুগত্যের লিমিট ছাড়িয়ে বেশি

মাখামাখি করছি মিঃ মুখার্জির সঙ্গে। কারা এই লোকেরা ?

রামসরণ আর ত্রিলোচন পাণ্ডে ঘন ঘন জেলা সদরে যাচ্ছে আজকাল। কোলিয়ারিগুলোতে দু'তিনটে রেইড লাগাতার হয়ে যাবার পর আজকাল এঁদের ব্যবসাতে মন্দা পড়ে গেছে। চার নম্বর আর সারং ওয়াশারির পেমেণ্ট কাউণ্টারে গত একমাস কোনও মহাজন আসেনি। এখানকার হিসেবে এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, যুগান্তকারী। কোলকাটারদের কাছ থেকেই আজকাল কিছু ফ্রেশ ইণ্টেলিজেন্স পাচ্ছি মহাজনদের গতিবিধি নিয়ে—ওরা বলছে আমরাই আপনাদের খবর সাপ্লাই দেব, বশর্তে কি আপ্‌লোগ হমলোগোঁকে সাথ ন ছোড় দেঁ ! ইঙ্গিতটা ভারী স্পষ্ট। আমি বদলি হয়ে গেলে ওদের ওপর ডবল মার পড়বে—পেটেও, পিঠেও। খাদানে মেরেও ফেলে রেখে দিতে পারে সাহুকারের লোক—টিকটিকির তো অভাব নেই।

না, আমি মনস্থির করে নিয়েছি, আমি পালাব না। যদি ওরা বদলি করে, জবরদস্তি করুক, আমি সারাণ্ডা ঘাট ছেড়ে যাব না নিজের মর্জিতে। কিন্তু সীমা এখানে থাকতে চায় না। ওর বাবাকে এরই মধ্যে লিখে বসে আছে আমার জন্য অন্যত্র পোস্টিং-এর চেষ্টা করছে। অবশ্য চন্দ্রমোহনজি, আমার শ্বশুরকে আমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছি যেন বিনা কারণে আমার চাকরির ব্যাপারে মাথা না ঘামান। সীমার আসলে এখানে ভাল লাগছে না। এখানে কোনও কিছুই নেই ওর মনে ধরার মতো। সিনেমা হল সাত কিলোমিটার রাস্তা। কে নিয়ে যায় ওকে, আমি তো সারাদিনই বাইরে। এটা কী দরের মহকুমা শহর—ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল নেই। ঘরে যে রান্না করে বুড়ো রাবণ মাহাতো সে নাকি এক নম্বরের জংলি অসভ্য। আর সবচেয়ে বড় কথা, এখানে আমার চিকিৎসার কোনও সুবিধে নেই, স্পেশালিস্ট নেই। আজকাল ও জবরদস্তি আমাকে দিয়ে বিনা-নুনে রবিবার করায়, সূর্যপুজো করায়। নিজেও করে। সব দেবতার মন্দিরে মাথা ঠোকে, খুঁৎ খুঁৎ করে, সবার ভুল ধরে। কথায় কথায় বলে, ওর জীবনটা নাকি জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেল।

ঘরের ভেতর ফিরে এসে অন্ধকার বেডরুমের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবুয়া পাশ ফিরছে ঘুমের ঘোরে, মুখের মধ্যে আঙুল ভরে চক্ চক্ শব্দ করছে। রোজই শুতে যাবার আগে অভ্যেসবশে এই দরজার সামনে দাঁড়াই। এই ব্যবস্থাটা ঠিক কবে থেকে চালু হল মনে নেই। তবে বছরখানেক তো নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। আমাকে নিজের মুখে কিছু বলেনি সীমা, একদিন দেখলাম পুরনো ছোট খাটটা ঝেড়েমুছে ফিট করিয়ে তাতে বিছানা পাতাচ্ছে ভরদ্বাজকে দিয়ে। আমি ভেবেছিলাম, বোধহয় বাচ্চাদের আলাদা করে দিচ্ছে। বাবুয়া তো এখন বড়ই ছোট, মাকে ছাড়া শোবে কী করে —এই সব ভাবনাচিন্তা আমার মাথায় এসেছিল। ও যখন ভরদ্বাজকে ডেকে বলল—বাবুর ইউনিফর্ম ও-ঘরের হুকে টাঙিয়ে রেখে এসো, ভোরে উঠে বাবুর অসুবিধে হবে। তখনই আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। পরে দু'একবার

আমার মনে হয়েছে—আমি কি নিতান্ত কাপুরুষ? আমাদের দেশ মুঙ্গের, যেখানকার গ্রামদেশে পুরুষরা এখনও জুতোর জোরে বউকে সিধে করার গর্ব করে গোঁফে তা দেয়, শহরেও উঠতে বসতে পিটুনি খায়, এমন মেয়ে খুঁজলে ঢের পাওয়া যাবে। নিঃশব্দে, বিনা উচ্চবাচ্যে সীমার এই অনৈতিক ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার ভেতর আমার সাহসের অভাব সাব্যস্ত করে শ্বশুর-শাশুড়ী শালারা নিশ্চয়ই মনে মনে নিজেদের পিঠ চাপড়েছিল। আমার বাড়ির কেউ অবশ্য ব্যাপারটা জানে না। বাইরের লোকে কী ভাবল না ভাবল তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় আমার হয়ে ওঠেনি, দুঃসময়ে নিজের ছায়াই যখন মানুষকে পরিত্যাগ করে, সে আর কোথায় গিয়ে নালিশ করবে, কাকে সাক্ষী মানবে?

হ্যাঁ, সীমা ভয় পেয়েছিল। ছোঁয়াচ লাগার ভয়। আমার ছোঁয়া লেগে বাচ্চাদের এই রোগ হবার ভয়। আগুন লেগে পুড়ে যাওয়া চেহারা নিয়ে বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তা ওকে গ্রাস করেছিল। আমার শাশুড়ীর যে এতে সায় ছিল তাও আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি। আসলে মেয়েদের বুদ্ধি দারুণ প্র্যাকটিক্যাল হয় সাংসারিক ব্যাপারে।

আমার জন্য ও জপতপ করবে, উপোস করবে, ডাক্তারের কাছে অ্যাপয়েণ্ট-মেণ্ট নেবে, কিন্তু যে রিস্ক না নিলেই নয়, তা নেবে কেন? আমি বহুবার ভেবেছি, যদি আমার না হয়ে এই অসুখটা সীমার হত, আমি কী করতাম? সীমাকে পাশের ঘরে আলাদা করে দিতাম? ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠেছি—যদি সীমার ছোঁয়াচ লেগে আমার কুষ্ঠ হত, তাহালেও এক বাড়ির মধ্যে ওকে অস্পৃশ্য করে দেবার মতো দুঃসহ আঘাত আমি কোনওদিন ওকে দিতে পারতাম না। এর চেয়ে ওকে ডিভোর্স করে দেওয়া সোজা হত।

আমাদের বিয়ে হয়েছিল গোপালগঞ্জে, শুক্ল দশমীর রাতে, বৈশাখ মাস ছিল সেটা। আমার শ্বশুর চন্দ্রমোহন তখন গোপালগঞ্জের উকিল। খুঁজে ওঁরাই বার করেছিলেন আমায়, সীমার বয়স তখন উনিশ, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলে চলত। আমি তখন মায়ের অসুখ আর ছোট ভাই ওমপ্রকাশের চাকরির সুলুকসন্ধান নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। নিজের কাজেও দারুণ টেন্‌শান। সব মিলিয়ে বর সাজার মতন মনোবলের একান্ত অভাব। সীমাকে আমি বিয়ের আগে দেখিনি। কৌতূহল নিশ্চয়ই ছিল, তবে বাবা মা মত দিয়ে ফেলেছিলেন, আবার গিয়ে দেখাটা মনে হল অবান্তর। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী অবশ্য আমায় দেখতে এসেছিলেন, আমি তখন রাঁচিতে। বাড়িতে এসেছি ছুটি নিয়ে। বিয়ের রাতে সীমাকে যখন প্রথম দেখি, জয়মালা হাতে বিয়ের বেদিতে দাঁড়িয়ে সত্যি বলতে কী, চোখ ধাঁধিয়ে গেছিল আমার।

আমরা তিনভাই, বোন নেই, মা সারাজীবন ছোটখাটো অসুখে শয্যাশায়ী, অল্পবয়সী কোনও তরুণী মেয়েকে সাজসজ্জায় অপরূপা—কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। সীমা তখন গোলগাল ছিল না আজকের মতো, ছিপছিপে, গায়ের রঙ দুধের মতো সাদা, টানা ভুরুর নীচে ঈষৎ দীর্ঘ দুই চোখের বড়

বড় পক্ষ্মরাজি, আর নাকের ওপর মস্ত একটি হিরে। সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল রূপকথার দেশ থেকে কোনও পরী যেন নেমে এসেছে মাটিতে। এক পলকের জন্য মনে হয়েছিল এই তো সেই—আমার না-দেখা কনে! অন্য কেউ না তো! আমার এই বিমূঢ় অবস্থা দেখে বরযাত্রীর দল লজ্জা পেয়েছিলেন। শুরুতেই হার, আমার পিসতুতো ভাই মিথিলেশ আমাকে পেছন থেকে একটু ঠেলে দিয়েছিল—এগো, হাঁদা কোথাকার! মাত্র দশবারো সেকেণ্ডের দেরি সব মিলিয়ে, তারই মধ্যে লজ্জা ও অস্বস্তিতে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল সীমার মুখে। জয়মালা বদলের সময় দেখলাম, ওর চোখের পাতায় চন্দনের নিবিড় কারুকার্য, আমার মনে হচ্ছিল, যেন আমার হৃৎপিণ্ডের ওপর কেউ হাত রেখেছে। সীমাকে সবকিছু দিয়ে ভালবাসব, কোনওদিন ওকে অসুখী হতে দেব না এইরকম একটা বিশাল প্রতিজ্ঞার ঢেউ আমাকে আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে গেছিল সেই বিয়ের বেদিতে দাঁড়িয়েই।

হায়, তখনও আমি জানি না, আমার জীবনের বাস্তবের সঙ্গে সীমার প্রত্যাশার কী আকাশপাতাল তফাৎ! ওর বাবা উকিল, পুলিশ অফিসারদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওদের পরিচয় আছে ভালরকম। চাকরিতে যে সিঁড়ি-ভাঙার একটা অঙ্ক আছে সেটা ওর মাথায় কখনও ঢোকেনি। ও বোধহয় ভেবেছিল চকমিলানো বাড়ি, অজস্র চাকরবাকর, শহরের নাগরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বামীর সঙ্গে খাওয়া দাওয়া বেড়াটি, ইভনিং-ওয়াক—যা নিয়ম বেঁধে কোনওদিনই আমাদের হয়ে ওঠেনি। আমার বাড়িতে ভার ভার মিষ্টি, তরিতরকারি, ফলফুলুরি আসে না, এলেও গেটের ওপার থেকে ফিরে যায়। তদ্বির করতে বড় বড় পার্টিরা আসে না, কণ্ট্রাক্টর এসে বিনা প্ররোচনায় বাড়িতে ডিস্টেমপার করে দেয় না, আমি ফাইভ ফিফটি ফাইভ, স্কচ খাই না, কয়েক মাসের মধ্যেই আমার অকৃত্রিম পুলিশত্ব সম্বন্ধে আমার শাশুড়ী সন্দিহান হয়ে পড়লেন, যার কিছু কিছু অংশ নিয়মিতভাবে ওঁর মেয়ের কানে পেঁছিতে আরম্ভ করল। তাও আমাদের জীবন একরকম ভালমন্দ মিশিয়ে চলছিল—হঠাৎ একদিন সুতো ছিঁড়ে গেল।

খাবার ভেবে যন্ত্রণার বঁড়শি গলায় আটকে যাওয়া মাছের মতো চিৎকার করে উঠেছিল সীমা, একদিন সন্ধেবেলা! আমার কপালে ডানদিকে, চুলের তলায় প্রায় লুকানো এক সেণ্টিমিটারের মতো একটা তিনকোণা সাদা দাগ। এটা কী? আমি নিজে ওটা লক্ষ করেছিলাম দিনদুয়েক আগে। কাজের টানাটানিতে সীমাকে আর বলে ওঠা হয়নি। সীমা আমার গলার টাই বেঁধে দিচ্ছিল—রেডি হয়ে আমরা ভুবন কোলিয়ারি এরিয়ায় যাব সিনেমা দেখতে। ওর মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। যাওয়া তো মাথায় উঠল সেদিন, রাত্রে খাওয়া দাওয়া হল না, পরের দিনও উপোস, মড়াকান্না। তিনদিনের মাথায় শ্বশুর-শাশুড়ী দৌড়ে এলেন, মেয়ের টেলিগ্রাম পেয়েই খুব সম্ভব—তুলকালাম কাণ্ড করলেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার বংশের ঠিকুজি কুলুজি বার করতে লাগলেন, জানা গেল আমার এক দূর-সম্পর্কের দাদুর নাকি এটা

ছিল। আমরা জেনেশুনে বিয়ের সময় লুকিয়েছি। বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম ট্যুরে। ফিরে এসে দেখি এঁরা তখনও যাননি। স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে বাড়িতে ডাকিয়ে অপেক্ষা করছেন। ডাক্তার সীমার মাসতুতো ভাই হত সম্পর্কে। গত পাঁচ বছরে ত্রিকোণ ছোট্ট দাগটা আকারে বেড়েছে, সংখ্যায়ও। বাড়তে বাড়তে চোখের নীচে, ঠোঁটে, কনুইয়ে ছড়িয়েছে—চিকিৎসায় বিশেষ সুরাহা হয়নি। সেই সঙ্গে আগুনের মতো ছড়িয়েছে আমার আর সীমার মধ্যেকার দূরত্ব, শীতল বৈরাগ্য!

সীমা আমাকে একেবারে আলাদা করে দেবার পর প্রথম প্রথম খুব কষ্ট পেয়েছি, মনের চেয়েও শরীরে—ফ্রাসট্রেশনে কেঁদেছি, রাতের পর রাত। তবুও ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সাহস করিনি—যদি প্রত্যাখ্যান করে! আমার আগে যিনি এখানে পোস্টেড ছিলেন, সুশীলকুমার, পঞ্চাশ বছর বয়সে, দু'জন রক্ষিতা ছিল ওঁর নিজস্ব। আমার কাপুরুষতা আমার জন্য কোনও রাস্তাই খোলা রাখেনি। বি এ-তে ইংরেজি আর দর্শন পড়ে স্কুল মাস্টারের জীবনদর্শনে মানুষ হয়ে আমি প্রতিনিয়ত নিজের নির্বীর্য স্পর্ধাহীনতাকে ঘৃণা করেছি কিন্তু এই চক্রব্যূহ থেকে বেরুবার কোনও রাস্তা খুঁজে পাইনি। অন্ধকার বেডরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের স্ত্রীর নিশ্বাসের ওঠাপড়ার শব্দ শুনতে শুনতেই জীবনের বাকি দিনগুলো কেটে যাবে বোধহয়। বাইরের লনে এসে দাঁড়ালাম আবার। আঃ, এখানে হাওয়া কত ঠাণ্ডা! আকাশ তারায় তারায় টইটুম্বুর হয়ে আছে। ওই নিঃসীম নক্ষত্রমণ্ডলে কোথাও আঁকা হয়ে গেছে বড় বড় গভীর দুটি কালো চোখ, চোখের পাতার ওপর চন্দনের নিবিড় কারুকাজ। সীমা, কী অনায়াসে তুমি দু'হাতে মুছে দিলে অতীতের সমস্ত চন্দনরেখা!

পারিজাত

তিরিশ বছর আগেও কে ভেবেছিল সারাণ্ডাঘাট মহকুমা শহর হবে একদিন! জনবসতি হাজার দশেক, তার একের তিন সরকারি অফিসের লোকেদের পরিবার। কিছু কণ্ট্রাক্টর, ব্যবসায়ী, দোকানদার। দুই সারি দোকান গান্ধী চকের মাথায়। সন্ধেবেলা টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলে। বেতোয়ার ব্যারেজ তৈরি হয়ে সারাণ্ডাঘাটের নাম ম্যাপে উঠে গেল। নদীর মুখ ঘুরে গেল, শুকনো নদীখাত বয়ে গেল অন্যদিকে, এ পাহাড় থেকে ও পাহাড় বাঁধা পড়ে গেল ব্যারেজের রাস্তা ও স্লুইসে। রিজার্ভারের থেকে বেরিয়ে জ্যামিতিক চ্যানেলের নকশা সোজা গেছে পশ্চিমে, ওটা মেন চ্যানেল। সত্তপুরা স্টিল প্ল্যাণ্টের ওয়াটার পয়েণ্টে গিয়ে পড়েছে। উত্তরে দক্ষিণে গেছে ইরিগেশন চ্যানেল, বিশাল না হলেও মোটামুটি সবল, গ্রামে গ্রামে বেতোয়ার জল নিয়ে। মেন চ্যানেল থেকে সরু সরু সাবসিডিয়ারি খাল নিয়ন্ত্রিত জল দেয় চাষের জন্য। খরিফের শেষে প্রতিবছর জল নিয়ে লাঠালাঠি, রক্তগঙ্গা হয়

চ্যানেল পাড়ের গাঁগুলোতে, রাতারাতি স্লুইস ভেঙে নিয়ে যায় সমাজ-বিরোধীরা। এই মহকুমা যেন এক রাক্ষস যার প্রাণ সারাণ্ডাঘাটে নেই, আছে কৌটায় ভোমরার মতন বিশাল বিশাল তিন কোলিয়ারি এরিয়ায় সামন্তপুর, জরিডিহ, ভুবন। কোলিয়ারির হেড অফিসে গড়ে উঠেছে পরিপূর্ণ জনপদ, মদভাটি, বস্তি, বেশ্যাপল্লী। ইউনিয়ন অফিস, সাহুকারের দোকানপাট। সকাল-সন্ধে খনিশ্রমিক, দালাল, বাবু আর গাঁগঞ্জের লোভাতুর মেয়েপুরুষের ভিড় চলে এখানকার হোটেলে, দোকানপাটে। সামন্তপুর আর জরিডিহ ওপেন কাস্ট মাইনস, এছাড়া আছে ওয়াশারি।

বিধৌত কয়লা চলেছে, ওভারহেড ট্রলি লাইন দিয়ে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যাণ্টে। এই মহকুমায় আধা লোকই খনিশ্রমিক ও কারিগর। ওদের ওপর এবং বাস্তবিক ওদেরই কাঁদে বন্দুক রেখে রাজত্ব করে সাহুকার ও ইউনিয়ন। ইউনিয়ন নেতা ও সাহুকার গোষ্ঠী মোটামুটি একই ঘরানার লোক, জোঁকের মতো কোলকাটারদের শরীরে জেঁকে বসে আছে। মহকুমা অঞ্চলের হৃদয়স্থল জোড়া এই তিন কোলিয়ারি এরিয়া ছাড়িয়ে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বলয়ের দিকে চলে গেছে নানা রাস্তা। প্রথমে পিচ, পরে পিচ উঠে খোওয়া, শেষের দিকে শুধুই কাঁচামাটির আঁকাবাঁকা পথ। সেখানে আছে ছোট ছোট গ্রাম, অধিকাংশই বিদ্যুৎ-বর্তিকার প্রসাদবিহীন, রাজপুত ও ভূমিহাররা ও তাদের সেনাবাহিনী এইসব ম্যালেরিয়ায় অস্থিসার গ্রামাঞ্চলের নেতা ও জমির সিংহভাগের অবিসম্বাদিত মালিক। আর আছে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া আদিবাসী খনিশ্রমিক, গাঁ আঁকড়ে পড়ে থাকা আদিবাসী হরিজন ছোট চাষী, প্রান্তিক চাষী ও খেতমজুর। গ্রামের নাম যা-ই হোক, ভূমিহীনের ঘর দেখতে একইরকম। তাদের বউ ছেলেমেয়েদের গায়ে সেই একই রকম ট্যানা, চোখে পিঁচুটি, মাথার চুল পুষ্টি ও তেলের অভাবে আঠালো ও লাল এবং শিশুমৃত্যুর হার সমস্ত পরিবারে গড় নিলে যে কোনও গাঁয়েই এক। রতন ঘাসির জীবনে কোনও বৈচিত্র্য ছিল না, চমক ছিল রতন ঘাসির মৃত্যু ও তার অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনাগুলোর মধ্যে—আমার ও বেদপ্রকাশের দু'জনেরই কিছু বিশ্বাস ও আইনের প্রতি সহজ আস্থা প্রবল ঝাঁকুনি খেয়েছে।

সামন্তপুর ওপেন কাস্ট-এর স্ট্রাইক তিনদিনের মাথায় কল্‌ড অফ হয়ে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ওখানে দিন পনেরো ধরে অত ফোর্স আটকে রাখার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমাদের। বিশাল এরিয়ায় রাতে পেট্রলিং-এর অসুবিধে, তাছাড়া আছে অন্তর্ঘাতের ভয়। হেভি মেশিনারি, ডাম্পার, লোডার এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়ে যাবে, ম্যানেজমেণ্ট যতই সাবধান হোক। দু'তিনটে স্ট্রে ঘটনা ছেড়ে দিলে তিনদিনে বিশেষ কিছুই হল না। তিনদিনের দিন সকালে প্রভু সিং টেলিফোনে ধাতানি খেল, ইউনিয়নের সেণ্ট্রাল অফিসকে সম্যক্ অবহিত না রাখার জন্য, স্ট্রাইক কল্‌ড অফ।

ডাকের গোলযোগ কিনা বুঝতে পারছি না, বাড়ি থেকে কোনও চিঠিই পাইনি গত পনেরো দিন। কাল একটা চিঠি দিলাম, অনেকদিন পর সময়

করে। একটা সপ্তাহ কেটে গেল দারুণ ব্যস্ততায়—ঘোরের মধ্যে। রাত্রে চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি ঘুমোনোর সময় পাচ্ছিলাম না, লখন বেচারা খাবার গরম করে করে হয়রান। মাঝখানে একদিন চানও করতে পারিনি—সকালে উঠেই বারিডি চলে গেছিলাম। রতন ঘাসির পরিবার দশহাজার টাকা পাবে সরকারের কাছ থেকে। রাজপুতের হাতে হরিজনের খুন বলে কথা! দ্রুত জয়েণ্ট এনকোয়ারি সেরে দিয়েছিলাম, যাতে ওরা তাড়াতাড়ি টাকাটা পায়। বেদপ্রকাশ চেয়েছিল আমি নিজে উপস্থিত থেকে ওর বউকে দিই।

রতন ঘাসির বউকে ধরে ধরে ব্যাংকে নিয়ে গেল ওদের এক দূর-সম্পর্কের ভাগ্নে আর ওদের সরপঞ্চ, ঝাটিনিয়ার মোড়ে সরকারি ব্যাংকে টাকাটা জমা করিয়ে আসতে। কাঁচা টাকা ঘরে রাখলে দু'দিনেই সাফ হয়ে যেত। আমিই বলেছিলাম ব্যাংকে অ্যাকাউণ্ট খুলতে ওর নামে। ভূতগ্রস্তের মতো টলে টলে হাঁটছিল রতনের বউ। কোলের ছেলেটা একেবারে শুকিয়ে গেছে এই চার-পাঁচদিনে। গতকাল থেকে অনেক সাধ্যসাধনার পর ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়েছে। ইতিমধ্যে অবশ্য অনেক জল গড়িয়েছে।

ভানু সিং-এর চার ছেলে, ওর সম্বন্ধীর দুই ছেলে আর রাম অবতারের ছেলেরা বারিডি থানায় সারেণ্ডার করেছে। আগাম জামিন পেয়ে গেলে আমাদের মুখরক্ষে হত না। এটা পুরোপুরি বেদপ্রকাশের টেরর ট্যাকটিকস-এর ফল। তিন সেকশন ফোর্স নিয়ে রাজপুত মহল্লার গলিতে গলিতে টহল দিইয়েছিল বেদপ্রকাশ, শাসিয়েছিল যদি আসামীরা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ না করে বুলডোজার দিয়ে সব ঘর সমান করে দেবে। শাসানিতে কাজ হয়েছিল। আমাদের ইনফরমেশন ঠিকই ছিল, ওরা নিজের আত্মীয় বন্ধুদের ঘরে গিয়েই লুকিয়েছে আশপাশের গাঁয়ে। পুলিশকে বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হয়নি। সোনাবিড়া এমন কিছু বনেদি গাঁ নয়, বর্ধিষ্ণুও না। সরু কাঁচা রাস্তা, এ মহল্লা থেকে ও মহল্লায় গেছে। ছোট ছোট নিচু ঘর, নরক-কুণ্ডের মতো গোয়াল, লুনির খালের ওপর কংক্রিটের সাঁকোটা মেরামতের অভাবে কংকালসার হয়ে ঝুলছে। আঙিনায় বেশির ভাগই থেথর খুঁটির বেড়া। রোগা ডিগডিগে ছাগলের পাল এখানে ওখানে মুখ দিয়ে বেড়াচ্ছে। আদিবাসী গাঁয়ে যেমন লাল-কালো রঙে রাঙানো মাটির ঘর, গোবরলেপা আঙন, নধর গাইগোরু মোরগমুরগি দেখা যায়, তেমন ছিরিছাঁদের গেরস্তপনার চিহ্ন এ গাঁয়ের যাদব হরিজনদের ঘরে নেই। রাজপুতদের ঘরগুলো অবশ্য বড়সড়, টালির ছাদ। ওদের সাত-আটটা পরিবার মিলে এ গাঁয়ের রেশন দোকান, হোলসেলের চিনি ও কয়লা, মুদিদোকান আর এক নম্বরি ধানজমি সব কিছুর ওপর কব্জা জমিয়ে রেখেছে।

রতন ঘাসি সম্প্রতি 'দলিত খেতমজুর মোর্চা' বলে এক সংগঠন খুলেছিল। জ্যালজেলে কাগজে ছাপানো কয়েকটা ইশ্‌তেহার এনে দেখাল সরপঞ্চ। এই গাঁয়েরই পাঠশালা থেকে হাইস্কুল পর্যন্ত গেছিল রতন, তার ওপরে আর উঠতে পারেনি। রতনের ন্যূনতম মজুরি, সংগ্রামের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধানের

মরসুমে খেতের কাজ চলতেই থাকল—মজুরকে দিনে পাঁচ টাকা, তার বউকে চার টাকা চার আনা ও এক কাঁসি পান্তা। মোর্চার তরফ থেকে রতন, গঞ্জু ও গণেশ কেস করে দিয়েছিল চার-পাঁচটা। লেবার ইন্সপেক্টর আসতে দু'মাস নিল, ততদিন ওরা তিনজন ও বাকি পাঁচজন যাদের পক্ষ থেকে কেস হয়েছিল পুরোপুরি বেকার। কোনও রাজপুত, ভূমিহার, যাদব কড়েআঙুল তুলেও ওদের কাজ দেবে না।

লেবার ইন্সপেক্টর যেদিন এল, ভানু সিংহের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া দাওয়া হল। খেয়েদেয়ে চার প্যাকেট সিগারেট নিয়ে চলে গেল ইন্সপেক্টর, রতন ঘাসির দলিত মোর্চা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। গণেশরা ফিরে গেল সেই পুরনো রেটে কাজ করতে—রতন গলা ফাটিয়ে গালাগাল দিল ওদের। মরিয়া হয়ে গেছিল রতন, না হলে আর কাটিনিয়ার উকিলের পাল্লায় পড়ে। ভানু সিংহের ছেলের কিরানা দোকানের ভেজাল তেল খেয়ে ওরা বড় হয়েছে সেই মায়ের দুধ খাওয়ার বয়স থেকে। তেল কেনেই বা কই ওরা! মাসে দু'তিন টাকার বড় জোর। আলু বা ঝিঙে পুড়িয়ে নিয়ে একটু তেলে ছুঁইয়ে খায়, নাহলে পায়রাও পোড়ায়, চুনো মাছ বাটিতে সেদ্ধ করে নেয়। রতনকে ওরা সন্দেহ করবে ভাবেনি। ভেজালের কেস-এ বুড়ো প্রভু সিংহের লাইসেন্স ক্যানসেল হয়ে গেল র‍্যাশন দোকানের, হাতে হাতকড়া পড়ে। শেষে জেলায় দৌড়ে সাতঘাটের জল খেয়ে তবে রক্ষা। প্রভু সিংহের ছেলেরা ভোলেনি কিছুই—অচ্ছুৎপুত্রের এই আকাশছোঁওয়া দুঃসাহস, রাজপুতের ঘরে পুলিশ ডাকার হিম্মৎ।

হাজামদের ছোট ছেলেটা বলছিল, কারণ সেদিন দুপুরে ও পিছু পিছু যাচ্ছিল রতনের, বগলে কাগজপত্র রতন যাচ্ছিল কোথাও কাজে। প্রভু সিংহের নাতনি কচি গলায় ওকে ডেকেছিল, ওদের নতুন বাছুরটার গলায় দড়ি জড়িয়ে গেছে, খুলে দেবার জন্য—বাবুলের বেড়ায় ঘেরা উঁচু সবুজ পাঁচিলের পেছনে সেই যে রতন মোড় নিল, আর ফেরেনি।

চার্জশিট দ্রুত করতে হবে। মাঝখানের দু'তিনদিন ছেড়ে সোনাবিড়ায় আবার গিয়ে বেদপ্রকাশ অবাক। বাবিডি থানার লকআপে সাতজন হরিজন যুবক। থানাবাবু ত্রিদিব সিংহ নতুন এফ আই আরগুলো খাতা খুলে দেখিয়েছিল ওকে। আশ্চর্য কথা, গতরাতের মধ্যে রাজপুতদের একত্রিশ একর ধানজমি আলে ও ভেতরে পোঁতা অন্তত পঞ্চাশটা বিশাল বিশাল তেঁতুল, শিরীষ ও শাল গাছ গুঁড়ির ওপর থেকে নির্মমভাবে কাটা হয়ে গেছে—পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরনো এক-একটা গাছ। অপরাধী গণেশ, ভরত, গণু ঘাসি প্রমুখ সাতজন। এদের ঘরের পিছওয়াড়ায় পাওয়া গেছে কুড়ুল, করাত, দা ও কাঠ কাটার যাবতীয় সরঞ্জাম, কাটা কাঠের টুকরোটাকরা।

বড়বাবু তদন্ত সেরে ফিরেছেন সকালে। বিকেলের মধ্যেই গ্রেপ্তার। বেদপ্রকাশ সোনাবিড়ায় ফিরে এল আবার ত্রিদিব সিংহকে নিয়ে। সরেজমিন তদন্ত। ধানের জমির আগাপাশতলা ঘুরে লুনির খাল পেরিয়ে আবার

রাজপুতে পাড়ায়। সারা গাঁ শুনশান। হরিজন টোলার মেরে বউ আতঙ্কে ভিতরে সেঁধিয়েছে। রঘু সিং-এর ঘরের সামনে গোরু মোষ বাঁধা। রঘু বাইরে বেরিয়ে এসেছে। বেদপ্রকাশ থমকে দাঁড়াল—আমরা ভেতরে যাব! আজ্ঞে, রঘু মিনমিন করে বিনতি জানায়, গোয়ালে ঘরের বউরা গো-পুজনের জন্য মাটি লেপছে। ওদের সরে যেতে বলো! বেদপ্রকাশ গম্ভীর। গোয়ালের কোণায় দুই বিশাল মহীরুহ তিনটুকরো হয়ে পড়ে। তার ওপর পোয়াল চাপিয়ে ঢাকাঢুকি দিচ্ছিল তিনজন মজুর। লগনু সিং-এর শোবার ঘরে ইয়াবড় এক শালের গুঁড়ি। ভীমসিংহ, তারাসিংহ, মন্নুসিংহ—দু'ঘণ্টার মধ্যে পনেরোটা রাজপুতের ঘর থেকে অন্তত চল্লিশটা কাটা গাছ টেনে এনে ফেলল বেদপ্রকাশ। বাকি সব চালান হয়ে গেছে ট্রাকে আজ ভোরেই।—মাটিতে ট্রাক টায়ারের দাগ দেখলেন ধানখেতে, না চোখ বুজে ছিলেন?

ত্রিদিব সিংহ ঘামতে আরম্ভ করেছে।

আমি কিন্তু সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। পুরো ঘটনাটা বেদপ্রকাশ বর্ণনা করার পর বললাম, হরিজনদের জড়াবার জন্য এরা নিজেদের জমির এতগুলো গাছ কেটে দিল?

বেদপ্রকাশ হাসল, ফোরেনসিক মেডিসিন-এর কেস রেকর্ড-এ পড়েছি প্রতিবেশীকে ফাঁসাবার জন্য নিজের শিশুকন্যাকে রেপ করিয়েছে বাপ, এও তো হয়! কটা গাছ তো তুচ্ছ!

সোনাবিড়ার আড়ালে আবডালে রাজনৈতিক দলগুলো উঁকিঝুঁকি মারতে লেগেছে। শান্ত যে সবুজ পুকুরে ঢেলাটি পড়ে না, সেখানে কুমির ভেসে উঠেছে। সময়ে এই ইস্যুর থেকে ফায়দা ওঠাতে চায় সবাই। চৈত্র শেষ হয়ে এল। খরায় পোড়া সোনাবিড়া থেকে সন্ধেবেলা ফিরছি, পশ্চিমের আকাশ টক্‌টকে লাল, কাঁচা রাস্তা থেকে ওঠা ধুলোর গন্ধে মুখের ভিতরটা ভার হয়ে আছে। মাঠের ধারে একটা টিউবওয়েল। বংশীকে বললাম একটু রাখ, চোখেমুখে একটু জলের ছিটে দিয়ে নিই। রুমালে মুখ মুছছি, দেখি রতনের বউ। জল আনতে এসেছিল। কাঁখে মাটির ঘড়া, আর এক কাঁখে বাচ্চাটা। আমাদের দেখে দু'এক মুহূর্ত ইতঃস্তত করল, মুখটা শীর্ণ, রুক্ষ চুলগুলো ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে, চোখের কোলে কালি। তারপর মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে চলে গেল। পশ্চিমের লাল আকাশের দিকে মুখ করে ওর ক্লান্ত আশাহীন একাকী এই চলে যাওয়া হঠাৎই যেন শ্মশানের দেওয়ালে আঁকা কাঠকয়লার ছবির মতন বসে গেল আমার অন্তরাত্মার ভিতরে।

চাঁদপুরের পেট্রোল পাম্পে ঢুকছি তেল নিতে, দেখি বেদপ্রকাশের জিপ। থার্মাল হয়ে আসছি। বেদপ্রকাশ আমাকে নমস্কার করল। আজ সাদা পোশাকে।

আবার স্ট্রাইক নাকি?

নাঃ! ওর গোঁফজোড়া কৌতুকে নাচছে। গভর্নর আসছেন এ মাসের শেষে। রুটটা একটু দেখে দিয়ে এলাম এয়ার স্ট্রিপ থেকে। বংশীর কাছ থেকে

ইশারায় গাড়ির চাবিটা চেয়ে নিল বেদপ্রকাশ। আমাকে বলল—য়ু মাইন্ড ইফ আই ড্রাইভ?

য়ু আর মোস্ট ওয়েলকাম।

প্রখর নিস্তব্ধতা। জিপের যেটুকু আওয়াজ আর চারপাশে পাখপাখালির। শহর ছাড়িয়ে রাস্তাটা নেমে গেছে উঁচুনিচু ন্যাড়া জমির ভিতর দিয়ে। রাস্তার দু'পাশে বুনো ঘাস ও আকন্দর ঝোপ, আর অজস্র পলাশগাছ। সূর্য অস্ত গিয়ে নীলাভ অন্ধকারে ঢেকে গেছে আদিগন্ত পৃথিবী, নাহলে দিনের বেলা হলে দেখা যেত পলাশের আগুনরঙা ডানার স্পন্দমান রং রোদ্দুরে। নির্বাক জিপ চালিয়ে যাচ্ছে বেদপ্রকাশ। আবছা অন্ধকারে যতটুকু দেখা যায়—ওর কপালে উদ্বেগ, চোখের মণিতে গভীর ব্যথার কাঁপন।

মুখার্জিসাহেব—অনেকক্ষণ পরে বেদপ্রকাশ জিজ্ঞেস করল, একটা কথা জানতে চাই। বে-হিচক্ উত্তর দেবেন।

বলুন না।

যদি দরকার পড়ে পুতলি আর বাবুয়াকে আপনার কাছে ক'দিন রাখতে পারি? আমাদের বড়বাবুর বউ দেখে যেতে পারেন মাঝে মাঝে।

দরকার পড়লে নিশ্চয়ই থাকবে ওরা। লখনই দেখাশুনো করবে ওদের। কিন্তু কী এমন দরকার পড়ল, বেদপ্রকাশজি? ভাবী ভাল আছেন তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সব ঠিক আছে। সকলেই ভাল আছে। শুধু আমি ভাল নেই। আমার দিকে আবার মুখ ফেরায়, আপনি এবার একটা বিয়ে করুন না, আপনার ভূতবাংলোয় একটু জান আসুক।

তাড়া কি ভাই? আপনি ল্যাজ কেটেছেন বলে কি সবাই তড়িঘড়ি ল্যাজ কাটতে দৌড়বে?

হাঃ হাঃ করে হাসে বেদপ্রকাশ। হাসিতে কপালের রগ ফুলে ওঠে ওর।

পরশু সন্ধেবেলা বড়বাবুর স্ত্রী এসেছিলেন আমার বাড়িতে!

কে, জ্যোৎস্নাদেবী?

হ্যাঁ। ওঁর একটা অসুবিধে আছে, জানেন নিশ্চয়ই। আজিজকে বদলি করে দেবার একটা কথা উঠেছে। উনি চান সেটা একটু তাড়াতাড়ি হোক। কিন্তু ডি-সিকে একটু বলতে হবে। ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট একটা এসেছে গত মাসে—ওঁর মেয়ের সঙ্গে আজিজের ব্যাপারটা নিয়ে এখানে টেনশন হওয়া কিছু বিচিত্র না। ঝুমরিয়ার মসজিদের আশপাশের কলোনিগুলোতে কয়েকটা গোপন মিটিং হয়ে গেছে। সারাণ্ডাঘাটের হিন্দু অধিকার সমিতিও ব্যাপারটাতে নাক গলাচ্ছে। কলোনির কিছু লোক আবার অফিসের মধ্যে ব্যারারটাকে উস্কানি দিচ্ছে, অথচ বাইরে ধর্ম ধর্ম করে নাকে কাঁদছে। আমিও খোঁজ নিয়েছি, জেনেছি ওর কোনও গ্রুপ টুপ নেই নিজস্ব। কিন্তু ফিলহাল ওকে সরিয়ে দেওয়াই ভাল। আপনাকে বলতে বোধহয় দ্বিধা হচ্ছে জ্যোৎস্না-দেবীর, আপনি তো ওঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, একটু বলুন ডি সিকে। ওদের অ্যাফেয়ারটা এভাবে গড়াতে থাকলে কে ওকে এখানে বিয়ে করবে, ওদের

বোনেদেরই বা বিয়ে হবে কী করে ?

চিন্তায় আমার ভুরু কুঁচকে উঠেছে বুঝতে পারছি। আজিজ কি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবে মুকুটকে ? যদি ওরা বিয়ে না করে, তাহলে এই সম্বন্ধ অকারণ পাঁক ঘুলিয়ে তুলবে এই সংকীর্ণ শহরে। আর যদি করেও বিয়ে, তার ভবিষ্যৎ চেহারাটা রীতিমত অনিশ্চিত।

আজিজের নীচে তিনটে বোন আছে, কারও বিয়ে হয়নি তাদের। ওর বাবার একটা ছোট দোকান আছে জামলায়, সেখান থেকে রোজ সাত-আট কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে ও অফিসে আসে। এ সবই আমার অফিসে শোনা। হরিহরবাবু, শিয়ারামবাবু—যাঁরা জীবদ্দশায় ওঁর বাবার বন্ধু ছিলেন তাঁদের মুখে শোনা। আজিজকে দেখলে মনে হয় বয়স ত্রিশের ওপর গেছে, শুকনো রোগা চেহারা, বয়স আর বাড়লে ধরা পড়বে না, ঠোঁটে যে হাসিটা খেলে সেটা বাঁকা মনে হয়। ওদের সম্বন্ধটাকে সহজ বা আন্তরিক ভাবতে সর্বদা আমার মন সন্দেহের চড়ায় আটকে যায়।

মুকুটের গোল শ্যামবর্ণ মুখটি, তাতে দুই গভীর কালো চোখ। মাঝখানে সরু সিঁথি কাটা ঘনকালো চুল ও সর্বোপরি ছোট ছোট ভুট্টার দানার মতো দাঁতে নিষ্পাপ হাসিটি, যতবারই শোবার আগে ঘরের আবছা অন্ধকারে বা ট্যুরের রাস্তায় সবুজ দিগন্তের কাছাকাছি ভেসে উঠেছে, আমি ভেবেছি মুকুটের হৃদয়মন বোধহয় কোনও ছেলেমানুষী আক্রোশে আজিজকে সমস্ত কিছু দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইছে, এর মধ্যে যে অন্ধতা আছে তার থেকে ওকে বাঁচানো দরকার। বেচারি ! কীই বা করবে ও ? যখন ওর বয়সী তরুণী মেয়েরা আই এ পড়ার ফর্ম আনতে দৌড়চ্ছে কিম্বা শখের জিনিস কিনছে বাজারে, ওকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে জুনিয়র ক্লার্কের চাকরির ঘানিতে।

অন্ধকার করিডর, মাকড়সার জালে ঢাকা আলমারি, পর্দায় পানের ছাপ। ধুলোমাখা টেবিলের একদিকে বসে যদুনাথ, একদিকে মুকুট—দশটা থেকে ছটা, কোনওদিন সাতটাও বেজে যায়। ওর কোনও স্বপ্ন নেই, কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই, ভবিষ্যৎ নেই। ও চাকরি না করলে মনীষা আর শান্তির পড়া হবে না, খোকনের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। যদিবা চাকরি ছেড়ে দেবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে ওঠে মনে, এইসব পরিণতির অন্ধকার মুখ ওকে নিশ্চয়ই সন্ত্রস্ত করে তোলে। ওর নিজেকে মনে হয় অপরাধগ্রস্ত। আজিজের সঙ্গ ওকে এই হাঁপধরা ভবিষ্যতের হাত থেকে রিলিফ দেয়। ওকে যে একজন চায়, ভালবাসে —এই বোধ ওর মধ্যেকার ছোট হয়ে হেরে যাবার দুঃখকে নির্মূল করে দেয়। অফিস ছুটির পর দু'একবার ওদের দেখেছি, মেন হলের বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করতে। আজিজের সাইকেলের বেলটা বাজাচ্ছে মুকুট আর ছেলেমানুষী হাসিতে ভেঙে যাচ্ছে। কচি নিমগাছের ডালের মতো মনে হয়েছে ওকে বিকেলের মায়াবী আলোয়। বাড়ি ফিরেই নাকি ও বিষাদের মুখোশ পরে নেয় মুখে।

নির্জন, স্বপ্নহীন আমার ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছি। বেশি রাত হলেই

দেওয়ালগুলো যেন কাছে এসে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে চায়। পেপারওয়ার্ক শেষ হতে হতে মধ্যরাত, তারপরেও অনেকক্ষণ বসে বসে বই পড়ি। দারাং পাহাড়ে পাখির কলরবে সকাল হয়ে যায়।

বেদপ্রকাশ

য়হ্ তেরা নূর হৈ যো
চেহ্‌রে পে পড় রহা মেরে
বর্‌না কৌন পুছতা মুঝে
অন্ধেরে মেঁ।

এ তোমারই আভা আমার ওপর পড়ে আমার মুখ আলোকিত করে তুলেছে। নাহলে এই অন্ধকারে আমাকে কেই বা দেখত!

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এক দারুণ শীতের রাতে খাগাড়িয়ার ডাকবাংলো থেকে এই কবিতাটি উদ্ধৃত করে এক দীর্ঘ—দীর্ঘ চিঠির সঙ্গে সীমাকে পাঠিয়েছিলাম। কাগজটা সাদা হ্যাণ্ডমেড পেপার—লালচে হয়ে এসেছে, কবিতাটা অবশ্য দিব্যি জ্বলজ্বল করছে আমার চেতনায়। আমাদের বুকর‍্যাকে একটা উপন্যাসের ভেতর থেকে চিঠিটা বেরিয়ে এসেছে। বইগুলো বার করে ঝেড়ে মুছে আবার সাজাচ্ছিলাম। সীমা রান্নাঘর থেকে একবার বেরিয়ে দেখে চলে গেল।

খানিকপরে বাবন এসে বলল, দিন সাহেব, আমি করে দিচ্ছি।

বললাম, না, তুমি যাও।

আসলে আজ আমার খুব কাজ করতে ইচ্ছে করছে। অফিসের সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নেই, এমন সৃষ্টিছাড়া কাজ। আজ সকালে উঠে পুতলির নখগুলো কেটে দিয়েছি, বাবুয়া ভয় পেল, কাছে এল না। ওরা এখন ভেতরের বারান্দায় পায়রাদের খাওয়াচ্ছে।

এতদিন বাইরের কাজে এত ব্যস্ত থাকতাম, ঘরে আসতাম অতিথির মতো। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি কখনও চোখে পড়ত না। হঠাৎ নাড়িতে টান পড়ে আমার ঘোর কেটে গেছে। মাস ছয়েক আগে সন্ধেবেলা খাবার টেবিলের ওপর যশোবন্ত পাবলিক স্কুলের রঙচঙে প্যামফ্লেট দেখে মনে মনে হেসেছিলাম। সীমার এক বাতিক—প্রবল মোহ কনভেণ্ট এডুকেশনের। ছেলেমেয়েকে বানাতে হবে লাখের মধ্যে এক—তারা যেন দুধের দাঁত পড়ার আগেই জয়েণ্ট এণ্ট্রান্সের মেরিট লিস্টে উদয় হবার স্বপ্ন দেখতে শেখে, দিল্লির সবচেয়ে প্রখর কলেজ থেকে বেরিয়ে হারভারডের দিকে উড়ে যায়। সারাণ্ডাঘাটে ওদের উপযুক্ত কোনও স্কুল নেই, এই নিয়ে সীমার মনে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও রঙিন স্বপ্ন দেখে যদি সীমার মন শান্তি পায় পাক, কিন্তু দুই ছেলেমেয়েকে হস্টেলে রেখে রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে পড়াবার মতো সামর্থ্য সত্যিই আমার নেই। বাবুয়া অবশ্য খুবই

ছোট। ওকে স্কুলে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যে রাস্তায় এগোবার কথা সীমা এখন ভাবছে, তা যেমনই কুটিল, তেমনই পাঁকে ভরা। আশ্চর্য, আমার সঙ্গে কোনও পরামর্শ করার প্রয়োজন আছে বলে ভাবেনি সীমা। একটি কথাও জানায়নি আমাকে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা দিক থেকে ব্যাপারটা জানলাম পরশু।

রামপুর থেকে একজন প্রৌঢ় শিখ এসেছিল, লোকাল এম এল এর চিঠি নিয়ে। ভাষাটায় অদ্ভুত একটা মোচড়—'আপনার পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী এই পত্রবাহক'-এর কেসটা ব্যক্তিগত মনোযোগ দিয়ে দেখবেন।

আমার পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী? একে তো কখনও দেখিনি? বিনীত সর্দারজি হাত জোড় করে বলেছিল—আমার ছোট ভাই খাজান সিং যখন অ্যারেস্ট হয়েছিল, ওকে জামিনে ছাড়াতে এসেছিলাম, তখন দেখে থাকবেন আমায়।

অসৎ লোকেরা লজ্জাহীন হয়। রোজ কত লোক বেইলড আউট হচ্ছে, তাদের মুখ মনে থাকে নাকি? খাজান সিংহ কন্ট্রোলের চিনির বস্তা ব্ল্যাকে বিক্রি করে দিয়ে গোডাউনে চিনির সঙ্গে গমের ভুষি মিশিয়ে ভরে রেখেছিল। প্রিভেনশন অফ ব্ল্যাকমার্কেটিং অ্যাক্টে কেস হয়ে এক বছর জেলের আদেশ হয়েছে কিছুদিন আগে। খাজান সিংহ আমার পরিবারের হিতকাঙ্ক্ষী? হিতাকাঙ্ক্ষার কতরকম চেহারাই দেখতে হবে এই চাকরিতে!

বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি, ডি এস পি সাহেব। খাজান সিংহের একটিই মেয়ে। চার-পাঁচ হবে বয়স। মাথায় টিউমার হয়েছে বেচারির। এখানকার ডাক্তাররা ধরতে পারছে না, ম্যালিগন্যান্ট বা বেনাইন। বম্বে নিয়ে যেতে হবে। খাজান সিংহ জেলে যাবে কদিনের ভেতর, আপনার মতো মানুষের দয়া না পেলে। তখন ওর মেয়েকে বউকে কে দেখবে বাবু সাহেব? খাজান সিং-এর বউ শয্যাশায়ী, আমরা দিনরাত ভেবে ভেবে পরেশান হয়ে যাচ্ছি।

এই স্টেজে আমার আর কিছু করার নেই। সরকার কেস অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে। এসব সেন্টিমেন্টাল কথা বলে আমাকে বিব্রত করবেন না আপনারা। যান—।

দরজার কাছে ওড়নায় আধঢাকা এক শিখরমণীর মুখ একবার দেখা দিয়েই সরে গেল। লোকটা স্ত্রীকেও নিয়ে এসেছে মমতা আদায় করার জন্য।

আমাকে আর একটু সময় দিন বাবুজি। দূর থেকে এসেছি। আমরা উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। পার্টি এবার হাইকোর্টে যাবে সরকারের অর্ডারের বিরুদ্ধে। এই সময় আপনি যদি একটা নিরপেক্ষ তদন্ত রিপোর্ট পাঠাতে পারেন, তাহলে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের কেসটা কমজোর হয়ে যায়? একটা পরিবার বেঁচে যায় হুজুর।

এরকম কেস নতুন নয়, সীতামঢ়ীতে আগে একবার হয়েছে, দু'সাল আগে। নিরপেক্ষ রিপোর্ট দেব আমি? কার অর্ডারে? আপনার দুঃসাহস, আপনি

একজন ক্রিমিনালকে বাঁচানোর জন্য পুলিশের সাহায্য চাইতে এসেছেন ? যান এখান থেকে। চেনেন না আমাকে—। বিফোর আই টারন্ ইউ আউট—গো !

প্রৌঢ় হাকিম সিং নড়ল না, ওঁর কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ির ভিতর দিয়ে রহস্যমাখা বিষণ্ণ এক হাসি ফুটে উঠল। বলল, হুজুর, আপনারা দয়া করেন তাই আমাদের সাহস হয়, নইলে আমাদের আর 'অওকাৎ' কী ? সোশ্যাল কাজও কিছু কিছু আমরা করি। খালি বিজনেস করি না। সেই সুবাদে আপনাদের সঙ্গে জানাশুনো হয়েই যায়। নওয়াদার উকিলসাহেব খবর পাঠালেন, আমার মঝলা ভাই অমর সিং গিয়ে সব সেট্ করে এল। ডি এস পি সাব বেটিকে-বেটাকে পাব্লিক স্কুলে পাঠাতে চান, অচ্ছি বাৎ ! আমাদের যা সাধ্যে কুলোয়, আমরা করেছি। আপনার বেটি আর খাজান সিংহ-এর লড়কির কতই বা বয়সের তফাত বাবুসাহেব ? কাল আপনার মেয়ে ঝকঝকে শানদার ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যাবে, আর খাজানের মেয়ে বিনা ডায়াগনোসিসে জেলা হাসপাতালে মরে যাবে—তাই বা কী করে মেনে নিই ! আপনিই বলুন ?

নওয়াদার উকিলসাহেব, মানে সীমার বাবা। নিজের অজান্তেই শরীরের ভেতর শীত-শীত করে উঠল। অপরাধী ব্যবসায়ীর দাক্ষিণ্যে নাতি-নাতনিকে পাবলিক স্কুলে পাঠিয়ে নিজের বিবেকের কাছে পবিত্র হয়ে বসে থাকতে চান। এবং এই সামাজিক পারিবারিক ফয়সালায় ছেলেমেয়ের বাবার যে কোনও ভূমিকা থাকতেও পারে, ভুলেও মনে করেন না।

অফিস থেকে সময়ের আগেই বাড়ি চলে এলাম। সীমা অকাতরে ঘুমোচ্ছিল। পুতলি ও বাবুয়া বারান্দায় একরাশ ইট ও বালি কাদা এনে ব্রিজ বানানোর সেই শাশ্বত খেলায় ব্যস্ত। আমাকে দেখে দু'জনে দৌড়ে এল। এত সকাল সকাল বাবাকে কখনও বাড়িতে দেখেনি ওরা।

কাল আমি সীমাকে মেরেছি। জন্তুর মতো অন্ধ হয়ে গেছিলাম রাগে, আমাদের দারুণ ঝগড়া হয়েছিল। শেষকালে নিজেকে সামলাতে পারলাম না সীমা যখন শাসাল—বাচ্চাদের তুলে নিয়ে চলে যাব নওয়াদা, উকিলের মেয়ে আমি, দেখি তুমি কী করে ঠেকাও, তখন সব মধ্যবিত্ত ভদ্রতার বাঁধ ভেঙে গেল আমার। মার খেয়ে সীমা কাঁদেনি, উলটে গালাগাল দিয়েছিল। তারপর বাড়ির কাপড়েই চপ্পল পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ফিরে এল নিজেই, রাত সাড়ে দশটা নাগাদ। হয়তো ইরিগেশন কলোনিতে কারও বাড়ি গিয়ে বসেছিল। ঈশ্বরের দিব্যি, না এলে আমি ওকে খুঁজতে যেতাম না। এমন দুর্বার ঘৃণা হয়েছিল সেই মুহূর্তে ওর প্রতি !

পুতলি আর বাবুয়াকে খাইয়ে শুইয়ে দিলাম, নিজে শুলাম ওদের মাঝখানে। সীমা এসে গিয়েছিল, বেডরুমের ভেতর ও আসতেই আমি উঠে চলে এসেছি। সেই থেকে আমার মনের মধ্যে আমূল থেকে গেছে লম্বা এক কাঁটা—আমি পুতলি আর বাবুয়াকে চোখের আড়াল করতে ভয় পাচ্ছি। আইনের পরামর্শ নেওয়া দরকার অবিলম্বে। যদি ও সেরকম ড্রাস্টিক কিছু

Agartala, West Tripura

করেই বসে, বাচ্চাদের লিগাল কাস্টাডি কে পাবে—ও না আমি ? সীমার সঙ্গে কথা বন্ধ। পুতলি আর বাবুয়া আমার পায়ে পায়ে ঘুরছে, ওদের মনে অনুচ্চারিত কিছু আশঙ্কা, কিছু ভয়। ওরাও বুঝতে পারছে ফাটলটা সোজাসুজি নেমে এসেছে আমার ও সীমার সম্পর্কের মধ্যে।

আজ ভোরে ওদের নিয়ে ব্যারেজের রাস্তায় বেড়াতে গেলাম। ভারী মনোরম ছিল আজকের ভোরবেলাটা। মেঘলা কিন্তু বৃষ্টি নেই, হাওয়ার ঝাপট এসে লাগছিল চোখেমুখে। পাহাড়ের পিঙ্গল সবুজে অনিঃশেষ শান্তি, সারি সারি ডিঙিনৌকো চলেছে—মাছধরা জেলের দলের নৌকো। এক-একটা নৌকো যায় আর জলের ভিতর পাহাড়ের ছায়া দুলতে দুলতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পুতলি চুল উড়িয়ে, ফ্রক উড়িয়ে খুব দৌড়োচ্ছিল।

ফেরার পথে মিঃ মুখার্জির বাড়ি হয়ে এলাম। আজিজ চলে গেছে বদলি হয়ে সারাংগা। যাবার আগে অপ্রীতিকর একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছিল—মানি অর্ডারের টাকা পাঠিয়েছিল মুকুটকে। তাই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি। জ্যোৎস্নাদেবী অবশ্য ডাকপিওনের কাছ থেকে টাকা নেননি, ফিরিয়ে দিয়েছেন। মায়ে-মেয়েতে কিছু কথা-কাটাকাটিও হয়ে গেছে। বদলিটা খুবই দ্রুত হয়ে গেল আজিজের। হয়তো ওর মা জেলা অফিসে কাউকে ধরেছিলেন। মিঃ মুখার্জি বলছিলেন, ওদের গ্রাম থেকে মেয়েটির জন্য বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে একটা। তবে মুকুট কি বিয়ে করতে রাজি হবে ? মনে হয় না !

বাচ্চারা কল-কল করে টিলার ওপর দৌড়ল। পারিজাতবাবুর বাড়িতে যাওয়ার এই রাস্তাটা ভারি সুন্দর—নুড়িপাথরে ঢাকা আঁকাবাঁকা, দুই পাশে পাঁচমেশালি বড় বড় গাছ, তাদের শরীর থেকে বর্ষার সুগন্ধ বেরোচ্ছে। রাস্তার শেষে কেনটাকি ঘাসে ঢাকা লন, লন পেরিয়ে ঢাকা বারান্দা। পারিজাতবাবু তখনও রাতের পোশাকে। লনে ছোট টেবিলে চেয়ার নিয়ে বসে কী লিখছেন, পাশে চায়ের পট, কাপ। আমাকে দেখে হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

কী লিখছিলেন ?

কবিতা।

আপনি বাংলায় লেখেন ?

হ্যাঁ। অন্য কোনও ভাষায় লেখার মতো আত্মীয়তা নেই, ব্যাকরণের সঙ্গে।

দেখি ?

কবিতা আর কী দেখবেন, এইটা দেখুন !

সকালের কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন। প্রথম পাতার নীচের দিকে ডানদিকে মাঝারি অক্ষরের হেডলাইন ও প্রায় চারকলম খবর।

নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছে। আপনার কী মনে হয় ?

সব বোগাস। আপনাকে এত তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে দিচ্ছি না আমরা। আপনি তো এখনও একবছর কমপ্লিট করেননি।

রাজধানীতে যারা আছে তারা বছর মাসের হিসেব রাখেন না, বেদ-

প্রকাশজি। মাফিয়া কার জন্য কত দামের টিকিট এঁটেছে, সেটাই আসল কথা। আমরা দু'জনে যেটুকু পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছি সেটুকু তো রয়েই যাবে। আমার কোনও দুঃখ নেই, যদি যেতেও হয়।

পুতুল, বাবুয়া কাম অন, আমরা যাব! আমার মনে পড়ে গেল, আজ রবিবার। সীমার সূর্যপুজো, উপোস। মনের ভেতরটা বিস্বাদ হয়ে গেল আবার।

আমার আপত্তি আছে। আপনি এত তাড়াতাড়ি যাবেন না মিঃ মুখার্জি। আমি বড়—

প্রবল অনিচ্ছেয় বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজের মতো কথাটা উড়িয়ে দিলাম —আমি একা হয়ে যাব তাহলে!

বারান্দার সামনে বড় দেওয়াল আয়নায় আমার ছায়া পড়েছিল। খাবলা খাবলা সাদা দাগ কপালে, গালে ঠোঁটে—ঠোঁটে কালচে সাদা ছোপ পড়তে লেগেছে। সীমার গালে চড় কে মেরেছিল? বীভৎস কোনও ইতর প্রাণী? এই কি সে? তাহলে আমি কে?

পারিজাত

ঢাকা বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে আছি। বাঁধের জলে ঝিলমিল করছে জ্যোৎস্না। রাত দেড়টা বাজে এখন। ঘুম আসছে না। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়েছি আবার। রাতচরা পাখিরা মাঝে মাঝে ডাকাডাকি করে উঠছে—এক গাছ থেকে অন্য গাছে মন্ত্র বিনিময় চলেছে। বাগানে আর একটু এগিয়ে দাঁড়ালে এখন দেখা যাবে ব্যারেজের বাঁধানো রাস্তা—সিকিউরিটি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে এ মাথা থেকে ও মাথা। তারই সঙ্গে সমকোণে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যেন চ্যানেলের দীর্ঘ জলরেখা উজ্জ্বল এক পথের মতো পড়ে আছে। পঞ্চাশ কিলোমিটার গেছে এই জলপথ সপ্তপুরা স্টিল প্ল্যান্টের রিজার্ভার পর্যন্ত।

দিন পনেরো আগে মুকুটকে যখন বাড়ি পেঁৗছে দিয়ে একা একা ফিরে এলাম সেদিনও বিনা ঘুমে অনেকটা রাত কেটে গেছিল। কী আশ্চর্য মানুষের মন! যখন জসীমপুর থেকে ফিরে অন্ধকার বারান্দায় ওকে বসে থাকতে দেখেছিলাম, হঠাৎ মনে হয়েছিল জিপ ঘুরিয়ে ফিরে চলে যাই। ওর সঙ্গে সেদিন সন্ধেবেলা মুখোমুখি হবার মতন কোনও মানসিকতা ছিল না আমার। এটা কাপুরুষোচিত হতে পারে। তবে কদিন ধরেই মনে হচ্ছিল, যতটা শোভন তার চেয়ে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছি ওদের, বিশেষ করে মুকুটের ব্যক্তিগত ব্যাপারে। যদিও জানি সঙ্কোচের সঙ্গেই জ্যোৎস্নাদেবী আমার মত চেয়েছেন আভাসে ইঙ্গিতে, আমাকে স্পষ্ট বলতে পারেননি বলে বেদপ্রকাশের কাছে ছুটে গেছেন, তবুও আমার এইভাবে জড়িয়ে পড়ায় মুকুটের কতখানি সায় আছে আমার জানা নেই। আর মুকুট তার সব জেদ, ছেলেমানুষী লড়বার দুঃসাহস

মিশিয়ে এমন এক স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব যাকে চোখের আড়াল করা অসম্ভব।

সেদিন স্বভাবতই ভেবেছিলাম, মুকুট ছুটে এসেছে আমার ওপর রাগ ও অভিমানে। ওর পক্ষে এটাই ভাবা স্বাভাবিক যে আজিজের বদলিটা আমরাই উঠে পড়ে করিয়েছি। হয়তো ঝগড়া করবে বা কান্নাকাটি, অথচ ওকে দেবার মতো কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যুত্তর নেই। অথচ তেমন কিছুই করল না ও। ওর চোখ দুটো ঈষৎ লাল ও ফোলা—অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে এলে যা হয়। ঠিকই শুনেছিল মুকুট—সারাংগার বদলির অর্ডার আজিজ নিজেই করিয়েছে, ফাইলের প্রায় পিছু ধাওয়া করে। নাহলে এত দ্রুত হত না। জেলা অফিসের একজন কেরানীকে কিছু টাকাও দিয়েছে আজিজ। মুকুন্দ বলে একটি ছেলে আছে আমাদের অফিসে। যার কাকা কাজ করে জেলায়, সেই এসে বলেছে মুকুটকে। মুকুট আশ্চর্য হয়েছে, দুঃখ পেয়েছে, আর তার চেয়েও বেশি বিশ্বাসভঙ্গের আঘাত।

আপনার কী মনে হয় এটা সত্যি ?

কী এসে যায়, আমার মনে হওয়া না হওয়ায় যখন এর চেয়েও মর্মান্তিক দুঃসংবাদ ওকে দিতে হবে। কথাটা ওকে বলব কিনা কয়েকদিন ধরেই ভাবছি। আজ ও নিজেই চলে এসেছে আমার কাছে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা মৃতপ্রায় ইঁদুরের দেহের ওপর আজ থেকে ষোলো বছর আগে গরম জল ঢেলে দিয়েছিল এক কিশোর। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল, ছোট্ট শরীরটার থর থর করতে করতে একসময় থেমে যাওয়া। মা এসে ঠাস ঠাস করে চড় মেরেছিলেন দুই গালে—দয়ামায়াহীন, নিষ্ঠুর, কী করে তুই এমন হলি পারিজাত, আমাদের ছেলে হয়ে ?

খবরটা এনেছে ডি আই বি'র খুব নির্ভরযোগ্য একজন লোক। কমিউনাল টেনশনের খবরগুলো এর আগেও ও এনেছে যথাসময়ে, তৎপরতার সঙ্গে। বেদপ্রকাশ জানতে পারে সবচেয়ে আগে। তারপর আমাকে জানায়।

করিমগঞ্জের সালিমুদ্দিন মহম্মদ আজিজের শ্বশুর। দু'বছর আগে বিয়ে করেছে আজিজ। অবশ্য বউকে এখনও ঘরে আনেনি। সালিমুদ্দিন আজিজের বাবার ব্যবসায় কিছু টাকা ইনভেস্ট করতে চায়। সেটাও আটকে আছে। এবার ঘটনাগুলোর পর আজিজের ওপর চাপ, বউকে ঘরে আনো। চাপ পড়েছে মহল্লার তরফ থেকে। ব্যাপারটাকে আর ঠেকানো যায় না। তাই তড়িঘড়ি এই বদলি।

তোমাকে কখনও আজিজ বলেনি যে ও বিবাহিত ?

সাদা পাণ্ডুর দেখায় মুকুটের শ্যামবর্ণ মুখ। আমার টেবিলের ওপর রাখা পিনকুশনের পিন একটা করে তুলছে আর ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

কখনও ওকে জিজ্ঞেস করিনি।

কিন্তু ও কি তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি কোনওদিন ?

দিয়েছিল। কিন্তু এসব কথা কিছু বলেনি।

আমি স্থির হয়ে বসে মুকুটের চোখের জল দেখছিলাম সেদিন। একটার

পর একটা ফোঁটা চিবুকের ডোল বেয়ে ঝরে ঝরে ওর শাড়ির সাদা কালো ডোরার ঘেঁষাঘেঁষি অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে।

আমি এখন কী করব বলুন তো? অফিসের বুড়ো লোকগুলো আড়ালে যা-তা বলাবলি করে। পিওনগুলো সামনেই টিটকিরি দেয়। এবার তো আমার কাজ করাই মুশকিল হয়ে যাবে। পড়ার জন্য বই নিয়ে যাই বাড়ি থেকে, যতটা পারি ওদের এড়িয়ে চলি। চাকরি তো করতেই হবে আমায়, খোকন চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই। ওই দম-আটকানো অন্ধকারে বসে বসে—ওহ্—

তুমি আই-এর জন্য পড়া শুরু করো মুকুট। আমি বই এনে দেব তোমার জন্য। পড়াশুনোয় এত ভাল ছিলে তুমি—বি এ পাস করো, ব্যাঙ্কে চাকরির পরীক্ষা দিতে পারবে। সারাজীবন এখানেই যে থাকতে হবে তার কী মানে আছে?

আমি কিছু পারছি না যে। জানেন বাড়িতে আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না কেউ, বোনগুলো পর্যন্ত মুখ বেঁকিয়ে থাকে। মাসের মাইনেটা যেদিন মার হাতে তুলে দিই সেদিন মা একটু হেসে কথা বলে, তারপর যে-কে সেই। আমি চাকরি করি বলে নাকি আমার আরাম, আর ওরা উদয়াস্ত খাটছে আমার জন্য! খোকা না থাকলে সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতাম।

আমি মাসিমাকে বুঝিয়ে বলব। ওরাও টেনশনে ছিলেন তোমার জন্য, তুমি তো বুঝতেই পারছ। এখন সব মিটে গেল, ওরা আস্তে আস্তে সবাই তোমার কাছে চলে আসবে, আগের মতন—

কী, কী মিটেছে? কিছুই মেটেনি। এইরকম ভাবে সব কিছু শেষ করে দেবে ও ভেবেছে? আমি যাব—সারাংগা যাব নিজে। কী ভেবেছে কী ও? ওকে আসতে লিখেছি—দেখি ওর কত সাহস, আসে কিনা! আহত বাঘিনীর মতো মরিয়া মুখচোখ মুকুটের। এই অবস্থায় ওকে বোঝানোর চেষ্টা বৃথা।

চলো তোমাকে বাড়ি দিয়ে আসি।

জামা বদলাতে উঠলাম। ভারী একগুঁয়ে, জেদি মেয়ে। আজিজ না এলে ও নিজেই যাবে সারাংগা। নিজের মানসম্মান কিসে তাও বোঝে না।

ডায়েরিটা আজ সকালে পেলাম। শোবার ঘরের একটা টিপয়ের তলায় মরা প্রজাপতির মতন পড়ে আছে। গত সাত-আটদিন লেখার কোনও সময় ছিল না। ঝড়ের মুখে উড়ো পাতার মতন ঘটনাস্রোত আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। আজ সকালে ঘুম ভাঙার সময় থেকে মনে হচ্ছে গায়ে ব্যথা, জ্বরও আছে সামান্য। আটটা বেজে গেছে, রোদের দিকে তাকালে চোখে লাগে।

লখন দেশে গেছে মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে। নতুন যে ছেলেটা আসছে, সে দূর থেকে আসে, কাজেই সাড়ে ন'টার আগে হয়তো পৌঁছতে পারবে না। কালকে আজিজের বউ আর শ্বশুরকে ওরা বাসে তুলে দেওয়া পর্যন্ত

জেগেছিলাম। তারপর কোনও মতে বিছানায় পৌঁছে চাদর গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে শুয়েছিলাম। গত এক সপ্তাহের অনিবার্য ক্লান্তি সমুদ্রের এক বিশাল ঢেউয়ের মতো অতর্কিতে ঢেকে দিয়েছিল আমায়। কখন ঘুমিয়েছি কিছুই মনে নেই।

কোথা থেকে শুরু করব জানি না। কাল শনিবার—আমার কোনও ব্যক্তিগত কুসংস্কার নেই। তবে কখনও কখনও ঘটনার গতির মধ্যে লজিক খুঁজে না পেয়ে মন কুসংস্কারের দরজা খোঁজে। জুলাই মাসের তৃতীয় শনিবার। আমি পুরো মহকুমার অফিসারদের একটা মিটিং নিই—সমস্ত রিপোর্ট এসে জমা হয়। সব ব্লক তহশিল থেকে লোক আসে। আগে এটা ভারি ঢিলেঢালা ছিল। আমি অনেকটা রেগুলার করেছি। সাড়ে দশটা নাগাদ কনফারেন্স হলে সমবেত জমায়েতের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি—অবিনাশ, আমার সেকেন্ড অফিসার বললেন, স্যার, তিন-চারজন এখনও এসে পৌঁছোননি। একটু অপেক্ষা করলে ভাল হত বোধহয়।

কে কে আসেনি?

করিমগঞ্জ, সারাংগা, আমিনপুর।

দে আর অল্‌ওয়েজ লেট! আরম্ভ করুন। এগারোটায় চা এল। ইতিমধ্যে করিমগঞ্জ ও আমিনপুরের অফিসারদ্বয় ঘামতে ঘামতে এসে গেছেন। সবে চায়ে চুমুক দিয়েছি, এমন সময়ে মনে হল অফিসের সামনের রাস্তায় কিছু লোক দৌড়ে যাচ্ছে—জন বিশ-পঁচিশ হবে, আবার রিপোর্ট রিটার্নে মুখ ডুবিয়েছি, অবিনাশ সিং পানের পিক ফেলতে বাইরে গেছিলেন, ফিরে এসে উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, স্যার, একটা গাড়ি পড়ে গেছে মেন ক্যানালে, লোকে তাই দেখতে দৌড়চ্ছে। গাড়ির ভেতরের কয়েকজন লোক সাঁতরে পাড়ে উঠেছে।

প্রাইভেট গাড়ি নাকি? কোনও ক্যাজুয়ালটি?

সন্তু দৌড়ে এসে বলল, স্যার, সারাঙ্গা তহশিলের গাড়ি।

থার্ড অফিসারকে বললাম, আপনি অফিসে থাকুন। অবিনাশকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম। অফিস থেকে মিনিট সাতেকের রাস্তা। মেন ক্যানেলের সঙ্গে সমান্তরাল পাকা রাস্তা চলেছে, বর্ষার জল ছেড়েছে স্লুইস দিয়ে। তোড়ে জল বইছে ক্যানেলে, ফেনায় ফুলে ফেঁপে। আরও একটু এগিয়ে ডান হাতের পাড়ে ছোটখাট জটলা।

অবিনাশ উত্তেজিত মুখে বললেন, ওই যে স্যার, দেখুন দেখুন। জিপের কালো ক্যানভাসটা খালি দেখা যাচ্ছে জলের ওপর। বর্ষার জলে টইটুম্বুর সাপের মতন কেনাল। জিপের বাকি শরীরটা জলের তলায়—ঢেউয়ের তোড়ে অল্প অল্প দুলছে। ভিড়টা ফাঁকা হয়ে পথ করে দিল আমাদের। ওই তো তহশীলদার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় ভিজে শরীরে ঠক ঠক করে কাঁপছেন!

রামনরেশপরসাদ, কী হল? কী করে গাড়ি পড়ল?

স্পিডে আসছিলাম স্যার, দেরি হয়ে গেছিল, এখানে লাইটপোস্টের সামনে এক সাইক্লিস্ট ছোকরার সঙ্গে হেড-অন-কলিশন হচ্ছিল, বাঁচাতে গিয়ে

যেই বাঁয়ে ঘেঁষেছি, গাড়িটা লাইটপোস্টে ধাক্কা মেরে ফ্লাই করে জলে পড়ে গেল। আমি সামনে ছিলাম, জলে পড়েই সাঁতরাচ্ছি।

রামনরেশের হাতে চোট লেগেছে, কপালে ও চুলের গোড়ায় কাদারক্ত মাখামাখি। উৎসাহী ভিড় ইতিমধ্যে টেনে তুলেছে আরও চার-পাঁচজনকে। সবারই একরকম অবস্থা, জলে ভেজা কাদামাখা। আমিনবাবুর ডান হাতটা বোধহয় ফ্র্যাকচার হয়ে গিয়ে থাকবে, অসহ্য যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছেন, এদিকে জলের দিকে তাকিয়ে কাঁদছেন—হায় হায়, সারে কাগজওয়া ডুব গয়ে মেরা!

ড্রাইডার কোথায়? ড্রাইভার?

সপসপে ময়লা, ভেজা, খাকি উর্দি পরা একজন লোক, কপালে নাকে রক্ত, ভিড়ের পেছনে পালাচ্ছিল—ক্ষুধার্ত জনতা তাকে পাকড়াও করে আমার সামনে হাজির করে দিল।

জিপ চালাও, না বৈলগাড়ি? এতগুলো লোকের প্রাণ যাচ্ছিল তোমার জন্য!

কাঁদো কাঁদো লোকটা হাতজোড় করে বলল, হুজুর, মেরা কোই কুসুর নেহি। গাড়ি আমি চালাইনি।

রামনরেশ দুঃখিতভাবে বললেন, সত্যিই দোষ আমার, ও চালালে গাড়ি জলে পড়ে?

আপনি চালাচ্ছিলেন?

নাঃ, উনি উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে হঠাৎ এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন—কই সে তো ওঠেনি?

কে?

আজিজ মিয়াঁ?

আজিজকে আপনি গাড়ি চালাতে দিয়েছিলেন?

ওর লারনারস্ লাইসেন্স আছে একটা। ওখানে যাওয়ার পর থেকেই মাঝে মাঝে হাত ঝালাত জিপের ওপর। সালিমুদ্দিন নাকি জিপ কিনছে একটা। আজকে ইটভাটি থেকেই বলতে বলতে আসছিল, একটু দিন, চালাই। ভাবলাম এসে তো গেছি, আট-দশ কিলোমিটার আছে—চালাক একটু। ভাগ্যে যে কী আছে তখন আর কী জানি!

আজিজ তাহলে ওঠেনি? কোথায় সে? সাঁতরে আগে বা পেছনে চলে যায়নি তো?

ভিড় দু'ভাগে ভাগ হয়ে একদল আগে, একদল পেছনে চলে গেল।

অবিনাশ সিং গিয়ে এক সেকশন হোমগার্ড-কে ডেকে এনেছে। গাড়িটা আগে তুলতে হবে—যদি ওর মধ্যে থাকে!

মোটা কাছি বাঁধা হল গাড়ির ফ্রেমে। তারপর একদিক থেকে টানা শুরু হল জন পনেরো মিলে। মিনিট বিশেকের চেষ্টার পর মরা কাছিমের মতন উল্টে গেল গাড়িটা। ভেতর থেকে আরও কিছু কাগজের বাণ্ডিল, হাওয়াই চপ্পল একপাটি, ফাইল বাঁধার লালসালু বেরিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে গেল

পশ্চিমে। অবিনাশ আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। বলে উঠল—লাশ ভেতরে থাকলে বেরিয়ে আসত—ভেতরে নেই।

আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। রুক্ষ গলায় বললাম—কী যা-তা বলছেন? হি মে বি অ্যালাইভ!

অবিনাশ কঠিন হেসে বলল—আপনার খারাপ লাগলে মুর্দা বলব না। তবে আধঘণ্টা তো হয়ে গেল। দশমিনিট জলের তলায় থাকলেই জিন্দা আদমি মুর্দা হয়ে যায়।

একঘণ্টা হয়ে গেল ক্যানেলের ধারে। দু'ঘণ্টা। দুপুরের সূর্য মাথার ওপর উঠেছে। যারা দলে দলে ভাগ হয়ে খুঁজতে গেছিল, তারা হতাশ হয়ে পাড় থেকে ফিরে এসেছে। হোমগার্ডরাও ফিরে এল। দু'মাইল এদিকে, ওদিকে দেখেছি। আজিজ মিয়াঁ সাঁতরে ওঠেনি। জলের দারুণ স্রোত। ভরা বর্ষার মাস। খড়কুটো গাছের ভাঙা ডাল নিয়ে ঘোলা জল বয়ে চলেছে। পাকা সাঁতারু ছাড়া জলের তলায় নাববে কে? দেখছ না, আজকাল স্নানেও কেউ নামছে না।

বেদপ্রকাশকে ফোন করলাম অফিস থেকে। ও শুধু আমার সহকর্মীই নয়, ক্রাইসিস-এর মুহূর্তে পরম নির্ভরযোগ্য বন্ধু। একান্ত কাছের মানুষ।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে অফিসে এসে গেল বেদপ্রকাশ। পুরো ইউনিফর্মে। সতেজ, রোদে পোড়া চেহারা, মুখের দাগগুলো না থাকলে সুপুরুষ বলতে কোনও বাধা থাকত না ওকে।

এভাবে হবে না। জলের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে বেদপ্রকাশ।

ভরা জলের মধ্যে, তার ওপর এত কারেণ্ট, পাড়ে দাঁড়িয়ে একজন মানুষকে খোঁজা যায় না। আমাদের জল বন্ধ করতে হবে। জল বন্ধ করলে আটঘণ্টা অন্তত লাগবে জল নামতে। আমাদের খুঁজতে হবে পুরো পঞ্চাশ কিলোমিটার, সপ্তপুরার রিজার্ভারের স্লুইস গেট পর্যন্ত। প্রতিটি ইঞ্চি না খুঁজলে লাশ পাওয়া যাবে না।

কিন্তু বেদপ্রকাশ, আপনি যা বলছেন তা তো একরকম অসম্ভব। ক্যানেলের জল স্টিল প্ল্যাণ্টের রিজার্ভারে গিয়ে পড়েছে। ওরা ভারত সরকারের অনুমতি ছাড়া জল বন্ধ করতে দেবে না। জলের লেভেল নেমে গেলে ওদের প্রোডাকশনে গণ্ডগোল হয়ে যাবে, আর তার অর্থ হল···

কথাটা আমার মুখ থেকে নিয়ে পূর্ণ করে দিল বেদপ্রকাশ। স্রোতের টানে মৃতদেহ সরতে থাকবে ক্রমশ পশ্চিমে। এক জায়গায় থাকবে না। যদি ঘণ্টায় আধ কিলোমিটারও যায়, তাহলে আজকের মধ্যে জল বন্ধ না হলে বডি রিজার্ভারে গিয়ে পড়বে কাল। সেখান থেকে আর কোনওদিনও খুঁজে পাওয়া যাবে না ওকে। মিঃ মুখার্জি, আমাদের হাতে সময় বড় কম। আজিজের বিধবা স্ত্রী যদি লাশটাও না দেখতে পায়, আমরা বড় অপরাধী হয়ে থাকব ওর কাছে। প্রতিটি হোমগার্ড, প্রতিটি পুলিশকর্মী, তন্ন তন্ন করে ক্যানেলে খুঁজবে জল নেমে যাওয়ার পর, আমি অর্ডার দিচ্ছি। কিন্তু আপনি

যান আগে ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ার আর স্টিল প্ল্যাণ্টের সঙ্গে কথা বলুন।

মিটিং ভেঙে গেছে কতক্ষণ। আজ আর কারও খাওয়া দাওয়া হয়নি। অফিসে গুন গুন করছে ভিড়। আমি এসে পৌঁছতে আবার চাপা নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। ফোনে বহু বাগবিতণ্ডার পর জল বন্ধ করতে রাজি হয়েছে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ—অফিসিয়াল শালীনতার বেড়া ভেঙে ইঞ্জিনিয়ারকে প্রায় ধমকেছি, আশা করি ভদ্রলোক পরে মাফ করে দেবেন।

আধঘণ্টা অন্তর ফোনে খবর পাচ্ছি কণ্ট্রোলে। জল বন্ধ করেছে ওরা। বিকেল চারটে নাগাদ জল নামতে আরম্ভ করল। পুলিশ ও হোমগার্ড'রা নেমেছে কাদাজলে। আমাদের অফিসের লোকেরা নেমেছে। কোনও কোনও পয়েণ্টে গ্রামের লোকেরা হাত মিলিয়েছে। করিমগঞ্জে লোক পাঠানো হয়েছে ওর শ্বশুরবাড়িতে। গাঁ থেকে দৌড়ে এসেছে ওর বুড়ো বাবা ও দাদারা। হঠাৎ এই ধাক্কায় সকলেই হতবাক। আর ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে সন্ধের অন্ধকার নেমে আসবে। তারপর মশাল আর টর্চ ছাড়া কিছু সম্বল নেই পুলিশ-বাহিনীর। কলকলানো কালো জলে টর্চের আলোয় কী হবে? অন্ধকার ক্যানেলের দুই তীর, আলো নেই। দু'ধারের গ্রামেই বিদ্যুৎ নেই তো রাস্তায় আলো!

রাতের আট দশ ঘণ্টা যদি খোঁজ বন্ধ রাখতে হয়, অনেক দেরি হয়ে যাবে। কে জানে ততক্ষণে···জঙ্গলে শেয়াল আছে, জলে কুমির কামট কি নেই?

সন্ধেনাগাদ সন্তু এক কাপ চা এনে দিল আর চারটে বিস্কুট। মুখে তেতো লাগছিল, তাও জোর করে খেলাম। এখন মনকে দুর্বল করলে চলবে না। সন্ধের আকাশ লাল। পাখিরা ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে দূরের বাসায়, সূর্যের কাছ ঘেঁষে। এত টানাপোড়েন, ব্যরেজের জলে কোনও উচ্ছ্বাস নেই। দারাং পাহাড় সেই রকমই শান্ত, গম্ভীর, সূর্যাস্তের আগে নীল কালো। যেন জীবনের ছন্দে কোনও স্খলন হয়নি। অফিসের লোকেরা প্রায় চলেই গেছে। ঘরগুলো সুনসান। খালি সন্তু দফতরি, আমাদের বেঞ্চক্লার্ক আর চৌকিদার ডিউটিতে দাঁড়িয়ে।

থামের পাশ থেকে বেরিয়ে মুকুট আমার সামনে এসে দাঁড়াল, রক্তহীন বিবর্ণ ওর মুখ, চোখ দুটো অস্থির তারার মতো জ্বলছে। ওর কথা ভাবার সত্যিই কোনও সময় পাইনি সারাদিনে। ওকে সান্ত্বনা দেবার কোনও ভাষা ছিল না আমার কাছে। ওর মাথায় হাতটা রাখলাম।

শীতের অরণ্যের অন্ধকারে শুকনো পাতা উড়ে যাওয়া হাওয়ার গেরুয়া, নিরালম্ব আওয়াজে ও বলল—

পেলেন না, না?

কী?

লাশ?

তনুর ভারী খারাপ অবস্থা গেল দিন-দশ-পনেরো। আমি ভয় পেয়েছিলাম, ওর মনের রোগ না দাঁড়িয়ে যায়। ঘুম নেই খাওয়া নেই, চোখে একফোঁটা জল নেই, পাগলের চাউনি। ও নাকি চিঠি লিখে ডেকেছিল আজিজকে সেদিন। চিঠি না লিখলে কি ও আসত না ? কিংবা গাড়ি যদি না চালাতে যেত, মরত কি ? ওকে সে কথা কে বোঝাবে ? এক খোকা ছাড়া ওর কাছে কেউ ঘেঁষতে পারেনি একদিন। দিনের বেলা গুম মেরে বসে থাকে, রাত্রে ঘুমোতে গেলে খানিক পরে চিৎকার করে উঠে বসে। চোখেমুখে ভয়। আজিজকে নাকি স্পষ্ট দেখতে পায়, কাঁধের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। গত ছ-সাত দিন ধরে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছে, তাও পাশে কেউ একজন বসে থাকতে হয়। তা নাহলে আচমকা ভয় পেয়ে যাবে। আমি মানা করেছিলাম, আজিজের বডি ওকে দেখিও না। মুকুট তো পাগলের মতো দৌড়ে দৌড়ে যায়। নাজিরবাবুর বউ, আমি আর শান্তি ওকে ধরে বেঁধে রেখেছিলাম। পারিজাত বলল, দেখেই নিক, নাহলে সারাজীবনের আফসোস রয়ে যাবে। তবে দেরি করবেন না। দেখে ফিরে আসুক। আজিজের বউ এসে যাবে রাতে। শেষে আমিই নিয়ে গেলাম ওকে সঙ্গে করে। ঠিক সন্ধের মুখে খুঁজে বার করেছিল পুলিশ আর রতনপুরের লোকেরা, আর মিনিট কুড়ি দেরি হলে অন্ধকার নেমে আসত, সারারাত বসে রয়ে যেতে হত ওদের। বেশিদূর যেতে পারেনি ডেডবডি। তিন নম্বর পুলিয়ার কাছে কাঁটার মস্ত একটা ঝাড়ে আটকে রয়ে গেছিল। ট্রেকারে করে অফিসের সামনে নিয়ে এসেছিল ওরা। গায়ের শার্টপ্যান্ট তেমনই আছে, চুলগুলো কাদায় চিপচিপে, চোখনাক থেকে রক্ত গড়িয়ে নেমেছে, ট্রেকারের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসানো, হাত দুটো কাঁটার খোঁচায় রক্তারক্তি, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। আহা রে ! কত গালমন্দ করেছি ওকে। কত খারাপ চেয়েছি ওর। এমন তো কখনও চাইনি ! আমারই চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। তনুর মাথাটা আমার কাঁধে তখন, ওর যে জ্ঞান নেই বুঝিনি, ও আমার ওপর ঢলে পড়তেই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। অফিসের লোকেরা এসে ধরল। বাড়িতে দিয়ে গেল আমাদের। ডাক্তার এল। তারপর থেকে এই চলেছে।

বড় আশা করেছিলাম, তনুর বিয়ে হয়তো দিয়ে দিতে পারব। সম্বন্ধ একটা এসেছিল পুরুলিয়া থেকে। দেওরকে চিঠি লিখে হাতেও রেখেছিলাম। মাঝখানে এতসব ঘটনায় সমস্ত উলটোপালটা হয়ে গেল। তনু কেন, কোনও মেয়েরই বিয়ে দিতে পারব বলে মনে হয় না।

আজিজের বউকে ওরা সেদিন নিয়ে এসেছিল, নাই বা আনত ? ওকে বিয়ে করে আজিজ বাপের বাড়ি ফেলে রেখেছিল। দু'বছর ঘরে আনেনি। মেয়েটা নাকি একেবারে ছেলেমানুষ, সতেরো-আঠারো বছর বয়স। বাবা আর

ভাইয়ের সঙ্গে এসেছিল। শোকের থেকে ভয়টাই যেন বেশি পেয়েছিল। বোরখার পর্দা তুলে শোয়ানো আজিজকে দেখে চিৎকার করে উলটো দিকে ছুটে চলে যাচ্ছিল। ওদের গাঁয়েই মাটি দিল ওরা আজিজকে। বউটাকে আবার নিয়ে এসেছিল ওর বাবা আর ভাই। কাগজপত্রে সই হল। গ্র্যাচুয়িটির টাকা পাবে অল্প কিছু আর বিধবার পেনশন। বাপের ঘরেই ফিরে যাবে মেয়েটি আবার, যে কে সেই।

সারাণ্ডাঘাটের ভারি খারাপ দিন ঘনিয়ে এসেছে। যেন একটা পরিবারের ওপর অঘটনের ছায়া—সবাই কাছাকাছি ঘেঁষে বসেছে। গত পঁচিশ বছর এখানে আছি, কখনও ক্যানাল বন্ধ হতে দেখিনি। আজিজের মৃতদেহ খুঁজে বার করার জন্য পারিজাত সেই অসাধ্যসাধন করল। আজিজের বউটি হয়তো কখনও জানতেই পারবে না, পারিজাত ও বেদপ্রকাশ কী করেছে ওদের জন্য।

পারিজাত চলে যাবে। খবরের কাগজের খবরটাকে আমরা কেউই আমল দিইনি। কিন্তু কথাটা সত্যি। শুনছি ওর বদলির অর্ডার করবার জন্য ফাইল ওপরে গেছে, হয়ে এল বলে। কয়লাখনিতে সাহুকারদের ওপর একটানা পরিকল্পিত হামলা—নেতারা এক বছরের মধ্যে দু'তিনবার পাটনা দৌড়েছে, এবার শ্রীমতী জামিলা খাতুন নিজে উদ্যোগী হয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন। কোলকাটারদের বস্তিতে পারিজাতের নামে দোয়া দেয় লোকে। তনুর বাবা বেঁচে থাকতে বলতেন—কোলকাটাররা অধিকাংশ কখনও মাইনেই পেত না কাউণ্টার থেকে। যে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়েছে, শোধ করতে তার লেগে যেত দশ বছর। সামন্তপুর আর ভুবন কোলিয়ারি এরিয়ায় তো ক্লার্কবাবুদের সঙ্গে সাহুকারও এসে বসে থাকত কাউণ্টারে। পেমেণ্টের স্লিপটাই চলে যেত তার হাতে। বেচারা মজুর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকত ওপাশে। তারপর সাহুকার একটা ধারের হাতচিঠে দিত মজুরকে। বলত, যাও আমার কিরানা দোকানে। ওখান থেকে ওষুধ, চাল ডাল যা লাগে নিয়ে যাও। বছরের পর বছর, মজদুরের মাইনের কাগজ থাকত মহাজনের কাছে আর ওই হাতচিঠে সম্বল ক'রে বেঁচে থাকত মজদুর—একবার নেওয়া ধারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। বেনামীতে চাকরিই বা কত। বিধবাকে ঠকিয়ে রাতারাতি সই জাল করে নকল ছেলে বাপের জায়গায় চাকরি পেয়ে গেল। পুরনো, ঘোরপ্যাঁচের কেসের মধ্যে ম্যানেজমেণ্ট এখন আর যেতেই চায় না। কোনও কেস রি-ওপেন হবে না। যেমন চলছে চলুক। পেমেণ্টের জন্যে সবার বাধ্যতামূলক ব্যাঙ্কের খাতা খোলা হয়েছে এবার, কয়লাখানি ও জেলা সরকারের আলাপ-আলোচনায়। পারিজাতকে পাটনা যেতে হয়েছে তার জন্য। কাউণ্টারে পেমেণ্ট বন্ধ হয়ে গেলে ইউনিয়ন ও সাহুকার—দু'জনেরই অন্ন মারা যাবে। তার সঙ্গে চলেছে সাহুকারদের ওপর পেমেণ্ট কাউণ্টারে রেইড। শত শত কেস বুক হয়েছে এই ক'মাসে। মান্যগণ্য ভদ্রব্যক্তি হিসেবে ছড়ি ঘুরিয়ে যাঁরা ঘুরে বেড়াতেন শহরগঞ্জে, নিজের কাঠগড়ায় ওঠার সম্ভাবনায় তাঁরা ব্যতিব্যস্ত। কোলিয়ারির

জন্য আরও জমি অধিগ্রহণকে বিরোধিতা করে যে সমিতি বানিয়েছেন খাতুন, সেই সমিতি সমানে টাকা তুলে যাচ্ছে গাঁয়ের চাষাভুষোর কাছ থেকে, হাইকোর্টে নাকি কেস লড়তে হবে। অনেক টাকা দরকার। লক্ষপতি ব্যারিস্টারের স্ত্রী খাতুন। ওর তিনমহলা কোঠা তৈরি হচ্ছে রাঁচিতে। গত মাসের মিটিং-এ পারিজাত ওঁকে বলেছে মধ্যস্থতার নামে শোষণ থেকে যদি ওর সমিতি বিরত না হয় তবে আইনের আশ্রয় নেবে সরকার। ভদ্রমহিলা স্টিম ইঞ্জিনের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেছেন রাজধানী। বিরোধী দলের হলে কী হবে, সরকারি দলের লোকেরা দারুণ সমঝে চলে ওঁকে, ওঁর টাকাকেও, জিভকেও।

পারিজাত চলে গেলে আমরা বড় একা হয়ে যাব। টিলার ওপর ওই বাংলোয় তো কতজন এসেছেন, গেছেন, আমাদের কখনও সুযোগই ছিল না যাবার—দরকারও নয়, আর হবেও না কোনওদিন। তরকারিগুলো যা লাগিয়েছিলাম, ছেলেটা খেয়েও যেতে পাবে না হয়তো। ঝিঙে ধরেছে কচি কচি, পুঁইশাক হয়েছে। আর কিছু ফলেনি এখনও। ক'দিন আগে আগে ঝরে পড়েছিল। দু'দিন গেছিলাম। কিন্তু বেশি সময় বসতে পারিনি। তনুর শরীরমন এত খারাপ যে ওকে রেখে বেশিক্ষণ কোথাও থাকা যায় না। তার ওপর কখন যে কলোনির কে এসে যায় ওকে একা পেয়ে কুশল শুধোতে। হিতাকাঙ্ক্ষীর তো অভাব নেই আমাদের।

কত তফাৎ পারিজাতদের সঙ্গে আমাদের। অর্থে, শিক্ষায়, পদমর্যাদায়! তবু এক বছর সময় ওকে কাছাকাছি পেয়ে মন ভরেনি আমার। ঘুমোলে মনে হয়েছে মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। আবার সংকোচে থেমে গেছি, হাত ওঠেনি। তনু হবার সময় খুব ছেলের শখ ছিল আমার। সেই গোপন আকাঙ্ক্ষা যেন ফিরে এসেছে পারিজাতকে দেখে। এখান থেকে বদলি হয়ে অনেক দূরে চলে যাবে পারিজাত। পূর্ণিয়া কি সীতামঢ়ী, দক্ষিণে আর আসবে না হয়তো শিগগির। আর কি দেখা হবে ওর সঙ্গে? চিঠিপত্র লিখলেও ওর সময় কই জবাব দেবার। ব্যারেজে যাবার রাস্তা ধরে যতবার যাব, টিলার ওপর চোখ পড়লেই বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠবে—এমন একটা ফোঁপরা আছে মনের মধ্যে যা দুনিয়ার কোনও জিনিসেই আর ভরবে না। কেন যে মানুষ আপন হয়, কেন চলে যায়!

* * *

গতকাল তনুকে দেখতে এসেছিল পারিজাত। অনেকক্ষণ বসেছিল। দরজা বন্ধ করে ওরা ভেতরে ধীরে ধীরে কথা বলছিল। বেরিয়ে এসে পারিজাত আমাকে ডেকে নিল বাইরের ঘরে। আমাদের হাসপাতালের ডাক্তারকেও ডাকিয়েছিল। আমি কিছুই জানতাম না। ওর অসুখের সময় বহু রকমের সব যে টেস্ট হয়েছিল, তারই ভিতর ইউরিন কালচার থেকে ডাক্তারের রিপোর্ট বেরিয়েছে অপ্রত্যাশিত। তনু সন্তানসম্ভবা। কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা টলে উঠেছিল। মনে হয় হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। পারিজাত

বলল, আমি যেন এমন কিছু না করি যাতে তনুর কোনও ক্ষতি হয়। ডাক্তার যাবে সঙ্গে। বিশ্বস্ত প্রৌঢ় ভদ্রলোক, ওরা রাঁচি যাবে পারিজাতের সঙ্গে, তনুর ভাল করে চেকআপ দরকার। বিশেষ করে এইরকম মনের অবস্থায়।

নিজের ট্রান্সফার অর্ডারটা পেয়ে গেছে বলেই এত ব্যস্ত পারিজাত। দেরি করতে চায় না। রাঁচিতে তনু অ্যাডমিট হবে একদিনের জন্য। ডাক্তারেরও মত, এখনই ব্যবস্থা না নিলে দেরি হয়ে যাবে, পরে তনুর দুর্বল শরীর গর্ভপাত সইতে পারবে না। আমার মনটা ভেঙে গেছিল খবরটা শোনার পরই, তবু রোগা মেয়েটাকে গাড়িতে তুলে দিলাম। বহুদিন পর তনু ঘর থেকে বেরোল। অফিস যাওয়া নেই, কতদিন শয্যাশায়ী, এখনও হাঁটতে গেলে পা টলে। বাগানের লঙ্কা জবা ও করবী গাছগুলোর পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছিল। বর্ষার জল পেয়ে কত বড় হয়ে গেছে গাছগুলো। নতুন একরকম কষ্ট হচ্ছিল ওর জন্যে, যা এর আগে কখনও হয়নি।

সন্ধেরাতে ফিরে এল ওরা। পারিজাত এসেছিল তনুকে ছেড়ে দিতে। মেয়েটা গাড়ি থেকে নেমে দুর্বল হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার কাঁধে মাথা ঘষছে, ওর বাবা মারা যাবার পর এই প্রথম বোধহয়। কতদিন আমি ওর শরীরের ঘ্রাণ স্পর্শ নিইনি। ভেবে দেখলাম, আমিই কখনও নিজে থেকে গিয়ে ছুঁইনি ওকে, যেদিন থেকে আমার সন্দেহ হয়েছে আজিজের সঙ্গে ওর সম্পর্ক। সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে ওকে, আমিই পাঁচিল তুলে দিয়েছি ওর ও আমার মধ্যে। আমি এখন ওর পিঠে হাত বোলাচ্ছি। কত রোগা হয়ে গেছে, শিরদাঁড়াটা স্পষ্ট ছোঁয়া যায়, আঙুল ফেরাচ্ছি ওর ঠাসবুনুন চুলে, এই, তোর কী হয়েছে বল তো!

মা, তুমি কিছু বলবে না, বলো? আমি পারলাম না, টেবিলের ওপরই আমার দমবন্ধ হয়ে হল, যেন এক্ষুণি মরে যাব, পালিয়ে এলাম ডাক্তারকে বলে। মা, আমি ওকে রাখব। বাড়িতে থাকবে, বড় হবে আমাদের সঙ্গে, কেমন?

আমার চোখে জল দেখে ও আবার ফিরে এসে জড়িয়ে ধরল আমায়। একি, তুমি কাঁদছ? তোমার কষ্ট হচ্ছে? হাসনুহানার গন্ধভরা অন্ধকারে এবার আমি হাতড়ে হাতড়ে ওর দু'চোখ, নাক, মুখ, ঠোঁট খুঁজছিলাম। সেই অচিন ভাস্কর্য, আমার শরীরের মধ্যে তিল তিল করে কুড়ি বছর আগে যে বেড়ে উঠেছিল। ওকে একজনের জীবন নিতে পাঠিয়েছিলাম, ভালই হয়েছে ও ফিরে এসেছে। আমাদের বারান্দার লেবু গাছটার মতো শ্যামল, নরম, ছোট—জীবন ওর ভিতরে রোজ বেড়ে উঠছে। আর একটু হলে সাঁড়াশির জিভ ছিঁড়ে নিয়ে যেত তাকে—আমার কষ্ট নেই তনু, তুই আবার নতুন করে বাঁচতে আরম্ভ কর। বড় হ। সুখী হ।

ঘরের ভেতর যেতে যেতে বলে গেল, আমার বিয়ের জন্য আর ভেবো না মা। মা হওয়ার জন্যই তো বিয়ে করে মেয়েরা, না? আর কী দরকার—আমি আর তুমি একসঙ্গে থাকব।

পারিজাত চলে গেল বাড়ি। বলে গেল কাল প্যাকিং শুরু। একটু আসবেন কাল। ডাক্তারও ফিরে গেছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ, খোকন এসে হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে গেল।

বেদপ্রকাশ

মিঃ মুখার্জি চলে যাচ্ছেন। পাটনা থেকে ট্রাংককল এল গতকাল, সরকারের চিঠিও এসে গেছে—খবরটা আগেই শুনেছিলাম। কাজেই প্রস্তুত ছিল মন। তবু গরমের দুপুরে শুকনো হাওয়া যখন পাতার ঘূর্ণি উড়িয়ে চলে যায়, সেই দলের এককপাতার মতো সঙ্গহীন, মূলহীন, গন্তব্যবিহীন মনে হল নিজেকে। এই সারাণ্ডাঘাটে আমার জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে সীমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন এক মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে এই মুহূর্তে, যেখান থেকে পরবর্তী পথরেখা দেখাই যায় না।

পারিজাতবাবু আর আমি, আমরা এতদিন একসঙ্গে রেইড-এ বেরিয়েছি, একসঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিটিং নিয়েছি, একসঙ্গে খাদান-এ গিয়েছি। আমাদের মিলিত শক্তির একটা ধারালো ইমপ্যাক্ট ছিল এখানে। আমরা যখন সাহুকারদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখালাম যে অ্যান্টি-মানি লেন্ডিং অ্যাক্ট-এর দাঁতনখ আছে, এবং পেমেন্ট অফিস থেকে আরম্ভ করে ক্যান্টিনের আপাদ-মস্তক 'কীভাবে সাহুকারের মোকাবিলা করবেন' পোস্টারে ছেয়ে গেল, তখনই এরা প্রথম বুঝল আমাদের আপসে লড়ানো সম্ভব হবে না এবং তখন থেকেই হায়েনারা পিছু হটতে আরম্ভ করল। উনি যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন আশঙ্কা করিনি। হঠাৎ খবরটা পেয়ে মনে হল আমার একটা হাত যেন অবশ হয়ে গেছে। পারিজাতবাবুকে অফিসে বসে আচমকা বলেও ফেলেছিলাম সেদিন—'আপনি চলে যাচ্ছেন, এবার সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। এতদিন ধরে যে ভিত আমরা তৈরি করেছিলাম, বড় তাড়াতাড়ি ভেঙে দিল ওরা।'

বেদনা ও উদ্বেগের স্পষ্ট আভাস ফুটে উঠল পারিজাতের চোখেমুখে—'এ কী বলছেন আপনি, বেদপ্রকাশ! য়ু কানট্ লেট দেম ডাউন হোয়েন আই অ্যাম নট দেয়ার! নেভার!'

ওনাকে অবশ্য বলতে পারিনি, পারিবারিক জীবনে কী অস্থিরতার মধ্যে কেটে যাচ্ছে আমার এক একটি দিন। যেদিকেই তাকাই মনে হয় আগুন লেগে ঝলসে গেছে সব। ছুটি নিয়ে কোথাও যদি পালিয়ে যেতে পারতাম! কোথায় যাব? রাঁচির বাড়িতে মা শয্যাশায়ী, মৃত্যুর পায়ের শব্দ শুনছে প্রতিদিন। ওমের চাকরিটা নেহাতই সামান্য—বাবার পেনশন আর আমার পাঠানো টাকা মিশিয়ে কোনও মতে ওদের চলে। ওদের কাছে নিজের সুখদুঃখের খুঁটিনাটি নিয়ে কখনও গিয়ে দাঁড়াইনি—আজও পারব না। পুতলী আর বাবুয়াকে একা রেখে কোথাও যেতে পারি না। ভয় করে, যেন সেই অদৃশ্য আততায়ী পেছনে তাড়া করে আসবে। ফিরে গিয়ে ওদের দেখতে পাব তো! যদি দেখি

ওদের নিয়ে সীমা চলে গেছে! সীমার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে বহুদিন হল। নিতান্ত ঠোক্কর না লাগলে দু'একটা হুঁ-হ্যাঁও না। তবে ওর বাবাকে লেখা আমার মারমুখী চিঠির একটা আপাত ফল হয়েছে—পাবলিক স্কুলের প্রসঙ্গ বন্ধ আছে আজকাল। তবে সেটা বুদ্ধির প্যাঁচও হতে পারে ওদের তরফের, ঝড়ের আগের শান্তির রহস্য। নওয়াদার এক উকিল বন্ধুর সূত্রে খবর পেলাম, ওরা ডিভোর্সের কথা ভাবছে। পরিস্থিতি যখন নিজেই সামনে এসে দাঁড়ায় তখন মানুষ পেছন ফিরে পালাতে পারে না, লড়তেই হয়। অন্য কোনও বিকল্প তাকে বিবেক কী করেই বা দেবে!

এখন আমার বয়স পঁয়ত্রিশ। কত তাড়াতাড়ি সব কিছু ফুরিয়ে গেল! এই বয়সে মানুষের স্বপ্ন দেখা আরম্ভ হয়, বাড়ি করার জন্য জমির সন্ধান নেয় মানুষ, মেয়ের বিয়ের গয়না গড়াতে শুরু করে। শনিবারের হাটে আমাদের বুড়ো কনস্টেবল হরি তার বউয়ের জন্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাছছিল—শেষে পছন্দমত নীল ফুল-ফুল শাড়িটা হাতে তুলে অনির্বচনীয় হাসি ফুটে উঠেছিল বুড়োর দন্তহীন মুখে। আমার চোখে চোখ পড়ে কী লজ্জা!

সব কিছুই ছিল আমার করায়ত্ত—ভাল চাকরি, ভাল বংশ, চেহারা, শিক্ষা, সুন্দরী স্ত্রী—শরীরের এই দাগগুলোকে ছেড়ে দিলে অসুন্দর কিছুই না। আমাকে মেরে দিল আমার শরাফৎ। আমার বারমুখো না হওয়া, মদ না খাওয়া, বাড়িতে গালিগালাজ না করা, মদ খেয়ে বউকে না পেটানোর মতো অকল্পনীয় সব অপরাধ। বাবা যখন বলতেন শরীফ আদমী সব জায়গায় মার খায়, শুনে হাসতাম। তখন কলেজে পড়তাম, খোলামেলা নির্ভীক জীবন ছিল। ভাবতাম শরাফৎ কি দাঁতনখ ওপড়ানো সার্কাসের বাঘ, তার কি মেরুদণ্ড নেই? এখন দেখি এই রাস্তায় কত যন্ত্রণা, হাত-পা কতরকমে বাঁধা। চেঁচিও না—পড়শী শুনতে পারে। মাতলামি করো না—বাচ্চারা ভয় পাবে।

বড়বাবুর মেয়ে মুকুটকে আবার দেখছি অফিস যেতে। পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল আজিজের মৃত্যুর পর মেয়েটা। আবার যে উঠে দাঁড়িয়েছে হিম্মত করে, অফিসে যাচ্ছে, লোকলজ্জার পরোয়া না করে নিজের অজাত সন্তানকে পৃথিবীতে আনার মতো মনোবল দেখিয়েছে এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে—সাদাসিধে চেহারার নীচে ইস্পাতের মতন কঠিন মেয়েটা। ওকে দেখলে আবার স্রোতের ওপর ভেসে উঠে বাঁচতে ইচ্ছে হয়। এই তিন রমণীর কথা একসুতোয় বাঁধা হয়ে মনে পড়ে যায়। আজিজের বউকে যারা বাসে চড়াতে গেছিল তাদের মধ্যে আমাদের বুড়ো হাবিলদার লগনু ছিল। ফিরে আসার পর দেখি তার চোখে জল। আজীবন আমৃত্যু বৈধব্য মেয়েটার। শ্বশুরবাড়ি ফেরা আর হল না, সব চাওয়া ওর শেষ হয়ে গেল তার আগেই।

রতন ঘাসির বউ সোনাবিড়ার ধুলোভরা ভাঙা রাস্তা ধরে আজও কি জল আনতে যায়? হেলে পড়া ঘরের দাওয়া নিকিয়ে জোয়ারের রুটি হাতে গড়ে জলে ভিজিয়ে খেতে দেয় বুড়ো শ্বশুরকে? ওকেও তো বাঁচতেই হবে। ওর মনের আগুন আজও নিভেছে কিনা জানি না—ধুলোভরা ওর চুলের

মেটে গন্ধটা এখনও আমার স্মৃতিকে রক্তমাখা নখের আঁচড়ে বিদ্ধ করে। আমার মরদকে জবাই-এর জানোয়ারের মতো কেটে দিল দিনদুপুরে আর তোমরা মজা দেখতে থাকলে! হায়রে পুলিশওয়ালা! ট্রায়াল এখনও শুরু হয়নি সেসন্স কোর্টে, বিচারের রায় বেরোলেই রাজপুতরা আবার দৌড়বে হাইকোর্ট আপিলে, যদিও তন্ন তন্ন করে প্রতিটি সাক্ষ্যপ্রমাণ এনে নিখুঁত, ছিদ্রহীন করেছি আমাদের চার্জশিট, বারিডির ও সি'র প্রায় টুঁটি চেপে ধরে ইনভেস্টিগেশন নিরপেক্ষ করিয়েছি। জানি না শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে! বিচারের পুরো রাস্তাটাই এত দীর্ঘ, এত জটিল তার বাঁক! এত মহার্ঘ্য সেই তীর্থযাত্রার নৈবেদ্য! সব দাম চুকিয়ে শেষ পর্যন্ত পেঁছতে পারবে কি রতন ঘাসির বউ?

মিঃ মুখার্জির বাড়ি কাল গেছিলাম। ঘরগুলো ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। জিনিসপত্র বাঁধা প্রায় শেষ। বাড়িটা ছেড়ে দিয়েই যাবেন, বড় আসবাবপত্র একটা ঘরে বন্ধ করে। কলকাতায় থাকবেন দিন পনেরো, তারপর পাটনা হয়ে মুজঃফরপুর। ওঁর সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে দেখা হওয়ার আশা রইল না। মুকুটের মা চার-পাঁচদিন হল প্যাকিং-এর তদারক করছেন। কাল দেখি কাপ-প্লেটগুলো কত যত্ন করে তোয়ালে দিয়ে মুড়ে আবার কাগজ দিয়ে প্যাক করছেন একটি একটি করে। বললেন—এতে ট্রাকের ঝাঁকুনিতে ভাঙবে না। তরিতরকারি, ফলমূল সব বিলিয়ে দেওয়া হল। পারিজাত কিছুই দেখছেন না। একমনে কেস-এর জাজমেণ্ট লিখছেন, ফাইল দেখে দেখে নীচে ফেলছেন। টেবিলের কাগজের গাদায় ওঁর মুখ অদৃশ্যপ্রায়।

বিদায়সভার একটানা জের চলেছে। সব জায়গাতেই অবধারিতভাবে ওরা আমায়ও ডাকে। সভা অ্যাটেণ্ড করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি আমি, মিঃ মুখার্জির নির্বিকার মুখ দেখে অবশ্য কিছু বোঝা যায় না। সেই একই রকমের বাঁধানো মানপত্র, ফুলের তোড়া, ভাষণে চোখের জল ফেলা, কাগজের প্লেটে জলখাবার, অতিথিদের জন্য দামী কাচের বাসনে চা, অন্যদের জন্য কাচের গ্লাসে। আমাকেও ভাষণ দিতে হয় সর্বত্র, সেটা আরও যন্ত্রণার।

চার নম্বর কোলিয়ারির কোলকাটাররা যে ফেয়ারওয়েল দিল সেটাতে কোনও ভাষণ ছিল না, চেয়ার টেবিলও না। টিনশেডের তলায় ছেঁড়া গালিচা, হ্যাজাকের আলো, সারা পরিমণ্ডলে ধেনো মদ, বিড়ির ধোঁওয়া আর কয়লার গুঁড়োর গন্ধ। বাচ্চা বুড়ো, কামিনদের মিলিয়ে প্রায় তিনশো লোক। কোলিয়ারি ম্যানেজার বিব্রত, হতবাক এরকম জমায়েতে আমাদের মতন ভদ্রলোকেরা। তাও প্রশাসনের দুই স্তম্ভ! খোলটোল বাজিয়ে ওরা নিজেরাই গান করল খাওয়া দাওয়ার পর। শালপাতায় গরম খিচুড়ি আর খাসির মাংস। টিপ্‌টিপে-বৃষ্টি অন্ধকারে আমরা সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জিপে বসতে যাব, দড়িপাকানো চেহারার এক বুড়ো বলল—একটু দাঁড়াও বাবু, আমার ঔরৎ আসছে। অন্ধকারের ভেতর থেকে অল্পবয়সী একটা যুবতী মেয়ে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে এল। পাতায় করে টগর ফুল, সিঁদুর আর

চন্দন এনেছে। আমাদের দু'জনের মাথায় টিকা এঁকে দিল, রাখী পরিয়ে দিল হলুদ সুতোর। পারিজাতকে বলল, ভাইয়া, যেখানেই যাও বোনকে ভুলবে না। মরদ যদি বেচাল কাজ করে, আমি কিন্তু তোমাকেই চিঠি দেব।

সেই বুড়োসমেত জনতা হাসতে লাগল।

স্পন্দমান হাসিমুখ সেই কোলাহলের কাছ থেকে বহুদূর গিয়ে হাইওয়েতে এসে পড়ে পারিজাত শুধোলেন, আপনার মনে পড়ছে মেয়েটাকে কোথায় দেখিছি আগে?

আমার তৎক্ষণাৎ মনে হয়নি, এবার মনে পড়ল। ওর নাম মনে নেই। চার নম্বর কোলিয়ারির পে-ক্লার্কের রক্ষিতা হয়ে ছিল বছর পাঁচ ছয়। শেষে সন্তান-সম্ভবা হয়ে মেয়েটি নিজের বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রবীর সিং-এর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যায় ওর বাড়ি। প্রত্যুত্তরে চন্দ্রবীরের ছেলেরা মায়ের ইঙ্গিতে নিজেদের বাড়িতেই প্রচণ্ড মারধর করে মেয়েটিকে, পরিশেষে অর্ধউলঙ্গ করে রাস্তায় ছেড়ে দেয়। মেয়েটি পারিজাতের অফিসে এসে বাইরে বসেছিল। ছেলেগুলির নামে কেস হয়েছিল, চন্দ্রবীরকে থানায় ডেকে বিশদ জেরা করা হয়েছিল ওদের সম্পর্ক নিয়ে। আজ্ঞে সব ষড়যন্ত্র, সর্বৈব মিথ্যা—বলতে বলতে হার্ট ও ব্লাডপ্রেসারের দোহাই দিয়ে দুম করে অজ্ঞান হয়ে গেছিল লোকটা। থানার ভেতরেই। আজকের এই রোগা শুকনো বুড়ো গণেশরাম, মজদুর সরদার, ওকে বিয়ে করে। আমাদের মধ্যস্থতায়, ওর প্রাক্‌বিবাহ সন্তানের পিতৃত্বও নিয়ে নিয়েছিল গণেশরাম।

পারিজাত সামনের হ্যালোজেন আলো জ্বলা দূর পর্যন্ত বিছানো রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

পাথরের দেওয়াল চিরে যে অশ্বত্থ গাছ রোজ বেড়ে ওঠে, আকাশের দিকে উঠে যায় আলোর খোঁজে, তার পরমায়ু নিয়ে আমরা মিথ্যে ভেবে মরি। ওই মেয়েটি সেই দেওয়ালের অশ্বত্থ গাছ।

* * *

রামগড় ছাড়িয়ে চলে এসেছি আমরা—আমি, পারিজাত, পুতলী ও বাবুয়া। বাচ্চা দুটো গাড়িতে উঠলেই ঘুমিয়ে পড়ে। এ ওর গায়ে পা তুলে ঘুমোচ্ছে। হু হু করে হাওয়া এসে আমাদের চুল লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যাচ্ছে। বাইরে প্রসন্ন দিন। মেঘভাঙা নরম রোদ ঠোঁট ফুলিয়ে জেগে আছে। অল্প জলে ডোবা ধানক্ষেত ঝকঝকে সবুজ। দূরের পাহাড়ে নীলচে মেঘ জমাট বেঁধেছে। গাড়ির সামনের সিটে বোঝাই ফুল, ফুলের মালা, তোড়ায় বাঁধা গোলাপ রজনীগন্ধা। আমাদের ঘাড়ের পেছনেও ফুল, মাথা হেলালেই কুসুম স্পর্শ। এত ফুল একই দিনে কেন দেয়—পারিজাত জিজ্ঞেস করলেন, রইয়ে সইয়ে দিতে পারে না?

আজ ওঁর বাড়িতে পুরো শহর ভেঙে পড়েছিল যাবার সময়। কলোনির সব লোক তো এসেই ছিল, বাইরের বাজার থেকে দোকানীরা, কণ্ট্রাক্টর, কয়লাওয়ালা, স্কুলের মাস্টার—কোনও বাধানিষেধ না মেনে সবাই গেট খুলে

ঢুকে পড়েছিল। অবশ্য আজ কেউ ছিল না আটকানোর জন্য। ফুল নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে পারিজাত একসময় বিদায়ের নমস্কার করে গাড়িতে বসে পড়লেন।

জ্যোৎস্নাদেবী ওঁর প্রণাম নিলেন না। ওঁর মাথাটা বুকে চেপে ধরে ঘ্রাণ নিলেন মাথার, অস্ফুটে কি একটা বললেন। ওঁর ছোট দুই মেয়ে নিঃশব্দে কাঁদছিল। বারান্দার একটা থামের আধো আড়ালে মুকুট দাঁড়িয়ে ছিল, সাদা শাড়ি পরেছিল আজ। পাথরের প্রতিমার মতো মুখ, কোঁকড়া চুলগুলো উড়ছে মুখের চারপাশে, যেন কোনও স্বপ্নের ঘোরে অনেক অনেক দূরে দেখছে। দু'চোখের বাদামী মণিতে অবিশ্বাস মাখানো মুগ্ধতা। ও যেন ভাবছেই না আজ কেউ চলে যাচ্ছে বলে। গাড়িটা ধীরে ধীরে টিলার নীচে নেমে এল। দু'পাশের গাছেদের পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির জল গতরাত্রের গাড়ির মাথায় পিঠে ঝরে পড়ল। বাঁধের জলে দুপুরের সূর্য ভেঙেচুরে মিশে গেল। এই জলের আয়নার কাছে, এই নীল সবুজ দারাং পাহাড়ের দীর্ঘ কাহিনীর কাছে আবার কখনও কি ফিরে আসতে পারবেন পারিজাত ?

হঠাৎ লখন চেঁচিয়ে উঠল, মেরা কেয়া হোগা হুজুর ? ডুকরে কেঁদে উঠল জোয়ান লোকটা। ভিড়ের মধ্যে কেউ ওকে কাঁধ জড়িয়ে কাছে টেনে নিল।

আজ রাত্রে মিঃ মুখার্জি কলকাতার ট্রেন ধরবেন রাঁচি থেকে। ওঁকে সি অফ করে বাচ্চাদের নিয়ে বাড়ি যাব আমি। সাতদিনের ছুটি নিয়ে নিয়েছি।

পেটরবারের মোড়ে তুমুল এক জনতা আমাদের পথ আটকাল। ফুলের মালা নিলেন পারিজাত, কিন্তু নামতে রাজি হলেন না, বললেন, আমি ক্লান্ত। ট্রেনও ধরতে হবে আজ। নাছোড়বান্দা উৎসাহী জননেতা রমেন্দ্রনারায়ণ ঝা জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে দুঃখিতভাবে বললেন, 'কেন চার্জ দিয়ে দিলেন ? আমরা পাটনা যেতাম অর্ডার বাতিল করাতে ! মিছিমিছি জামিলাজির জেদ জিতে গেল। আপনি জানবেন এখানকার পাবলিক ওকে সাপোর্ট করবে না। আমরা ছাড়ব না, ইলেক্‌শন ইস্যু বানাব এটাকে।'

হাসতে হাসতেই ঝা-এর হাতে মৃদু চাপড় দেন পারিজাত—'আপনার আর খাতুনজির কলহ দীর্ঘজীবী হোক। আমাদের মুক্তি দিন।' দুই শালের ডালে বাঁধা বদলি বিরোধী ক্রুদ্ধ ফেস্টুনকে পিছনে রেখে গাড়ি এগিয়ে যায়।

ঝাটিয়ানার মোড়ে কচি ডাব দেখে থামলাম। বাচ্চা দুটোও ঘুমের থেকে জেগে উঠেছে তেষ্টায়। ঘেমে নেয়ে গেছে ওরা দু'জন। আনাড়ী হাতের গোছগাছ—ওদের জলের বোতল আনতে ভুলে গেছি আমি। অগ্নিমূল্য এখানে ডাব—তাই নিলাম একটা করে। ডাবের মধ্যে স্ট্র ডুবিয়ে দেখছি ফুটপাথের ওপর থেকে হাতজোড় করে আমাদের নমস্কার করছে দেহাতি একটি বউ। লক্ষ করিনি বাড়িটার দোতলায় ব্যাংক। ছিটের শার্ট ও ধুতিপরা দুই জোয়ান সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওর পাশে দাঁড়াল। হলদে ছাপাশাড়ি পরা, মাথার চুল টেনে ফিতেয় বাঁধা, পানের রসে ঠোঁট রাঙানো দুই হাতে গোছা গোছা কাচের চুড়ি।

পারিজাত জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে, কে মেয়েটি বেদপ্রকাশ, আমাদের

নমস্কার করল ?

আমাদের রতন ঘাসির বউ।

মেয়েটি ততক্ষণে গাড়ির কাছে এগিয়ে এসেছে।

পরণাম বাবু !

রাম রাম। তুমি এখানে কী করছ ?

ব্যাঙ্কের টাকা তুলতে এসেছিলাম। আমার দেওর আর ওর বন্ধু আছে সঙ্গে। দশ হাজার টাকা জমা করেছিলাম আমরা, রতন ঘাসি মারা যাবার পর।

কত বাড়ল তোমার টাকা সুদে-আসলে ? পারিজাত শুধোল।

ম্লান হাসে বউটি। টাকা আর কই বাবু, আজই তো সব ফুরিয়ে গেল ! খাতা বন্ধ হয়ে গেল আজ !

সে কী! বছরও তো ঘোরেনি, করলে কি এত টাকা ? নিজেরই গলা আর্তনাদের মতো শোনায় আমার কানে।

কত আর টাকা বাবু ! শ্বশুর বুড়ো মরে গেল, পাড়াশুদ্ধ লোক ধরল ভোজির জন্য। তারপর রোজ সংসারের খরচা। পাঁঠা কাটল ওরা মাঝে দু'তিনবার। শুয়োর কিনেছে ভাসুরপো। দেওর একটা নতুন সাইকেল কিনতে চাইছে। দু'মাস থেকে ঝগড়াঝাঁটি অশান্তি। রোজ গালাগাল দেয়। আজ সাতশো টাকা তুলে নিলাম। কিনে মন শান্তি করুক।

পারিজাত ম্লান চোখে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে—তোমার ছেলে কেমন আছে বউ ?

আমাদের গাড়ির চাকার দিকে তাকায় রতন ঘাসির বউ, বোধহয় দেখে চাকায় পিষ্ট ঝরা পাতা, মুথো ঘাস, কাদায় জড়ানো থ্যাঁৎলানো গিরগিটির শরীর।

বউয়া তো নেই হুজুর ! মরে গেল আষাঢ় মাসে। দাস্ত পাইখানা হল জলের মতো। ঘরে মরদ কেউ নেই। রাতভর কোলে ক'রে বসে ছিলাম, সকালে ওরা নিয়ে গোর দিয়ে এল।

রাঁচি হাতিয়া এক্সপ্রেস স্টেশনে ঢুকছে। কয়লার ধূমল গন্ধ, ভিড়—আকুল হয়ে মানুষ দৌড়োচ্ছে, রাতের জন্য একটু মাথা রাখার জায়গা চাই চলন্ত গাড়িতে। হুইলারের স্টল থেকে একটা বাংলা পেপার কিনলাম পারিজাতের জন্য—আর জলের বোতল একটা, জল আনেননি। ট্রেনের শেষ ঘণ্টা পড়ে গেল। পারিজাতের দুই চোখে আর্দ্র বিষণ্ণতা। ঠোঁটে ম্লান একচিলতে হাসি লেগে আছে। গত এক বছরের সব ছবি, দৃশ্য ও স্মৃতি যে বল্মীকগৃহ ধীরে ধীরে তৈরি করেছে ওঁর চেতনার ভিতর, আজকের চলে যাওয়া তাকে নিমেষে ধ্বংস করতে পারবে না। এই বেতোয়া নদীর দেশ, এই কয়লাখনির ধুলো-ধোঁয়ার গন্ধ, শালবনের গরম হাওয়ার ঘূর্ণি বহুদিন ধরে ফিরে ফিরে আসবে ওঁর মনে—উনি মুখে কখনও না বললেও আমি জানি।

করমর্দনের সময় আমি বললাম—আপনি চিন্তা করবেন না, কাজ চলবে

আগের মতনই। যতদিন এখানে আছি, মুকুটকে আমি দেখব—আপনি নিশ্চিন্ত মনে যান।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে, প্রায় বুঝতে না পারার মতো নির্ভার ঝাঁকুনি দিয়ে। আমি ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত হাঁটছি।

পারিজাত চেঁচিয়ে বললেন—আর আপনাকে কে দেখবে, বেদপ্রকাশ?

স্পিড নিল ট্রেন। নিরালম্ব একটি করতল, প্ল্যাটফর্মের আলো থেকে বাইরের অন্ধকারের দিকে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। ট্রেন চলে যাওয়ার পরবর্তী নির্জনতার ওপর দিয়ে পা ফেলে আমি প্ল্যাটফর্মের বাইরে গাড়ির মধ্যে দুই শিশুর কাছে এসে দাঁড়ালাম।

ওদের কিছু খাওয়ানো হয়নি।

কত দেরি করে দিলে বাবা, বাবুয়া ঘুমিয়ে পড়ল।

তুমি এখনও ঘুমোওনি মামনি?

আমি কী করে ঘুমোই! তুমি যে আসনি—আমার চিন্তা হয় না বুঝি?

পুতলীর নিষ্কলঙ্ক শিশু-কপালের দিকে তাকিয়ে আমি পারিজাতের প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলাম।

বাঁকা আলো এসে পড়েছে জলে। আলো নয়, সে কী মেঘের উড়ন্ত ছায়া, পিঙ্গল নদীর ওপর দিয়ে ভবিতব্যের মতন এগিয়ে যাচ্ছে আগে আগে ছুটতে থাকা হলদে রোদের ফালিটিকে ধরতে। কার্তিকের শুরু। নদীতীর থেকে আরম্ভ করে যতদূর বাঁয়ে চোখ যায়, ধানের চারাগুলি শস্যভারে নুয়ে পড়েছে। তারই মাঝ দিয়ে হাওয়া বয়ে গেলে শিরশিরানো শব্দ ছড়িয়ে পড়ে উদ্বেল রোদে। নৌকোয় নোঙর ফেলা। তবু এক্ষুনি ঢাউস ক্যান হাতে সারেংকে ডাঙায় নেমে যেতে দেখে মণীশের সৌম্য ভুরু কুঁচকে ওঠে।

অ্যাই সত্যেন, এখন চললে কোথায়, দেরি হয়ে যাবে না? এগারোটা বাজে!

তেল নিয়ে আসি। আগে তো বলেননি একাকুলা যাবেন। তেলে কুলোবে না। আর ওই আপনার হাতঘড়ি আর দ্যাখেন না, এখন ঘড়িতে টাইম দেবে না। আমরা এখন জোয়ার-ভাঁটার হাতের পুতুল, বুঝলেন?

তবু মণীশের ভুরু সোজা হয় না দেখে বুড়ো আঙুল দিয়ে কপালের মাঝখানটা খুঁচিয়ে নিয়ে একটু বিরক্তভাবে হেসেছে সত্যেন, এই তো যাব আর আসব। জল বাড়ছে। সাড়ে এগারোটায় ছাড়লে চারটে নাগাদ খুলো পৌঁছোব। আগে ছাড়লেও লাভ নাই, না! মাঝপথে যদি জল নামতে শুরু করে, মুশকিলে পড়তে হবে। এই খগাই, বাবুদেরকে চা দে।

মণীশ-এর রে-ব্যান-এ আকাশের মেঘ-মায়ার নেগেটিভ। রিয়া স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেছে, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এও তো বেশ লাগছে, নৌকো ডাঙায় বাঁধা, জলের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ, যাব যাব ভাব, অথচ যাচ্ছি না।

মণীশ ও রিয়ার চারিদিকে পিঙ্গল জলে রোদ চমকাচ্ছে, যেন বিশাল এক খয়েরি বালুচরী শাড়ি বিশ্বভুবন জুড়ে মেলে ধরেছে কেউ।

কেবিনের বাইরে এসে রেলিং-এ পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রিয়ার খোলা কোমরে একটি হাত রাখে মণীশ, আমার জন্যে নাকি ওকে সাত-তাড়াতাড়ি তুলে আনলাম! হয়তো সকালে জলখাবারও খায়নি!

এই ওকে কিছু খেতে দাও না, আর খগাইকে বলো আমাদের চা দিতে। ওর গলা যতই মৃদু করুক বাইরে, লোয়ার-কেবিনের ছাতে পা লম্বা করে বসে থাকা অনিন্দ্যর কান এড়ায় না। অনিন্দ্য ওখানে বসেই বলে ওঠে, ভ্যাট্, আমি ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছি, তোরই বোধ হয় খিদে পেয়েছে, পেটুক কোথাকার!

কিছুক্ষণ পর নিচ থেকে সিঁড়ি ভেঙে উঠে স্টিলের থালায় চায়ের কাপ

সাজিয়ে ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ করে অসুন্দর অসুখী খগাই এসে হাজির হ'লে রিয়া তার জলরঙা চুড়ি পরা হাতের তরল শব্দ তুলে মণীশকে হাসি মিশিয়ে চা দেয়, তার পর পেছন থেকে অনিন্দ্যর কাছে গিয়ে চায়ের কাপটি বাড়িয়ে ধরে বলে, ভালো লাগছে ?

অনিন্দ্যর কপালের ওপর এসে পড়া কোঁকড়া এক গাছি চুল একটুখানি কেঁপে ওঠে শুধু। তার ঠোঁট ঈষৎ আলোকিত হয় হাসিতে।

হ্যাঁ ভালোই লাগছে, সুন্দর হাওয়া—আপনার ?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই রিয়ার চোখের সামনে অস্পষ্ট হয়ে যায় নদীতীর, নদীজল, রৌদ্র, ধানক্ষেত ও ভ্যান গঘের ছবির মতো আকাশের নীল। চরাচর অতি সূক্ষ্ম দোলায় দুলতে আরম্ভ করে। রিয়ার মুখের উবে যাওয়া স্বর্ণাভা অনিন্দ্য দেখতে পায় না। দেখে না মণীশও, সে নিচু হয়ে এই মুহূর্তে সামান্য ধুলোমাখা পুরু কাঁচের প্লেট থেকে বুনো চেহারার নোনতা বিস্কুট তুলে নিচ্ছে, খিদে পেয়েছে মণীশের।

সারেং ফিরে এসে মণীশের দিকে পেছন ফিরে একটি বিড়ি ধরায় ও কেবিনের ভেতর ঢুকে লঞ্চ স্টার্ট করে। নোঙর তোলা হয়ে গেছে, হাঁটু পর্যন্ত কাদা, কাদা দু'হাতের আঙুলে, একজন ক্ষেতমজুর ছপছপ করতে করতে জল ছেড়ে উঠে আসতে লেগেছে। খগাইও আসছে, তার ধুতি হাঁটুর ওপরে, শালীনতার এক ইঞ্চি নিচে গোটানো। চুলে কাদা লেগেছে।

হংসালি নদী ধরে নৌকো এগোয়, সূর্য মাঝ-আকাশে। তাকে দেখা যায় না, বরং এক ধরনের মেঘচাপা আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে, ছপাং ছপাং জল সরে যাচ্ছে। বুড়ো হাতির গায়ের চামড়ার মতন অনর্থক আঁকিবুঁকি নদীর জলে। দামাল হাওয়ায় ঢেউ ফুঁসে উঠে আছড়ে পড়ছে নৌকোর ওপর। নৌকোর চলার মধ্যে এক অদ্ভুত টলমল ভঙ্গি আছে, যেন সদ্য হাঁটতে শেখা শিশু বেড়াতে বেরিয়েছে। রেলিং ধরে দাঁড়াতে গেলে হাওয়া এসে চোখেমুখে নোনা ঝাপট মারে। মণীশ নিচে তাকিয়ে সরে আসে। রিয়া কেবিনের ভেতর থেকেই একদৃষ্টে তাকে দেখছে, জানে মণীশ। এও জানে এই মুহূর্তে রিয়ার চোখের পলকগুলি ভিজে, চোখের কোল আস্তে আস্তে শুকোচ্ছে। এই বোধ মণীশকে এক ধরনের কষ্ট মেশানো আনন্দ দেয়।

দু-এক মিনিট বাইরে তাকিয়ে থাকার পর রিয়া বেরিয়ে এসে উল্টোদিকের রেলিং-এ তার সুন্দর শরীরখানির ভয় সইয়ে দাঁড়ালো। মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে আছে রিয়া, দেখছে টার্নের ঝাঁক কেমন নরম ল্যাণ্ডিং করে ঠোঁটে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের চূড়োয় ভেসে ওঠা রুপোলি মাছ, চিলেরা মালার মতন আকাশ থেকে নেমে জলে সাঁতার কেটে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যাচ্ছে। আহা, রিয়াকে যদি কেউ আকাশে তুলে নিয়ে যেত !

ভেতরের কেবিনে একদিকে সারেং-এর স্টিয়ারিং। স্টিয়ারিং-এর দুই পাশে জানলার ধার ঘেঁষে তার ঠাকুর-দেবতারা—লক্ষ্মী, গণেশ, বনদেবী, মা কালী ; সিঁদুর, শুকনো ফুল-বেলপাতার গন্ধ। উল্টোদিকে গদি-মোড়া

বিছানা, তিনদিক খোলা কাচের জানলাপথে থইথই নদী দেখা যায়। মেঘের মাঝখানে কাঠের রেলিঙে ঘেরা নিচে যাবার প্যাঁচালো সিঁড়ি। সেই বিছানার ওপর ফোমের বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে সিগারেট ধরিয়েছে মণীশ, তার পায়ের কাছে সামান্য জায়গা খালি পেয়ে ময়লাটে ম্যাপটি মেলে ধরে নিশীথ দে। নতুন কি পুরনো ম্যাপ বোঝা যায় না, খয়েরি কাগজে লুপ্ত হরপ্পার নকশার মতন আঁকাবাঁকা রেখা সব—নদীর গতিপথ, দ্বীপ, জঙ্গল, নদীতীর আলাদা আলাদা সংকেতে বোঝানো।

আমরা এখানে, রিয়া শুনছে জেনেই গলা পরিষ্কার করে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে নিশীথ, আমরা এখন কাটানিয়ার দিকে এগোচ্ছি। আমাদের ডান ধারে কুশাভদ্রপুর, বাঁদিকে রিয়ামাল।

কই, কাটানিয়া কোথায়?

মণীশ জিজ্ঞেস করে, কিন্তু হেলান দিয়েই বসে থাকে। কাজেই ম্যাপ সমেত তার দিকে ঝুঁকতে হয় নিশীথ দে-কে। সম্ভ্রম-জনিত দূরত্ব বজায় রেখে বলতে হয়, এই যে এইখানটায়!

দূরে তাকিয়েছিল রিয়া—অনেক দূরে। মেঘ-ফুরিয়ে-যাওয়া রোদ-ঝলমল আকাশ মেখলার নিচে সে হঠাৎ দেখতে পেয়েছে ধানবোনা মাঠের ঝাপসা সবুজ নেই, পাখিদের ওড়াউড়ি নেই, নেই লোকালয়ের জলরঙা ছবি—আকাশ বাতাস জুড়ে কেবল পিঙ্গল, ছটফটানো, গজরানো অস্থির জল—এই সেই সংগম যেখানে শঙ্খ এসে মিশেছে চন্দনীতে। দুই ডাকসাইটে নাগরী নদী উত্তরের টাঁড়, পাহাড়, শালবনের হলুদ সবুজ মাড়িয়ে টলমল করতে করতে সমুদ্রের নেশায় চুর হয়ে সমতলে নেমে শান্ত হয়ে গেছে, বিশাল হয়ে গেছে এক দিন, তারপর সমুদ্রের কাছে এসে তাদের দেখা হয়ে গেছে আচমকা—এই দুইয়ের মিলনে তৈরি কাটানিয়া নদী সমুদ্রেরই মতন অন্তহীন, উদ্ভাসিত। সেই তুমুল আবিষ্কারের আনন্দে বালিকার মতো দৌড়ে এসেছে রিয়া। ভিতরে ঢুকে নিশীথ দে-র গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ম্যাপের আঁকিবুঁকির ওপর সোনার ময়ূর আংটি পরা চাঁপা-গৌর তার আঙুল রেখে বলেছে, এই যে কাটানিয়া এখানে, আমি দেখেছি।

মণীশ অলসভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে উঠেছে, আরেব্বাস, কী জল! অ্যাই অনিন্দ্য, ভেতরে এসে বোস না! আমরা কি ফিশিং হারবারের দিকেই যাচ্ছি? নিশীথবাবু, খাওয়া-দাওয়ার কী ব্যবস্থা হয়েছে দুপুরে?

অনিন্দ্য হেসে মুখ ফেরায়, তোর আবার খিদে পেয়ে গেল! এই তো খেলি!

নিশীথ নিচে পঞ্চা ও খগাইকে বকছে লেবু-লংকা আনেনি বলে। ইত্যবসরে মণীশ ধোঁওয়া ছাড়ে, আমার তো সব সময়েই খিদে—দিনে, রাতে।

রিয়া অপমানে রাঙা মুখ নিয়ে বাইরে চলে যায়। ওটুকু তো তুচ্ছ করতেই

পারে মণীশ। অনিন্দ্যর মুখের হাসি মেলায় না। যদিও সে কেবিনের ছাত ছেড়ে ওঠে না। মাথার পেছনে এক হাত রেখে রাজার মতন এই আকাশ-রোদের ঘ্রাণ নেয় অনিন্দ্য। তামাটে, ঘন ওর মাথার চুল সেই রকমই আছে, যেমন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলিতে। রোদে-জলে গায়ের রং হয়তো খানিকটা পুড়েছে, এইটুকুই। নইলে সেই রমণীমনোহর ঠোঁট, তীক্ষ্ম নাক, সেই কপাল—যা ছুঁলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ওষ্ঠাধর; লম্বায় অবশ্য মণীশের ধারে কাছেও নেই অনিন্দ্য, মাত্র পাঁচ ফুট ছ ইঞি। তবু ছিপছিপে বলেই এখনও পালকের মতন নির্ভার দেখায় ওকে। তুলনায় মণীশের মাথার সামনের দিকের চুল পাতলা হতে লেগেছে, চিবুক ও গাল ভারি, চুলের পিছু-হঠাকে জুলপিও সামাল দিতে পারছে না আজকাল। ছ ফুটের ওপর হাইট বলেই ওর শরীরের বিশালতা আরও প্রকট হয়ে পড়ে।

এখনও বাঁশি বাজাস, অনিন্দ্য, এনেছিস?

হ্যাঁ, আছে সঙ্গে। এখন না। দেখি, সন্ধেবেলা বাজাবো।

নিচে ইঞ্জিনঘরের কাছ ঘেঁষে কাজ চলছেই। এই দুলুনির মধ্যেও অসন্তুষ্ট খগাই ও তার সঙ্গে বারো-তেরো বছরের একটা ছোট ছেলে, তার নাম পণ্ডা, ডাব কাটছে, কেটে ওপরে আনলো, চা বানিয়েছে দুবার, বিড়ি খাচ্ছে নিজেরা, বাটা মশলাও বানানো হল। পাঁচফোড়নের গন্ধ সিঁড়ি বেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে হারিয়ে যায় ঢেউয়ের ওপর। এই জলযাত্রায় সবকিছু গুছিয়ে গাছিয়ে সঙ্গে আনতে হয়েছে নিশীথ দে-কে, পান-চুন-খয়ের অবধি, খাবার জলও।

কাটানিয়া ফিশিং হারবারের কাছে এসে পড়েছে নৌকো। এখানেই খাওয়াদাওয়া সারা হবে দুপুরের। নৌকোয় নৌকোয়, মাছ ধরার ট্রলারে ছয়লাপ নদীর কূল। নানা রকম ফ্ল্যাগ উড়ছে—লাল, সবুজ, নীল। জলের রং এখন ময়লাটে কালো। আকাশে মেঘ, রোদ নেই কিন্তু সেই চাপা আলোর ক্ষণিক বদলেই নদী তার রং বদলায়। বাতাসে আনমনা ঝুলে আছে শুখুয়ার গন্ধ। এখানে সব ট্রলারের ছাতেই মাছ শুকোচ্ছে, যেন সবাই ভেবে নিয়েছে, বৃষ্টি হবার কোনও সম্ভাবনা নেই আর। এত ভিড়, নৌকো ভিড়োবার ঠাঁই নেই। মস্ত বড় একটা মোটর লঞ্চের কাছ ঘেঁষে এসেছে ওরা। নতুন রং বার্ণিসে চমকাচ্ছে, কালো বাজারের টাকায় ফুলে-ফেঁপে ওঠা নতুন বড়লোকের মতন।

খগাই, এই খগাই, নৌকো বাঁধবে!

নৌকো সোজা এগোতে এগোতে এক সময় ঘা খাওয়া জন্তুর মতন কাতর আওয়াজ করে, বোধহয় তীরের এঁটেল মাটি পা টেনে ধরায়। সবুজ মাস্তুল সামান্য টাল খেয়ে আবার সোজা হয়। ইঞ্জিনের শব্দ এখন থেমে গেছে। নোঙরের দড়িদড়া পড়ে আছে কেবিনের মাথায়। নোঙরটা কাদামাখা অবস্থায় অবসন্ন পড়ে। একটা বাজতে চলল।

খগাই রেলিং টপকে অতিকায় দড়িটা হাতে ধরে পাশের লঞ্চে চলে গেল। ওর গায়েই আপাতত নৌকো বাঁধা হবে। পণ্ডাও লিকপিকে পায়ে চলে গেল,

হাতে একটা আধুলি। লেবু ও লংকা নিয়ে আসবে পাড়ের দোকান থেকে।

পাশের নৌকোয় চিংড়ি ধরা হচ্ছে। নাইলনের জালের মধ্যে ছটফট করতে থাকা মাছগুলি বাঁধাডিহার প্রসেসিং ইউনিটে চলে যাবে সন্ধের আগেই। অল্প কিছু ভাজা হয়ে রাম্-এর সঙ্গে সেজে চলে আসবে ডিনার টেবিলে—যদি সন্ধেবেলা নৌকোয় মালিক আসেন, অথবা তাঁর বন্ধুরা। এই লঞ্চে অনেক-গুলি লোক, মাঝিমাল্লা, হেল্পার, জোয়ান সব। রেলিং ধরে গাদাগাদি দাঁড়িয়ে গল্পগাছা করছে, সম্ভবত অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে এসেছে, দেহের বর্ণ শ্যাম। হাঁটুর কাছে রঙিন লুঙ্গি গোটানো। জর্দা পানের গন্ধ ভুরভুর করছে কারও মুখে, কানের কাছে তারস্বরে ট্রানজিস্টর ধরে শুনছে কেউ। রিয়া আঁচিয়ে উঠে তোয়ালেতে হাত মুছে রেলিঙের ধারে দাঁড়াতেই ও লঞ্চের পুরুষদের ভিড়ে শিহরণ বয়ে যায়। মোমের মতন মাজা এই মেয়ের তনুদেহ। কাঁধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া রেশম-সদৃশ ট্রিম্‌ড্ চুল, নিবিড়-কালো পাখির মতন বিস্মিত-অবোধ দুই চোখ ও ভুরু—এই নোনা-পানির দরিয়ায়!

রিয়ার কস্তুরীগন্ধে তাদের মুগ্ধতা, আওয়াজ, টাকরায় জিভ ঠেকানো এ নৌকোর পুরুষদের চোখ এড়ায় না। মনীশ বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, খাওয়া-দাওয়া তড়িঘড়ি সেরে, সতর্ক এঁটো-হাতে নিশীথও। কেবল মন্ত্রমুগ্ধ অনিন্দ্য বসেই আছে। খাওয়ার পর ওর প্লেট নিয়ে গেছে খগাই। ছিমছাম নিরামিষ লাঞ্চ। রাজনগরের মিষ্টি সেদ্ধ চালের লাল লাল ভাত, বিউলির ডাল, করলা ভাজা আর কুমড়োর তরকারি। সামান্য ওপাশে বেঁকে হাত ধুয়ে নিয়েছে অনিন্দ্য, খগাই জল ঢেলে দিয়েছে তার হাতে। এখন অনিন্দ্যর সুন্দর কপালে কিছু চিন্তা খেলা করছে।

হুট্ ক'রে তুলে তো নিয়ে এলি, প্রিন্সিপালকেও বলা হল না! ছেলে-গুলো দুদিন যে কী করবে!

ছাড়্ তো! প্লেজার ট্রিপে এসে তখন থেকে কেবল স্কুল স্কুল করছিস। ওরা ঠিক ম্যানেজ করবে। আর প্রিন্সিপালকে চিঠি লিখে এসেছিস তো! কাল রোববার—সোমবার দুপুরেই তোকে নামিয়ে দিচ্ছি।

তবু অনিন্দ্যর কপালের সূক্ষ্ম রেখাগুলি মেলায় না দেখে মণীশ বলেছে, বোর হচ্ছিস না তো? কবিতা-টবিতা লিখতিস এককালে, মনে হ'ল তোর ভাল লাগবে—একা একা আর কত জায়গায়ই বা বেড়াস!

না, না। ম্লান মুখে জোর ক'রে আলো ফোটায় অনিন্দ্য।

তুই না নিয়ে এলে আমার কোনদিন আসাই হ'ত না। আচ্ছা বাঁদিকে কী বল তো আমাদের?

নৌকো সরে এসেছে পাড়ের কাছ থেকে। নদীর মাঝবরাবর। দূরে ফিকে হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ফিশিং হারবারের বেচাকেনার গুঞ্জন, মাছের জালের আঁশটে গন্ধ। ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও করে ডেকে কী যেন অচেনা এক পাখি উড়ে গেছে এইমাত্র ওদের মাথার ওপর দিয়ে। সেই কি এনেছে প্রথম আসন্ন-সবুজ সমুদ্রের সংকেত?

নিশীথ দে তার ম্যাপ সাবধানে কেবিনের ছাতে বিছিয়ে বলল, উম্‌ম্‌, বাঁয়ে কালিয়াপুরাণ, রিজার্ভ ফরেস্ট।

কেওড়া, সুন্দরী ও হেঁতাল জঙ্গলের ঘন-সবুজ দেওয়াল দেখা যাচ্ছে এখান থেকেই। এই অরণ্য—আদিম, দুর্ভেদ্য ও রহস্যময়। শোনা যায় রূপকণিকার জঙ্গলও এর তুলনায় এখনও কিশোর। পাড়ের মাটি খেয়ে যায় জল। জল সরে গেলে ভাঁটায় সুঁদরির শেকড় জেগে থাকে কাদার ভেতর।

নিশীথ কালো, লম্বা, দাঁত উঁচু। নিশীথ একটু গর্বের সঙ্গে বলেঃ আপনি তো রূপকণিকা থেকেই ফিরতে চেয়েছিলেন! একাকুলার আইডিয়াটা আমার। আজ পূর্ণিমা। একাকুলার সী-বীচে যাবার এমন ভালো সময় আর পাওয়া যাবে না, জানেন?

সত্যেন তো বলছিল, তেলে কুলোবে না।

নিশীথ দে গলা নামিয়ে বলে, ওদের সবসময় ছুতোনাতা। লম্বা ডিউটি করতে হবে যে, কাল আবার রোববার—এই তো রূপকণিকায় তেল নেবো। কাটানিয়াতে খগাই দশ লিটার নিয়ে এসেছে পাশের ট্রলার থেকে। তেল একটা ব্যাপার নাকি!

খুলা নদীটি ক্ষীণকায়া, নিতান্ত লাজুক। কাটানিয়ার মতন অতিকায় নদীদেহ থেকে বেরিয়ে নানাভাবে এঁকেবেঁকে সে যে কীভাবে রূপকণিকায় গিয়ে পড়েছে, এ পথে না এলে তার চলন-বৃত্তান্ত অজানাই রয়ে যেত ওদের। অবশ্য নিশীথ দে তাকে ছেড়ে কথা কইত না। তার হরপ্পা-ম্যাপে খুলার মতন একাকিনী রজস্বলাও নীল পেন্সিলে দাগানো।

খুলার মুখেই নৌকো বদলাতে হল। অগভীর, কৃশা নদী—বড় মোটর বোট যাবে না এতে। ছোট্ট একটি রঙচঙে নীল-লাল হালকা বোট, খুলা ও কাটানিয়ার সংগমের মুখে পাড়ের কাছে বাঁধা। তার রঙিন ছায়া ভেঙেচুরে থিরথির করে কাঁপে জলের ভেতর। ঠিক ওপরেই তীরের কাদায় এক জংধরা বোর্ড, লেখা—সাবধান, মির আছে। কুমিরের 'কু' মুছে গেছে কবে। জরাগ্রস্ত এই বোর্ডকে কেউ আর তোয়াক্কা করে না। প্রথমে নিশীথ লাফিয়ে নামে ছোট নৌকোয়, তার পর এক লাফে দৃপ্ত মণীশ, অনিন্দ্যর দিকে নিশীথই হাত বাড়িয়ে দেয়, 'এই যে স্যার' বলে। লীলায়িত রিয়া পায়ের চটি হাতে নিয়ে, শাড়ি সামলে নেমে আসে—নিশীথেরও হাত নেয় না, মণীশেরও না।

অপ্রশস্ত জলধারা চলেছে আঁকাবাঁকা। দুধারে হেঁতাল বন। নল, হেঁতাল, কেঁরুয়া, সুন্দরী গাছে মেশামিশি ঝাপসা দেওয়াল। দিনের পড়ন্ত আলোয় গাছগুলি রহস্যভরে জলে ঝুঁকে পড়েছে। প্রায় স্থির নদীজল। তার কাঁপন এমনই সূক্ষ্ম যে, খালি চোখে দেখাই যায় না। হয়তো কেবল অনিন্দ্য শুনতে পায়—তার স্নায়ুতন্ত্রীতে কোথাও পৌঁছে সে শব্দজাল শিঞ্জন তোলে। ঘন সবুজ ছায়া। মোহময় তাদের দুলুনি জলের ভেতর। সালিম আলির পাখির বইটি নিশীথের প্রাণ। এখন সে বইটি বার করে মলাটে একবার ফুঁ দিয়ে মণীশের করকমলে সমর্পণ করেছে। একশো চল্লিশ রকমের

পাখি আছে এখানকার পাখিরালয়ে। মাছরাঙাই কেবল ছ রকমের। যত প্রজাতির পাখি দেখতে পাবে মণীশ, ততই উজ্জ্বল হবে নিশীথদের কালি পড়া ভবিষ্যৎ।

এখন ডান হাতে বনের ফাঁকে ঘন ধানক্ষেত। বাঁয়ে সুন্দরীর বন। জলের তোড়ে গাছেদের দম বন্ধ হয়ে আসে বুঝি। তাই শেকড়গুলি উঁচিয়ে আছে নিশ্বাস নেবার জন্য। মাঝনদীতে জেগে আছে পুরনো আঁকাবাঁকা ডালপালা ও গুঁড়িসহ কেঁরুয়া গাছ। তার মাথায় বসে ওটা কি গো? সাদা-কালো ছিটছিট পায়েড কিং ফিশার—কী সুন্দর, কী গম্ভীর! রিয়া প্রায় নেচে ওঠে। কত দেখবে ওর দু চোখ! জলে হাঁটু ডুবিয়ে গুগলি খোঁজে দেশি বক। মাথার ওপর দিয়ে হু-উ-স করে উড়ে চলে যায় আইবিস। জংলি আম ও গরানের ঝোপের ফাঁকে ছটফট করে উড়ে বেড়াচ্ছে সবুজ তোতারা। বনে অবিশ্রান্ত ডাকাডাকি চলেছে সারাদিন। সুন্দর, অপরূপ বিকেল। রোদ মরে গেছে অনেক আগেই। ছায়া ঘনায়। বনের সবুজ গন্ধ হাওয়ায় জড়িয়ে ভেসে থাকে। অচেনা কত হলুদ বনফুল উঁকি মারে সবুজ পর্দার ওপার থেকে। কত লতা দোলে মগডাল থেকে হাতির শুঁড়ের মতন। খালি নৌকোর ভটভট শব্দ, এইটুকুই যা! বাকি সমস্ত চরাচরকে গর্ভজলের মতন ঘিরে আছে স্তব্ধতা।

ব্যাটারি অপারেটেড নৌকো রাখেন না কেন, নিশীথবাবু? মণীশ ভুরু কুঁচকোয়, এত শব্দ করে যাওয়ার কোনও মানে হয়?

ছোট্ট নৌকো। কেবিনও খুদে একটি। খাওয়ার জল, রিয়া-মণীশদের মালপত্র সুটকেস-এ বোঝাই। বাইরে ওরা চারজন। আড়াআড়ি পেতে দেওয়া পাটাতনের ওপর অনিন্দ্য, ওর গা ঘেঁষে রিয়া। বাইনক্স হাতে মণীশ সামনে দাঁড়িয়ে, ঠিক পেছনেই সম্ভ্রমে একটু কুঁজো হয়ে নিশীথ দে। রিয়ার নরম চুলে ভরা মাথা অনিন্দ্যর কাঁধ ছুঁয়ে গেছে। বাঁক ঘোরার পরেই আচমকা বিকেলের হলুদ আলোয় ঝলমল করে ওঠে দৃশ্যপট। এ আলোকে কি অরণ্য শুষে নিয়েছিল এতক্ষণ? অরণ্যের ছায়াঘেরা খুলো নদী যেন অনিবার্যতার তোড়ে এসে পড়েছে রূপকণিকায়। রূপকণিকা বড় নদী, এখানে তার চলন ইন্দ্রধনুর মতন বাঁকা। এই কাঁকন-বাঁকে ঢোকার মুখে কাদায় শুয়ে থাকা প্রাগৈতিহাসিক এক অতিকার কুমিরকে কষ্টে হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে দেখে রিয়া। বুঝি অনেকক্ষণ শুয়েছিল এই কুমির। ভাঁটার সময় কাদায় শুয়ে সে রোজই শিকারের অপেক্ষায় থাকে। জোয়ারের জল এলে আনমনে ভেসে যাবে। ফার্ন ও হেঁতাল পাতা খুঁজে তার ওপর ডিম পেড়ে রাখতে হয় তাকে এখানে ওখানে। হয়তো আচমকা নৌকোর শব্দ ভেসে এসে সব কিছু গোলমাল করে দিয়েছে। রিয়া কথা বলে না, ওর সারা শরীর শিউরে ওঠে একবার এবং এই শিহরণের উত্তপ্ত রোমাঞ্চ অনিন্দ্যর দেহে জ্বরের মতন সঞ্চারিত হয়ে যায়। অনিন্দ্য নিঃশব্দে মুখ ফেরায় রিয়ার দিকে। রিয়া ডুবন্ত মানুষের আতুরতায় অনিন্দ্যর কপাল, নাক, ঠোঁট, চিবুক স্পর্শ করে তার চোখের ভাষা দিয়ে। সেই মুহূর্তে

অনিন্দ্যর কালো চশমায় এক মায়াময় ছবির প্রতিবিম্ব ভেসে যায়ঃ নটী-সুন্দরীর ডাল ছেড়ে উড়ে যাওয়া তুঁতে নীলরঙা স্বপ্নিল এক মাছরাঙার! মাত্র একটি কি দুটি মুহূর্ত, কারণ চোখ থেকে বাইনক্স নামিয়ে মণীশ পেছন ফিরেছে; তার পেছন ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বদলে যায়। খিদে পেয়েছে মণীশের।

এই, খগাইকে বলো না! কাছে এসে রিয়ার শুভ্র কাঁধের ও পিঠের দৃশ্যমানতাকে ওর আঙুলগুলি খিদের কথা জানাতেই, খগাই অন্তর্যামীর মতন পিছন থেকে বিস্কুট ও চানাচুরের থালা বাড়িয়ে দিয়েছে। কোথায় লুকিয়ে ছিল কে জানে!

হ্যাঁ, খগাইও এসেছে এ নৌকোয়। পণ্ডা রয়ে গেছে বড় নৌকোয়—ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক ছেলেটা। খগাই না এলে বাবুদের ফাইফরমাশ খাটে কে! খগাই ভালমত ফাইফরমাশ না খাটলে নিশীথও বদলি হবে না এই অজ-গোবিন্দপুর থেকে। আর বদলি না হলে সিন্ধবাদের গল্পের বুড়োর মতন অনাদি অনন্ত কাল নিশীথ দে তার বসদের, তাদের বউ ও বউয়ের বন্ধুদের ঘাড়ে করে এইসব আইবিস, পেইণ্টেড স্টর্ক, স্নেকবার্ড, কুমির, জোয়ার-ভাঁটা দেখিয়ে বেড়াবে। কুশভদ্রপুরের ভারনাকুলার স্কুলে এক হাঁটু কাদা ভেঙে গিয়ে আষাঢ় থেকে আশ্বিন হেজে যাবে তার চোদ্দ বছরের ছেলে।

কাজেই খগাই!

আজ দুপুরে কেবল দুটিখানি ভাত ছেল—ডাল নাই, কিছু নাই। পেট ভরে নাই মোর!

ক্ষুণ্ণভাবে খগাই এই কথা বলতেই দশ টাকার একখানি নোট নিশীথ তার হাতে গুঁজে দিয়েছে স্নেহভরে।

রাখ রাখ! রাতে বেশি করে ভাল খাস এখন। আর রাঙতাপুরের চিংড়ি তো নিচ্ছিই আমরা—লংকা কালোজিরে দিয়ে ঝোল, কেমন?

বাঁক ঘোরার পর থেকে আসন্ন সন্ধ্যার ঘ্রাণ জড়িয়ে ধরছে চরাচরকে। নিবে যাওয়ার আগে যেন কীভাবে একবার জ্বলে উঠেছিল শেষ বিকেলের হলুদ আলোটি খুলার মুখে। রূপকণিকার দুই পাড়ে অগাধ হেঁতাল বন, ঝাপসা সবুজের পর্দা নিথর দাঁড়িয়ে, এখান থেকে দেখা যায়। চিতল হরিণেরা জল খেতে এসে ইতঃস্তত খুরের দাগ রেখে গেছে কাদায়। গেরুয়া রঙের বাজের শরীরে সাঁঝ নামছে। গরান কাঠে বানানো রূপকণিকার আদিম জেটি পেরিয়ে পাড়ে পৌঁছতে পৌঁছতে শেকড় ছড়ায় সন্ধে। কাদায় অনবরত লাফ মেরে চলেছে রাশি রাশি মাড স্পাইক।

অনিন্দ্যটা কিস্যু দেখতে পেল না! ধুস্, কী লাভ হল! খগাই ওকে জেটি পার করে দেবার পর অনিন্দ্য ততক্ষণে একাই আস্তে আস্তে সরু সিঁথির মতন সুরকির রাস্তা ধরে ডাকবাংলোর দিকে চলেছে।

রিয়া তার খরশবিদ্যুৎ দৃষ্টি হানে মণীশের মুখে, তুমি তো জানতেই, তবে ওকে আনলে কেন?

মণীশ এ কথার কোনও উত্তর দেয় না। তার ভুরু কুঁচকেই থাকে। আসলে এই প্রশ্নের উত্তর তার নিজেরই জানা নেই। প্রথমে সে ঠিক করেছিল, রূপকর্ণিকার এই বাংলোয় একটি রাত কাটিয়ে, যে পথে এসেছিল সেই পথেই কুশভদ্রপুর ফিরে যাবে। অথচ নৌকোয় পা রাখার পরবর্তী মুহূর্ত থেকেই তাকে টানছে একাকুলার বিজন সমুদ্রতট, তার জ্যোৎস্না, ক্যাসুরিনা-বন, পাগল হওয়া। যাবেই মণীশ। নিশীথ দে আরও প্রলুব্ধ করেছে তাকে। রোহিতখুল্লার ও তার সঙ্গীরা আসছে, সেই খবরটি তারই পরিবেশন করা। একাকুলায় ওরা অপেক্ষা করবে, মণীশ ও রিয়া আসছে জানলে।

এইভাবেই বিনা পরিকল্পনায়ই কি মণীশ চলে যায়নি অনিন্দ্যর কাছে? কুশভদ্রপুরের দুমড়োনো ছাতা পড়া শহরতলিতে জিপ বিগড়োনোয় বিরক্ত হয়ে সে অনিন্দ্যদের স্কুলের কম্পাউণ্ডে আচমকা ঢুকে পড়েছিল দিন পনেরো আগে। তখন অবশ্য মণীশ জানত না, এখানেই থাকে অনিন্দ্য। কয়েক মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠার পর দুজনে প্রিন্সিপালের ঘরে বসে গল্প করেছিল দু'তিন ঘণ্টা। সতেরো বছরের নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার পর। তখনই সে মনে মনে ঠিক করে, আগামী মাসে এই নদীযাত্রার সময় সে অনিন্দ্যকে তুলে নিয়ে যাবে। একেবারে সকালে পৌঁছে চমকে দেবে অনিন্দ্যকে। এই শহরে অনিন্দ্য নির্বান্ধব। ছাত্র হস্টেলের নিচের তলার একটি সিঙ্গল রুমে কীভাবে কাটে তার দিন! তক্তপোশ, সুটকেসের ওপর কাগজ পেতে বইপত্র সাজানো, এক কোণায় এক কেরোসিন স্টোভ, ময়লা কোঁচকানো চাদর। ছিঃ!

কিন্তু জল, আকাশ ও অরণ্যের আলিঙ্গনে বিহ্বল এই বন পৃথিবীর সোনার গুটির ভেতরে প্রবেশ করার পর থেকেই মণীশ অনুভব করেছে যে, নিজের অজ্ঞাতসারে প্রতি মুহূর্তে এক অমানবিক নিষ্ঠুরতার পরিকল্পনা করছে সে অনিন্দ্যর প্রতি। রিয়াকে সারপ্রাইজ দেবার ভূত তার মাথায় ভর করেছিল অনিন্দ্যকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু সেই প্ল্যান আর এই আদিম বর্বরতা যে একই আত্মবিশ্বাসের দুই সূচীমুখ, মণীশ ভালো করে বুঝে উঠতে পারেনি তখনও।

তাদের দশ বছরের বিবাহোত্তর সহবাসে অনিন্দ্য একবারও রিয়ার দৃশ্যমান সান্নিধ্যে আসেনি, রিয়া মুখেও নেয় না তার নাম। কত রাত না ঘুমিয়ে উৎকর্ণ কাটিয়েছে মণীশ, ছটফট করেছে এই আশঙ্কায়, যদি স্বপ্নে বা জ্বরে অনিন্দ্যকে ডাকে রিয়া! হতাশ করেছে তাকে বার বার, অথচ অনিন্দ্য তো আছে, তাদের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিন্দ্যর বাস, রক্তধমনী-পথে তার যাওয়া আসা! কেন রিয়া এভাবে কষ্ট দেয় মণীশকে, কেন এই আত্মপ্রবঞ্চনার নকাব ছিঁড়ে ফেলতে দেয় না কিছুতেই!

রুক্ষ হয়ে উঠছে মণীশ। যদিও বলেছে একাকুলা যাবেই, নিশীথ দে মনে করেছিল, ও শেষমুহূর্তে মত বদলাবে। এতটা একটানা জলে জলে আসা— রূপকর্ণিকার আই. বি-তে রয়ে যাবে হয়তো রাতে। নিশীথের এই আভাস অনুযায়ী সামান্য ক্লান্ত অনিন্দ্যও সুটকেস খুলে জিনিসপত্র খাটের ওপর

ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখছিল। কিন্তু চা খাওয়া ভালো করে শেষ না হতেই পকেটে দু হাত ভরে আকাশ আড়াল করে উঠে দাঁড়িয়েছে মণীশ।

কাম অন, লেট্‌স্‌ গো!

এক্ষুনি বেরোবেন?

নিশীথের অমায়িক প্রশ্নের উত্তরে খিঁচিয়ে উঠে বলেছে, না তো কি, এখানে বসে মশার কামড় খাব? একাকুলায় খুল্লার ওয়েট করবে না? সবাইকে বলে দিন রেডি হয়ে নিতে।

বাঁধাডিহার কাগজ কলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রোহিত খুল্লার। সে বা তারা আজ রাতে একাকুলায় অপেক্ষা করবে মণীশের জন্য, রিয়ার জন্য। মদ্যপান হবে চাঁদের আলোয় অনেক রাত পর্যন্ত লনে বসে। সঙ্গে রাঙতা-পুরের ভাজা চিংড়ি। কাছেই সমুদ্র তার শিঙার আওয়াজে ভরে দেবে নভস্তল। ঝাউবনে ঢুকে হেঁটে চুপিসাড়ে এগোবে রাতের হাওয়া। যতবারই গ্লাস থেকে ওষ্ঠাধর বিযুক্ত করবে রোহিত, রিয়াকে জরিপ করতে করতে তরল হয়ে উঠবে তার বড় বড় দুই চোখ। এমন তো কতবার হয়েছে!

তুমি তো আগে বলোনি, ওরা আসবে! আঃ, কী করছ? রিয়ার গলা অভিমানে বুজে আসে জেটির দিকে এগোতে এগোতে। সন্ধের অন্ধকারে অভয়ারণ্যের এক ঝাঁক হরিণ নিঃশব্দে চলে গেল ওদের পাশে রেখে। সুরকির রাঙা পথটি পেছনে হারিয়ে গেছে অভয়ারণ্যে ক্রমশ কৃশ হতে হতে। সামনে সেই আবার জেটি বেয়ে নেমে গেছে রূপকর্ণিকা নদীতে। নদীর দিকে তাকিয়ে আকস্মিক ভয়ে হঠাৎ জমে যায় রিয়া। এইমাত্র মণীশের আঙুলগুলি সাঁড়াশির মতন তার বাহুতে গেঁথে গেছিল। এ কি চাপা রাগ মণীশের, অবোধ নিষ্ঠুরতা!

স্যরি, আই ডিড নট মিন ইট। আচ্ছা, আসুক না খুল্লার। তোমার জন্য অন্য ব্যবস্থা করব।

নৌকোর পাটাতনে বসে অনিন্দ্য মৃদু গলায় মণীশকে বলে, তোর কি হয়েছে বল তো? ছটফট করছিস তখন থেকে! এত রাতে সি-বিচে যাবি, জল তো ক্রমশই বাড়ছে মনে হচ্ছে। তার চেয়ে না হয় আমরা রূপকর্ণিকাতেই…

মণীশ একটি গাঢ় নিশ্বাস ছেড়ে বলে, তোর জন্য আমার বড় কষ্ট হয় অনিন্দ্য। এত ট্যালেন্ট, এমন রেজাল্ট, কী হল তোর বল তো!

অনিন্দ্যর মুখ অন্ধকারে কাছিমের পিঠের মতন কঠিন হয়ে ওঠে, আমি তো তোর দয়া চাইনি মণীশ!

নিঃশব্দে হাসে মণীশ।

আমিও তো তোর দয়া চাইনি! কিন্তু কী করবো বল, এক ঢোঁক দু ঢোঁক করে তোর দয়া পান করেই তো বাঁচতে হচ্ছে আমাকে!

সতর্ক নিশীথ দে নিঃশব্দে পেছনে চলে গেছে, ইঞ্জিনের কাছে ছোট নৌকো, আড়াল-আবডালের জায়গা কই আর! তবুও এ সময় কাছেপিঠে না থাকাই ভাল।

কেবিনের ভেতর ডান ধারের কাঠের বেঞ্চিতে খগাই-এর পাতা গদি ও চাদরে ঘুমিয়ে পড়েছে রিয়া। সি-সিকনেস না হলেও সকাল থেকে ক্রমাগত নৌকোর দুলুনিতে তার শরীরে এক ধরনের ব্যথা, মাথাটা ভারী লাগছিল। শোওয়ার আগে বেশি দুধ-চিনি দিয়ে এক কাপ চাও দিয়েছিল খগাই। চা-এর পর ঘুম আসার কথা নয়, চোখ তবু লেগে আসছিল রিয়ার। ঘুমের ভেতর অনেক দূর পর্যন্ত সে টের পাচ্ছিল ঠাণ্ডা হাওয়ার ডানা ঝাপটানো, দুলুনি বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে উত্তাল হয়ে যাচ্ছে। ঢেউ-এর মাথায় একখানি প্রদীপের মতন ভাসছে রিয়ার শরীর। শাল-সেগুনে মেশানো ছোট নৌকা পলকা একেবারে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, খেয়াল নেই—কষ্টে চোখ খুলে এক সময় শুয়ে শুয়ে ছোট্ট জানলা দিয়ে রিয়া দেখতে পেল, জ্যোৎস্নায় গজরাচ্ছে সবুজ জল, আকাশে ঝলমল করছে পূর্ণিমার চাঁদ ; এ তো নদী নয়, দু ধারে কূলের রেখা কই ? এ কি সমুদ্র ! রূপকণিকার মোহনা পেরিয়ে তবে কি নৌকো সাগরে এসে পড়ল ?

ভীষণ দোলার মধ্যেই কোনও মতে বাইরে বেরিয়ে এসে রিয়া দেখল, চাঁদের আলোয় দিগন্ত পর্যন্ত টলমল করছে সর্পিল জল। এখন সবাই স্তব্ধ, নিঃসঙ্গ —মণীশ, অনিন্দ্য, নিশীথ। আস্তে আস্তে রিয়ার মন্ত্রমুগ্ধ দু চোখের সামনে ফুটে উঠল হেঁতাল জঙ্গল দু ধারে, মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া সরু নিস্তরঙ্গ এক জলরেখা, তার ভেতর দিয়ে নৌকো এগিয়ে চলল তীরের ঝাউ জঙ্গলের দিকে। তারপর এক সময় থেমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ।

আর এগোবে না বোট, কূলে ভিড়োবার উপায় নেই, জল একেবারে কম। এই হাঁটুজলেই লাফিয়ে নামতে হবে সবাইকে।

একাকুলা। যেন বিসর্জিতা হয়ে বসে আছে একাকিনী এক নারী। অথবা চারদিকের ক্যাসুরিনা গাছেদের সম্মিলিত দীর্ঘনিশ্বাস। নাম শুনেই যেন বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায়। ডাকবাংলোর চারপাশে ঘন মিশ্র জঙ্গল—ঝাউ, গরান, নারকোল, বট, বড় ছোট নানা গাছপালা এলোমেলো ভাবে বেড়ে উঠেছে। বাইরে থেকে বাংলোটা দেখাই যায় না প্রথমে। নিঃশব্দ এক মিছিল হেঁটে যাচ্ছে অন্ধকারে—মণীশ, নিশীথ দে, অনিন্দ্য, রিয়া ও সবশেষে লটবহর নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে খগাই। হ্যাঁ ওরা—এসে গেছে আগেই। রোহিতরা। হ্যাজাক, সিগারেটের ধোঁওয়া, ব্রিজের টেবিল, পানীয়, উরু চাপড়ে হাসি।

খগাই-এর মুখ দুঃখে কুঁচকে যায়, অবশ্যই সে কিছু বলে না। এর অর্থ, একটি বিড়ি ভাল করে ধরানোর আগেই খগাইকে ধুতি গুটিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে হবে, গেঁথে যেতে হবে এবং দরকারে রান্নাঘর ও বাংলোর মাঝখানকার পথটুকু ট্রে হাতে পেরোতে হবে বারবার। মণীশের কপালে জ্যোৎস্না ও হ্যাজাক-মোমবাতির মেশামিশি আলো। ও এক পা বারান্দায় রেখেছে, এক পা নিচে। নিচে থই থই বালি। বাংলোর চৌহদ্দি খুঁজলেই বেরিয়ে পড়বে কাঁকড়ার মরদেহ, ঝিনুক, পাখিতে এনে ফেলা উচ্ছিষ্ট। মণীশ এই মুহূর্তে ক্রুদ্ধ, বিষণ্ণ না বিরক্ত বোঝার কোনও উপায় নেই, যদিও অন্ধকার বাথরুম

থেকে বেরিয়ে মোমবাতির আলোয় সারাদিনের ক্লান্তিমাখা পোশাক ছেড়ে হাল্কা সালোয়ার কামিজ পরতে পরতে ওর গলার মৃদু ডাকে বুক কেঁপে ওঠে রিয়ার।

হ্যাঁ, আসছি। অন্ধকারের ভেতর থেকেই সে সাড়া দেয়।

ততক্ষণে রোহিত এগিয়ে এসে করমর্দন করেছে। ওদিকে মুখ করে বসেছিল বলে প্রথমটা দেখতে পায়নি মণীশকে। রোহিতের সঙ্গে দু'জন বন্ধু। তারাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

কতক্ষণ এসেছেন?

এই তো পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতন। আপনার রাহু দেখছিলাম।

রিয়া দ্রুত বেরিয়ে এসেছে, কপালে টিপ নেই, চোখে সেই ভোরের কাজল, ঠোঁট রাঙায়নি, নীল সালোয়ার কামিজ ও জলের চূর্ণ মাখা চুলে তাকে দেখে নটীসুন্দরীর ডাল ছেড়ে উড়ে চলে যাওয়া সেই নীল মাছরাঙাটির কথা মনে পড়ে মণীশের। মণীশ স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে বলে ওঠে, বাঃ!

রোহিত খুল্লার ও তার সহযোগীদের উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করে রিয়া। অথচ যেন কাছাকাছি কেউ নেই, এই আলো-আঁধারে তারা নিঃসঙ্গ—এইভাবে মণীশ কাছে টেনে আনে রিয়াকে, ওর দুই কাঁধে হাত রেখে কানে কানে বলে, ওরা এসেছে। আমি বসছি। রাত হবে আমাদের। তুমি একটু অনিন্দ্যটাকে নিয়ে বেড়িয়ে এসো সি-বিচ থেকে। নাহলে বেচারার কোথাও বেড়ানো হবে না।

নিজেকে বিযুক্ত করে নিয়ে অপ্রতিভ রিয়া প্রায় দৌড়ে ভেতরে চলে যায়। তার গমনপথে খানিকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে বেঁকে দাঁড়াতে চেষ্টা করে রোহিত খুল্লার, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, এ কী! বসবেন না? বসুন, আপনি না থাকলে তো সন্ধের মেহফিলই জুড়িয়ে যাবে…

মণীশ হাসতে হাসতেই বলে, যু শাট আপ্!

এ কি ভর্ৎসনা? রোহিত সোজা হয়, চেয়ারে ফিরে আসে। এবং তার বাঁশ জঙ্গল নির্মূলীকরণের পারমিট মণীশের কড়ে আঙুলে ঝুলছে, মণীশ আঙুল নাড়ালেই তা টুপ করে পড়ে ছুঁচের মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে ফাইলের খড়ের গাদায়—এই কথা জানে বলেই মুখের হাসি মেলাতে দেয় না রোহিত, বসে পড়ে তাস সাজায়।

বাংলোর খিড়কিপথে একেবারে সরু, ঝাঁকড়া গাছপালার ভিড়ে গা ছমছমানো পথটি ধরে অনিন্দ্য আর রিয়া জ্যোৎস্নাকীর্ণ বেলাভূমিতে এসে পড়ার সময় আরও একজন তার পথ আটকাতে চেয়েছিল। মালগাড়ির লুজ শাণ্টেড বগির মতন এখন পথেই দাঁড়িয়ে আছে নিশীথ দে।

জীর্ণ ম্যাপটি সর্বদা কাছেই রাখে সে। সেই ম্যাপ বার করতে করতেই অনিন্দ্যকে শোনাবার ছলে নিশীথ রিয়াকে বলেছিল, পূর্ণিমার রাতে এই একাকুলা…অপূর্ব! জানেন না হয়তো, অলিভ রিডলে কচ্ছপদের এই হচ্ছে বিরল এক নেস্টিং গ্রাউন্ড। তিন-চার লাখ কাছিম এখানে ডিম পাড়তে আসে

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে। প্রথম ডিটেক্শন—হুম, বোধ হয় উনিশ শো চুয়াত্তর! সবচেয়ে বেশি রেকর্ড অ্যারাইভাল—ছ লাখ!

নিশীথবাবু, আপনি বাংলোর দিকে যান প্লিজ। ওঁদের কি লাগবে টাগবে…

রিয়ার গলায় যে কাতরতা ফুটে ওঠে, তার অর্থ জানে নিশীথ। সোনার পাখিটিকে পায়ে শেকল পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছে মণীশ। রিয়ার কাছে এখন প্রতিটি মুহূর্ত দারুণ দামী। নিশীথ জানে, খেলা চলছে পৃথিবীর সর্বত্র। এই খেলায় যে যার দাম আদায় করে নেবে। যে নিতে পারবে না, সে নির্বোধ।

অনিন্দ্য সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে; রিয়ার একটু কাছে এসে অন্তরঙ্গ গলায় নিশীথ বলে, আমার বদলির কথাটা একটু মণীশবাবুকে বলবেন? বড় কষ্টে আছি—ছেলেপুলে-বউ এক জায়গায়, আমি এক জায়গায়, দু বছরের ওপর এইভাবে—বলবেন?

ক্রমশ দূরে চলে যায় রিয়ার শরীরের সুগন্ধের বলয়।

রিয়া ও অনিন্দ্যকে জ্যোৎস্নায় মিলিয়ে যেতে দেখে নিশীথ। হাতঘড়ি দেখে সে। ফিরে যাবার পথে কিছু চিন্তা তার কপালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শুকনো চন্দনের মতন।

মাথার ওপরে—ঠিক ওপরে নয়, একটু বাঁয়ে হেলে চাঁদ। ডান হাতে ক্যাসুরিনা অরণ্যে হাওয়ার ডাহুক-ডাক। বাঁ দিকে সমুদ্র বালিতে ভেঙে পড়ছে উদ্বেল সাদা ঢেউয়ে। রিয়া ও অনিন্দ্যর অবয়ব এই মুহূর্তে আলাদা করে চেনা যায় না। রিয়ার মুখ ঝুঁকে আছে অনিন্দ্যর মুখের ওপর। ওর কপালে, গালে এসে লাগছে রিয়ার নিশ্বাস।

চশমাটা খোলো।

থাক না। কী হবে দেখে?

কেন তোমার এমন হল অনিন্দ্য?

তুমিও যে মণীশের মতো কথা বলছ!

প্রত্যুত্তরে রিয়া জোরে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে ওর নিজের দুই ঠোঁট দিয়ে।

খুব কাছেই বালুবেলায় পড়ে আছে বিশাল এক কাছিমের কংকাল। মাছধরার জালে শীতের মরসুমে প্রায়ই কাছিম ধরা পড়ে। ট্রলারগুলি বর্বরের মতন কাছিম তোলে। জালের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতেই তাদের কতগুলো মারা যায়। কখনও জেলেরাই পিটিয়ে মেরে ফেলে। জাল থেকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেয়। সেই প্রাণহীন শরীর সমুদ্র ফিরে নেয় না আর। কাঁকড়া কি উড়ন্ত পাখিরা ধীরে ধীরে খেয়ে গেছে এই মৃত কাছিমের শরীর। পিঠের খোলাটা কেউ তুলে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। অর্থহীন কঙ্কালটা কেবল পড়ে আছে—মানুষ, পাখি, পোকা-মাকড় কেউ এখনও তাকে নির্মূল করেনি বলে।

অনিন্দ্যর গলা রুদ্ধ হয়ে আসে, কেন আবার নিজেকে জড়াচ্ছ রিয়া! তুমি তো মণীশকে জানো—নিজে কষ্ট পাবে ও দ্বিগুণ কষ্ট দেবে, ঘৃণা করবে তোমায়। কেন তোমাকে আজ আমার হাত ধরে নিয়ে বেড়াবার জন্য

পাঠাল, আমি তো চাইনি! আমাকে বলছিল, রিয়াকে ছুঁলেই আমি বুঝতে পারি, ওর শরীর-মন সেই মুহূর্তে অন্য কাউকে চাইছে! অথচ গত দশ বছরে আমি তোমাকে একটিও চিঠি লিখিনি, ফোন করিনি, আর দেখার পাট তো উঠেই গেছে কবে। মণীশও তো জানে। কুশভদ্রপুরের আমাদের স্কুলে খাওয়ার সময় যখন অন্ধ ছেলেমেয়েগুলিকে মূক-বধির ছেলেগুলির গুণ্ডামির হাত থেকে বাঁচাতে হয় নিয়ম করে, আমি এই ভেবে মনে মনে হাসি—কী জীবন আমার! পনেরো বছর আগে সেই যে তোমরা বালিগঞ্জ ফাঁড়ির বাসা ছেড়ে চলে গেলে, দিল্লির ট্রাকে তোমাদের জিনিসপত্র লোড হচ্ছিল, আমি দোতলায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, তারপরেই তো জানলা বন্ধ হয়ে গেল রিয়া! ট্যাক্সি এল, সবার শেষে তুমি পেছনে জানলার ধারে বসলে। ওঠার আগে আমার দিকে তাকালে, হাত নাড়লে। তোমার শাড়ির হলুদ আঁচল, তোমার সেদিনের সেই দুই চোখ, সমস্ত অস্তিত্বের সেই এক মুহূর্তের ভাষা—সেইটুকু আজ কতদিন হল অন্ধকারে বার বার উল্টেপাল্টে দেখছি। আর কোনও দিন দেখতে পাব না তোমাকে।

চোখের জলে রিয়ার সামনে মোছা শ্লেটের মতন হিজিবিজি সাদা হয়ে যায় রাতের সমুদ্র।

একটি আঙুলে ওর ভেজা গাল ছুঁয়ে নিয়ে অনিন্দ্য বলে, আজ সারাদিন তোমরা কত কথাই যে বলছিলে! রোদ্দুর, জলের রং, গাছের সবুজ, পাখিদের ওড়াউড়ি—আমি সব শুনছিলাম। নিশীথ দে-র রানিং কমেণ্টারিও। যেন রঙিন এক স্বপ্নের পৃথিবীতে তুমি ও মণীশ চোখ বেঁধে ঘোরাচ্ছিলে আমায় সারাদিন। আমাদের ভাঙাচোরা স্কুলে, বিবর্ণ ঘরে এত কষ্ট পাইনি রিয়া। আজ বড্ড কষ্ট হচ্ছিল—দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার।

রূপকণিকার সেই চিত্রল হরিণগুলিকে তো দেখিনি আমি, তাদের চলে যাওয়ার যেটুকু শব্দ উঠেছিল ঘাসে, পাতায় সেইটুকু শুনেছি কেবল। তুমি বললে, আমার কালো চশমায় পাখির ওড়া দেখেছ তুমি, আমি কেবল ডানার শব্দটুকু তুলে নিতে পেরেছি নদীর বুক থেকে। হাওয়া, জলের নোনা স্বাদ, রোদের ওম্ এই সব আমি পেয়েছি, বাকি সব কিছু তোমরা ছিঁড়েখুঁড়ে নিয়ে গেছ কেড়ে! তোমরা কেন আমাকে এখানে আনলে রিয়া?

জাফনার সমুদ্র থেকে শরতের শুরুতে রওনা হয়ে গেছে জলপাই কাছিমের দল। এ মরসুমে তারা সংখ্যায় কত, কেউ জানে না। তিন লাখও হতে পারে, পাঁচ লাখও। মাঝ-সমুদ্রে যায় না, উপকূলের কাছের স্রোতরেখা ধরেই সাঁতরায় দিন-রাত। মাঘের শেষে একাকুলায় এসে পেঁছিবার আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত তাদের বিশ্রাম নেই। তারপর একদিন নরম রোদে খাতাপত্র, বাইনকুলার নিয়ে ধেয়ে আসে নিশীথ দে-রা, এ অঞ্চলের ও দেশের যত প্রাণী-বিজ্ঞানী, পরিবেশবিজ্ঞানীরা। বালির ওপর যেখানে অনিন্দ্য ও রিয়া এখন শুয়ে আছে, একদিন সেখানে তিলধারণের জায়গা থাকবে না। জলপাই সবুজ লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের এক সমুদ্রে তৈরী হবে বেলাভূমিতে। ক্রমশ ডিম দেওয়া

শুরু করবে নারী কাছিমের দল। ছোট্ট ছোট্ট সাদা বিশ-ত্রিশটি কাছিম শিশুর জন্ম-সম্ভাবনাকে বড় মমতায় পা-পাখনা দিয়ে ওড়ানো বালিতে ঢেকে দেবে তারা—যাতে আকাশের গাঙচিল, এই পৃথিবীর ক্ষুধার্ত বালকবালিকারা অথবা লোভী ট্রলার-ব্যবসায়ীদের হাত তাদের ছুঁতে না পারে। তারপর ফিরে চলে যাবে কাছিমেরা। যেমন আতুরতা নিয়ে দীর্ঘ সমুদ্রপথ পার হয়ে এসেছিল একদিন, তেমনই অপার ঔদাস্যে ফিরে চলে যাবে। কিছুদিন পর, হয়তো বা এমনই এক পূর্ণিমার রাতে, বেলাভূমিতে আরম্ভ হয়ে যাবে অগ্ন্যুৎপাতের মতন এক নিঃশব্দ ওলট-পালট। লক্ষ লক্ষ কাছিমশাবক ডিম ভেঙে বেরিয়ে আসবে, শরীরে বালু মেখে, মুখ তুলে একবার দেখবে এই অচিন তটরেখা, ওই কান্নায় ভেঙে পড়া সমুদ্র, তারপর ধীরে ধীরে চলে যাবে জলের দিকে। অবিকল সেই স্রোতরেখা ধরে ভেসে যাবে তারা—যে পথ দিয়ে তাদের অচেনা জননীরা চলে গেছে। কে তাদের অজাত চেতনায় ভরে দেয় এই দীর্ঘ জলপথের নকশা, কে তাদের বলে দেয় সমুদ্রের দিশা, অন্তহীন রহস্য!

জ্যোৎস্না আপ্লুত জলের দিকে তাকিয়ে রিয়া ভাবে—কোনও অদ্ভুত মন্ত্রবলে যদি সে ঢেউ-এর মাথায় ভাসতে ভাসতে ওই হেঁতাল জঙ্গল ঘেরা কৃশ জলরেখা পেরিয়ে চলে যেতে পারত, একদিন এই বালুবেলায় জেগে উঠত যদি তার ও অনিন্দ্যর সন্তান, তারপর জ্যোৎস্নায় হাঁটতে হাঁটতে সেই স্বপ্নের শিশু যেত জননীকে খুঁজতে। বালি দিয়ে, খড়কুটো দিয়ে, আলো-অন্ধকার দিয়ে রিয়াও কি ঢেকে রেখে যেতে পারত না তার জন্ম-সম্ভাবনা! তা পারেনি রিয়া। শেষবারের মতন ওষ্ঠাধরে অনিন্দ্যর চেতনা থেকে আজকের বর্ণ-হীনতার স্মৃতি মুছে দিতে দিতে সে দেখে দূর ক্যাসুরিনার দেওয়াল ঘেঁষে দুটি লণ্ঠন এগিয়ে আসছে আততায়ীর মতন—নিশীথ আসছে এবং মণীশ।

মণীশ যতই পান করে থাকুক, রিয়া জানে, আজ তাকে নেবে না—আগামীকালও নয়। ঘরে ফেরার অনেক অনেক পর প্রয়োজনে গর্ভসম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন করাবে। তারপর? রিয়া নড়ে না, অনিন্দ্যর একটি হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে ভয়শূন্য, চিন্তাশূন্য বসে থাকে। সে জানে, বেঁচে থাকার সমস্ত অর্থহীন কোলাহলও ঢেউ-এর মতন শেষ হবে একদিন।

সুখ-দুঃখের ছবি

দরজার বেলটা বেজে উঠল। বসার ঘর থেকে রান্নাঘরে আসার পথে ডান দিকে তাকালেই বাড়িতে ঢোকার দরজাটা। টি ভি-র সামনে বসে কোলের ওপর খবরের কাগজ পেতে সবজি কাটার ট্রের ওপর আমি আটা মাখছিলাম। এখন আমার দু'হাতের আট আঙুলেই আটা। এমনিতে একটা ভোঁতা ছুরি দিয়ে ঘষে ঘষে আটা তুলি। কোথায় যে রেখে গেছে মিলু, এখন হঠাৎ খুঁজে পেলাম না। আঃ, আবার বেল বেজে উঠল! গরম জলের কলের নীচে হাত পেতে তাড়াতাড়ি আঙুলগুলো ধুয়ে নিয়ে আপ্রনে মুছে দরজা খুললাম। মুখে সামান্য হাসির উদ্ভাস নিয়ে দাঁড়িয়ে নীল।

—বিরক্ত করলাম না তো?

—ওমা, সে কী! ভেতরে আসুন না!

—নাঃ, অনেক কাজ। কিছু যদি মনে না করেন, আপনাদের গাছ-ছাঁটার কাঁচিটা একটু ধার নিতাম। আমারটায় একেবারে ধার নেই।

দোতলায় যাবার সিঁড়ির নীচে জুতো ও অন্যান্য জিনিসের না-খোলা দু-একটা বাক্সর সঙ্গে বাগানের গ্লাভ্স্ জোড়া আর কাঁচিটা ছিল। লন-মোয়ারটা শমিত পেছনে নিয়ে গেছে। আমি বেঁকে-চুরে কাঁচিটা তুলতে গেলাম, তার আগেই নীল ভেতরে এক-পা রেখে দেখতে পেয়ে গেছেন জিনিসটা কোথায়।

—ও কী, আপনি দাঁড়ান, আমিই নিচ্ছি।

মজবুত অ্যাথলিট-শরীর হালকা চাঁপা ডালের মতন মুহূর্তে বাঁকিয়ে নীল কাঁচিটা তুলে নিলেন, ওঠার সময় আমাদের দুজনের মৃদু ধাক্কা লাগল। দু'জনেই বোকার মতন হাসলাম। ঘাড় নেড়ে 'সরি' বললেন নীল, কাঁচিটা সন্ধের আগেই দিয়ে যাচ্ছি।

—তার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।

দরজার বাইরে চলে গেছেন, এখন তো আর প্রথা ভেঙে চা খেতে বলা যায় না।

দরজা বন্ধ করে এসে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে লেচি বানাতে বানাতে আমি মনশ্চক্ষে নীলের বাগান ও লন দেখতে চেষ্টা করছিলাম। আমাদেরই ডানদিকে পাশের বাড়িটা। দুশো একুশ নম্বর। আমাদের বাড়ির চেয়ে অনেকটা বড়। দোতলা। সামনে পেছনে লন। নীল মাস-দুয়েক হল এসেছেন। কিন্তু রোদে-জলে দ্রুত বেড়ে ওঠা ঘাসগুলি ওঁকে নাজেহাল করে ছাড়ছে। চুক্তি অনুযায়ী বাড়িওয়ালা লন দুটিতে বুরুশ-ছাঁট দিয়েই বাড়িটি হ্যান্ডওভার করেছিলেন। এখন ঘাসের মধ্যে অনায়াসে গা ডুবিয়ে পাখিরা

চলাফেরা করে। হলদে আগাছার ফুল, গাঢ় লাল পপি ইচ্ছেমতন বেড়ে উঠেছে। এইরকম ছোট শহরে এই নিয়ে সাধারণত প্রতিবেশীরা বলাবলি করে। তবে নীলের কথা আলাদা। উনি চাঁদে গিয়ে ঘুরে এসেছেন। উনি একটু খাপছাড়া, অগোছালো, প্রথাবিরোধী—সবাই জানে। প্রথমে তো আমি ওঁকে চিনতামই না। মিলু-শমিতও নয়। তখন মাত্র সপ্তাহখানেক আগে এক বৃষ্টি-ঝরা সকালে নীল আর্মস্ট্রং এসে পেঁাছেছেন। দুই বাড়ির মাঝখানে ঘন ফার্নের বেড়া। বেড়া না থাকলেও অবশ্য কার সময় আছে প্রতিবেশীর গতিবিধি লক্ষ করার! রাস্তা পেরলে, আমাদের ঠিক উল্টোদিকে লিল হপারের বাড়ি। লিল-এর ভাল নাম এলিজাবেথ। উনিশশো একচল্লিশে নৈনিতালে ইয়ান হপারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তারপর চার-পাঁচটা বছর কেটেছে মীরাটে। 'ভারত ছাড়ো'র অশান্ত আবহাওয়ায় টেনশন, আতঙ্ক—অবশেষে সাতচল্লিশের গোড়ায় এডিনবরাতে ফেরা। ইয়ান মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে, লিল-এর ভারতজনিত মন-কেমন-করা এখনও মেলায়নি। প্রায়ই সন্ধেবেলা এসে বসেন, কখনও আমাকে নিয়ে যান পুরনো ছবির অ্যালবাম দেখাতে নিজের ড্রইংরুমে।

সেদিন সাড়ে আটটা নাগাদ আমি রান্নাঘরে, মিলু-শমিত টিভি দেখছে, প্রচুর পরিমাণে ক্ষমা চাইতে চাইতে লিল এসে টেবিলের ওপর থেকে একটু আগে ফেলে যাওয়া নিজের টুপিটা তুলে নিলেন। তখন চন্দ্রবিজয়ের পঁচিশ বছর দেখাচ্ছিল চ্যানেল ফোর-এ। মিলুরা আঠার মতন সেঁটে গেছে সোফাতে। টুক করে গলা বাড়িয়ে লিল বলেছিল, আমার প্রতিবেশীকে চিনতে পারলে! আশ্চর্য, পঁচিশ বছরে মানুষ কত বদলে যায়! ইয়ান-এর পুরনো সাদা-কালো ফটোগুলো যখন বার করে দেখি···

আরে, এই তো নীল!

রিট্রুজ নাক, মোটা ভুরু, প্রায় মঙ্গোলিয়ান কপাল। স্পেসক্র্যাফট ছাড়ার আগের মুহূর্তে কেবিনের মধ্যেকার স্টিল ফটো। সামান্য উদ্বেগ, একচিলতে টেনশন, একবিন্দু ভয়ও কি লেগে ছিল সেই মুখে? আমি তো ভীষণ অবাক হয়ে গেছি, ইনিই নীল আর্মস্ট্রং! কী আশ্চর্য! মিলুর বয়স তখন ছয় না সাত, আমরা বেহালায়—সেই চাঁদে মানুষ পাঠাল আমেরিকা। আমাদের পাড়ায় বেশ গুলতানি হয়েছিল, একটা আলোচনা-সভা মতন হয়েছিল পরে। নেতাজি ক্লাবের কিছু ছেলে একটা অভিনন্দন পত্র ইংরেজিতে লিখে আমেরিকা পাঠিয়েছিল। তাতে আমাদের সবার সই নিয়েছিল—আমি, সবিতা, মণ্টুর দিদিমাও কাঁপা হাতে বাংলায় সই দিয়েছিলেন। মনে পড়ে সকালে উঠেই সমস্ত কাগজের হেড লাইনের চিৎকার—চাঁদের ওপর টলমল পায়ে হেঁটে বেড়ানো মানুষের ছবি!

সেদিন রাতে বেশ উত্তেজিত বোধ করেছিলাম। মিলু-শমিত মাঝখানের শোবার ঘরে শোয়। আজকাল ওদের দুজনের সম্পর্কে বেশ টালমাটাল চলছে। ফলে বুবলি রোজই আমার কাছে। আগে ঠিক ঘুম আসার আগে মাঝে-মধ্যে

বাবা-মায়ের কাছে দৌড় লাগাত। এখন আর মুখ ফুটে কিছু বলে না। তাছাড়া মিলু ওকে সাড়ে নটার পর জাগতেই দেবে না, ধমকধামক দিয়ে ঘুম পাড়াবে। আমি অনেকক্ষণ ধরে গল্প বলি বুবলিকে—কাটা ঘুড়ির, ভূতের, দৈত্যের, জানলে শমিত আমাকেও বকবে, বলবে আনসায়েণ্টিফিক, কুসংস্কারের ঢিপি হচ্ছে মেয়েটা। বুবলি আমার গায়ে এক পা তুলে, হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে শোয়। সন্তান মানুষ করতে বুকের উত্তাপও লাগে, সে কথা কি মুখে বোঝানো যায়? অথচ মিলুকে তো আমি কত আদর দিয়ে মানুষ করেছি।

তা সেই রাতে চ্যানেল ফোর-এর প্রোগ্রামে নীল আর্মস্ট্রং অথবা আমাদের নিঃশব্দ, লাজুক প্রতিবেশীকে আবিষ্কার করে আমি বেশ উত্তেজিত বোধ করছিলাম। অনেকক্ষণ ঘুমই এল না। হয়তো দু'পশলা বৃষ্টির পর আচমকা চারপাশ ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় সেণ্ট্রাল হিটিং চালিয়ে ভুল করেছিলাম। ঘরটা গরম হয়ে গেছিল প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। কিংবা লিল-এর সঙ্গে দু'কাপ চা খাওয়া উচিত হয়নি সন্ধে সাতটার পর। বয়স তো বাড়ছে, ঘুম কমছে। রুটিন সামান্য ওলট-পালট হলেই মুশকিল। ঘুম না এলে আমি আকাশ-পাতাল ভাবি, আর তার মধ্যে সুপ্রকাশের মুখটা ভেসে ওঠে বার বার। একটা চিঠিও তো দিতে পারত সুপ্রকাশ! সম্পর্কের দায় তো নেই, তবুও—মেয়ে-জামাইয়ের সামনে লজ্জা করে না! শমিত আগে ভালবাসত আমাকে, নতুন নতুন বিয়ের পর আমাদের বাড়িতে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছে, কারণে অকারণে মা বলে ডেকেছে আমায়। খাওয়ার সময় প্রথম দু-তিনটে গ্রাস ওর মুখে ভরে দিতে হবে আমায়।

শমিতের মা ওর অল্প বয়স থেকেই রুগ্ন, মায়ের আদর ও ছোঁয়া কখনও ও তেমন ভাবে পায়নি। অথচ শমিত ক্রমশ দূরে চলে গেছে আমার কাছ থেকে। এই যে সুপ্রকাশ চলে গেল, রূপান্বিতাকে নিয়ে আলাদা থাকতে আরম্ভ করল অন্য বাসায়, এই ব্যাপারটার ক্রমবিকাশের জন্য শমিত মনে মনে আমাকেই দায়ী করে। আমি জানি আমার নিঃশব্দ একগুঁয়েমিকে। তার সঙ্গে জুড়ে গেছে এই আশঙ্কা যে, যেহেতু মিলু আমার একমাত্র সন্তান, আমাকে দেখা-শোনার ভার পড়ল বুঝি ওদের ঘাড়ে। ছোট ছোট কারণে গলার স্বর বদলে যাওয়া, রুক্ষতা, খুঁত ধরা—শমিত যেন কেমন হয়ে গেছে সত্যি! এদেশে আমি কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় আসিনি। ওখানে—মানে কলকাতায়, একরকম চলে যেতে পারত আমার। বাড়িভাড়াটা এখনও সুপ্রকাশই দেয়। জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্টের টাকাও তুলতে পারি প্রয়োজনমতো। এটাও সুপ্রকাশের উদারতা। বিবাহবিচ্ছেদের কাগজে সই করিনি, তবু বস্তু-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও অভাব বোধ করতে হয়নি আমাকে। একা থাকলে কিছু ছেলেমেয়েকে বাড়িতে পড়াতে পারতাম। মিলুই আমাকে ধরে টেনেছিল—মা, তুমি চলো। জানোই তো ওদেশে কোনও সোশ্যাল লাইফ নেই, মেয়েটা সারাদিন একা একা হাঁপিয়ে যাবে। আমাকে কাজ তো নিতেই হবে কিছু একটা, নইলে চলবে না। তাছাড়া

লাইসেন্সড বেবি-সিটার রোজ রাখতে গেলেও বেশ খরচা সেদিক থেকে…

শমিতের এই বোকার মতো কথায় মিলু রাগ করেছিল।

ও, মাকে তাহলে বেবি-সিটিং করতে নিয়ে যাচ্ছ আমি!

আমিই হেসে ওদের থামিয়ে দিয়েছিলাম—বাড়িতে তো বসেই আছি, বুবলিকে দেখব না কেন? ওদের বয়স কম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, পথে নামতেই হবে ওদের—আমি এইটুকু করব না কেন? শমিত-মিলুর জন্য? তবে শমিত যেটা বুঝতে পারেনি, বাবা তো হাজার হোক, প্রশ্নটা শুধু টাকার নয়—নানা ধরনের বেবি-সিটারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কত মুশকিল হত বুবলির পক্ষে!

শমিত উঠে গেলে মিলু আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, মা, তোমাকে আসতেই হবে, নাহলে মরে যাব আমি। প্লিজ, আসবে তো?

তা সেই আমার প্রথম আকাশে ওড়া।

টেলিভিশনের পর্দায় ১৯৬৯-এর নীলকে দেখার পর সপ্তাহ তিনেক কেটে গেল নিজের গতিতে। সকালে উঠি, জলখাবার এ বাড়িতে দুধ আর সিরিয়ালস, কাজেই কিছু তৈরি করার নেই। মিলু-শমিতের স্যাণ্ডউইচ বানাই, ওরা সঙ্গে নিয়ে যাবে। বুবলি লাঞ্চ স্কুলেই খায়। সওয়া আটটার সময় বুবলিকে স্কুলে দিয়ে আসা। এটা অবশ্য দারুণ লাগে আমার। হিম হিম সকালে দু'পাশের গাছগুলি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে, রাতের বৃষ্টিতে ঝরে পড়া চেরির ছোট ছোট গোলাপি পাপড়িতে ফুটপাত ছেয়ে আছে। মৃদু সুগন্ধ ওঠে ভেজা ঝোপঝাড় থেকে। একবার, বসন্তের গোড়ায়, আমাদের বাড়ির কাছে চৌরাস্তার রোড আইল্যাণ্ডে শীতের মরশুমী ফুলগুলিকে বদলে বসন্তের নানা রঙের ফুল লাগাচ্ছিল ছ-সাত জন নীল ইউনিফর্ম পরা মানুষ। আমি বুবলিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। লোকগুলি একটা ভ্যানে চড়ে এসেছে, সম্ভবত নগরপালিকার। একজন মাটি কোপাচ্ছে, আর একজন উপড়ে ফেলা ফুলগুলিকে সযত্নে তুলে হাত-গাড়িতে রাখছে। খুব বুড়ো একজন নতুন আনা ফুলের গাছগুলিকে প্লাস্টিকের পাত্র থেকে বার করে সাজাচ্ছে। গাছ লাগাবে আরও দুজন। নিঃশব্দ এক সিম্ফনির মতন এই সম্মিলিত টিম-ওয়ার্ক মরমী মানুষগুলির—কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না, কেউ সিগারেট খাচ্ছে না, সকলে মিলে যেন কাচের দেওয়ালের ওপার থেকে দেখা এক ছবি।

বাড়ির সদর দরজার একটা চাবি থাকে আমার কাছে, কাজেই দেরি হলেও ক্ষতি নেই। মিলু-শমিত বেরিয়ে যায় আমি ফেরার আগেই। আমি এসে স্নান সারি। তারপর এক কাপ চা খেয়ে নিজের জন্য, দুপুরের ও রাতের রান্না সবার সারি। বুবলি স্কুল থেকে ফিরলে আর সময় পাওয়া যায় না।

দুপুরে খেতে বসার আগে মাঝে মাঝেই আমাকে কাছের সুপার মার্কেটে যেতে হয়—কিছু একটা ফুরলো, অথবা ফুরোবে, কিংবা হয়তো ভাল শাক-সবজি নেই ঘরে। মিলু অবশ্য বলে, মা, তুমি যেও না তো! সন্ধেবেলা

আমরা এসে দেখব। কিন্তু ওরা যে বড় ক্লান্ত হয়ে ফেরে। মিলু আসে ছটায়। শমিত সাড়ে সাতটা নাগাদ। আটটায় সুপার মার্কেট বন্ধ হয়ে যায়। মানে, এসেই বাজারের ফর্দ হাতে সাইকেল নিয়ে দৌড়বে শমিত। তা কী করে হয়? আমি যখন বসেই আছি বাড়িতে। সেই তিনটেয় বুবলিকে স্কুল থেকে নিয়ে আসা। তার আগে তো কোনও কাজ নেই। টুক টুক করে হেঁটে আমি পাউরুটি, মাখন, চিজ, ডিমের বাক্স অথবা আলু-পেঁয়াজ, যতটা ওজন হাতে সয় আমার, নিয়ে আসি। গ্রীষ্ম এসে গেছে। মেঘ-মেঘ বেলা হলে অথবা বৃষ্টি পড়লে অতটা কষ্ট হয় না। কিন্তু চড়া রোদ উঠলে ঘাড়ে মাথায় জ্বালা ধরে, হাঁটা আরও শ্লথ হয়ে আসে। এমনই এক রোদের দুপুরে আমি আস্তে আস্তে হেঁটে আসছি, এক হাতে আলু পেঁয়াজ আর পাউরুটি, অন্য হাতে রান্নার তেলের তিন লিটারের বোতল। অল্প কিনলে শমিত খুঁতখুঁত করে, ন্যাকি ইকনমি হয় না।

কখন যে পাশের বাড়ির ছাই-রঙা টয়োটা বনবেড়ালের মতো পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি। নীল আস্তে করে ডাকলেন, বটাচার (ভট্টাচার্য), মে আই গিভ ইউ আ লিফট হোম?

এর আগে বাড়ির সামনের রাস্তায় দু-তিনবার শুভেচ্ছা বিনিময় হয়ে গেছে। কার্যত এই প্রথম আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বললাম। অকারণ লজ্জার সঙ্গে বললাম, না না, এটা আমার…আমি রোজ খানিকটা হাঁটতে ভালবাসি। লিফ্‌ট দরকার নেই। ভাঙাচোরা ইংরেজিতেই, তবে নার্ভাসনেসের জন্য, 'হাঁটতে ভালবাসি'র ওপর বেশ জোর এসে গেল।

নীল এগিয়ে গেলেন। আমি এই সুযোগে একটু দাঁড়িয়ে জিনিসগুলো হাত বদল করলাম। ডান হাতটা পলিথিনের থলের দাগে লাল হয়ে উঠেছিল। একটু এগোতেই দেখি, রাসেল ড্রাইভের ক্রসিং ছাড়িয়ে নীলের গাড়ি আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে।

—কী ব্যাপার?

—বটাচার, আই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া। আপনি হেঁটে যান, জিনিসগুলো আমি বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি। হাঁটার আনন্দ পেতে হলে ওজন বওয়া তো জরুরি নয়। ও কে?

এবার আমি ভীষণ বিব্রত বোধ করলাম।

নীল নেমে এসে নিজেই আমার হাতের ব্যাগ তিনটে তুলে পেছনে রাখলেন, তারপর সামনের সিটের দরজাটা খুলে দিলেন। সিট বেল্টটা ম্যানেজ করতে পারছিলাম না, সযত্নে লাগিয়ে দিলেন। তারপর চন্দ্রবিজয়ী দলের ক্যাপ্টেন আমায় আড়াই মিনিটের মধ্যে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বা-ই বলে চলে গেলেন।

এই দুপুরে কোথা থেকে ফিরছিলেন কে জানে!

এক বছর হতে চলল, প্রায় রোজই দুপুরে সুপার মার্কেট যাচ্ছি, কেউ আমায় লিফট দেয়নি কখনও। কিন্তু নীলের যদি এটাই ফেরার সময় হয়,

আমাকে সময় বদলাতে হবে। রোজ রোজ পরের গাড়ি চড়ে আসা যায় ? পাগল ! শুনলে শমিত আর মিলুও ভুল বুঝতে পারে। পরের দিন নীল নিজেই রহস্যমোচন করে দিলেন, নিয়মিত কিছু নয়। কাছেই একটা থিয়েটারে পুতুল তৈরি শেখাচ্ছে—পুতুল নাচের পুতুল। বড়দের আর ছোটদের আলাদা আলাদা সময়। চারদিনের ওয়ার্কশপ। আজই শেষ হল।

—আগামী কাল থেকে আপনার সঙ্গে দেখা হবে না এই রাস্তায়। হাঁটতে হাঁটতে আপনি নিজের বাড়ি পেরিয়ে গেলেও কেউ কিছু বলবে না।

খানিকটা জ্যোৎস্না মেশানো ছিল নীলের সেই হাসিতে। তাই ?

আমাদের বাড়ির কাছে ছোট এক নদী আছে। কেন জানি না, তার নাম লোলা। এঁকেবেঁকে শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যেতে যেতে সে আমাদের বাড়ির কাছে যে বিস্তৃত ঘাস জমি ও লালিত জঙ্গল আছে তার বুকে এক ঝলক দেখা দিয়েছে। নেহাতই খেয়ালের বশে। তারপর আবার নিজের মনে সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। নদীর ধারে মনোরম একটি পায়ে চলা পথ আছে, পুরনো সব বিরাট গাছ ঃ ওক, বার্চ, অ্যাশ, উইলো। বসন্ত ও গ্রীষ্মে নানা রঙের ফুলে ঘাস জমি ভরে ওঠে। একদিন বুবলিকে নিয়ে সেখানে বেড়াচ্ছি, দেখি নীল একমনে মাছ ধরছেন। রীতিমতন ছিপটিপ নিয়ে। পাকো মাছের খাবারের টিন, একটা ব্যাগ, একটা চটি বই। এখানে নদীর ওপর বাঁকা একটি ব্রিজ আছে, সাদা রং করা। সেই ব্রিজের তলায় পাথরে লেগে জলের খরস্রোত। আমি নীলকে দেখেই বুবলিকে নিয়ে একটু এগিয়ে গেলাম, মেয়েটা অনর্গল কথা বলে। কথা বললে মাছ ধরিয়েদের অসুবিধে। এখানকার মাছ শিকারীরা তো মনপ্রাণ দিয়ে মৌন অবলম্বন করেন মাছ ধরার সময়। নীলের মাথার উপর ডালপালা ও সবুজ অজস্র পাতা নিয়ে ঝুঁকে আছে এক পুরনো উইলো গাছ।

ফেরার পথে দেখি নীল ছিপ তুলে নিয়েছেন, আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

বুবলি এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াতে লাগল।

আমি বসলাম।

—আমাকে না দেখেই চলে যাচ্ছিলেন, অ্যাঁ ?

—সরি, আমি ভেবেছিলাম কথা বললে আপনার···

—দূর ! এ তো শখের মাছ ধরা। এ মাছ নিয়ে আমি করব কী ?

তারপর জলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বটাচার, হোয়াট ইজ ইওর হবি ? কী করে সময় কাটান ?

আমার নামটা নীলকে বলতে ইচ্ছে করল। এতদিন পরে, অব্যবহারে পুরনো হয়ে গেছিল। ঝেড়েঝুড়ে, ধুলো মুছে যেন পদ্মপাতার ওপর রেখে বললাম, আমার নাম সীমা। আমার কোনও 'হবি' নেই। সময় কাটানোর জন্য কোনও চিন্তাই নেই আমার, সময় কেটে যায়—বরং কাজই শেষ হয় না।

—সে কী ! নীল ভুরু তুললেন, হাউ ?

লোলা নদীর লাস্যময় জলে সূর্য ডোবে। নিভন্ত সূর্যের আলোর ভাষায় কী এক অনির্বচনীয়তা আছে, যা স্পন্দিত হওয়া মাত্রই চারিদিকে আরম্ভ হয়ে যায় পাখিদের অজস্র কলকাকলি। উইলো গাছটি বহতা জলকে ফিসফিস করে কান্না-ভেজা গলায় কিছু বলে। হাঁসেরা নদী, জল ছেড়ে ঘাসের ওপর উঠে পা মোছে, ডানা ঝাড়ে। ডানা থেকে মুগ্ধ জলবিন্দুগুলি ঝরে পড়তেই ঠাণ্ডা নরম মাটি সেগুলিকে শুষে নেয়। সন্ধের হাওয়া আমার গালে, কপালে, আঙুলে ছোঁয়াতেই আমি চমকে উঠে হৃদয়ঙ্গম করি আমার সারা জীবনকালের পটচিত্র আমি নিজেরই অজান্তে খুলে দিয়েছি নীলের কাছে। বিনিময়ে নীল আমাকে বলেছেন, আমেরিকা থেকে চলে এসে উত্তর সাগরের এই ছোট্ট দ্বীপের এক নির্বান্ধব শহরে মাস চারেকের অজ্ঞাতবাসের ইচ্ছের কথা। পঁচিশ বছর আগেকার সেই বিজয় অভিযান নিয়ে এখন রমরম করছে টেলিভিশন, বই বেরুচ্ছে, কাগজের কলমগুলি নতুন করে সরব হয়ে উঠছে—কত মিলিয়ন ডলার খরচা হয়েছিল, তারপর চাঁদের কী হল, নীল কি সত্যিই হেঁটে ছিলেন চাঁদের মাটিতে না ওটা ফটোগ্রাফির টেকনিক ছিল? ইত্যাদি। নীল এইসব থেকে দূরে চলে এসেছেন। টি ভি চ্যানেলগুলির কাছে নিজের কমিটমেণ্ট শেষ হতেই, অন্য সব আনুষঙ্গিক দায় মিটিয়ে, একেবারে চুপচাপ। এখানে নীলকে ব্যক্তিগতভাবে প্রায় কেউই চেনে না। নামে চিনলেও যেচে এসে আলাপ করবে এমন সময় কারও নেই এই নির্জন শহরে। নীল ভাল আছেন। বাগানের দেখাশুনো করা নিজের নিয়মে, সপ্তাহে একদিন সিটি সেণ্টারের সুপারমার্কেট, মাঝে মাঝে থিয়েটারে ভাল ছবি দেখা কিংবা কনসার্ট—এই তো পুতুল তৈরিরও তালিম নিয়ে এলেন।

নদীতীরের অন্ধকারমাখা পথ ধরে আমরা দু'জন আর বুবলি বাড়ি ফিরি। বেশ ঠাণ্ডা। মিলু ওর পুরনো জ্যাকেটটা দিয়ে দিয়েছে আমায়। এবার তার বোতামগুলো এঁটে নিতে হয়। কোনও কথা বলছি না কেউ। অথচ আমার আর নীলের মধ্যে একটা নির্জন সাঁকো তৈরি হয়ে গেছে, নিজেদের অজান্তেই। বসার ঘরের জানলা দিয়ে মিলু বারবার বাইরে তাকাচ্ছিল উদ্বেগে। এত দেরি তো হয় না আমাদের। দরজা খুলেই বুবলির দুই গালে হাত ছুঁইয়ে বলল, ইস, কী ঠাণ্ডা! অতক্ষণ জলের ধারে বসেছিলে?

বুবলি আমার দিকে আড়চোখে তাকায়। অর্থাৎ দেরি কেন হয়েছিল, সে কথা আমি জানব আর ও জানবে—মিলু না জানলেও চলবে।

আট আঙুলে আটা, রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আমি নীলের অতীতকে ভাবছি।

আঃ নীল, মনে পড়ে আপনাদের সেই বিজয় অভিযান? হাজার হাজার মানুষ আমেরিকার রাস্তায়, ওয়াশিংটনে, নিউ ইয়র্কে, কেপ কেনেডিতে। অভিযাত্রীরা ফিরে এসেছেন, কোয়ারানটাইন চলেছে স্পেস ক্রাফট থেকে নামার পর থেকেই। সেই খাঁচার ভিতর থেকেই বুঝে গেছেন আপনি, অলড্রিন, কলিন্‌স যে জীবন আর কোনও দিন আগের মতন হবে না। আকাশে উড়ল

রঙিন বেলুন, বাড়ির বারান্দায়, ফুটপাতে মানুষ, ছাতে মানুষ, আকাশ থেকে উড়তে উড়তে নামছে অসংখ্য বরফকুচির মতন কাগজ। আপনি হাসতে হাসতে হাত নাড়ছেন ছাত-খোলা গাড়ি থেকে। এরপর, মানে রাশিয়াকে কেটে আমেরিকা বেরিয়ে যাওয়ার পরই কেমন করে যেন জুড়িয়ে গেল চাঁদ বিষয়ে সাধারণ মানুষের ও বিজ্ঞানীদের কৌতূহল। একজন জিওলজিস্ট এরপর চাঁদের মাটি বিষয়ে কিছু মন্তব্য নিয়ে ফিরে এলেন, আর একটা অভিযান। কিন্তু সবাই বুঝে গেছিল, পার্টি শেষ হয়ে গেছে।

তখন তো আপনাকে আমি চিনতাম না, সেই যখন চ্যানেল ফোর-এ চন্দ্রবিজয় দেখাচ্ছিল। অথচ লঞ্চ-এর সময়ের সেই মুহূর্তটি আপনার মুখের সেই ক্লোজ আপ, আমার চেতনায় একেবারে গেঁথে গিয়েছিল। আপনি তখন কী ভাবছিলেন বলুন তো ?

গভীর নীলের মধ্যে তীব্র গতিতে হারিয়ে যাচ্ছে রকেট, সাদা ঝকঝকে ধাতব শরীর, পেছনে আগুনের স্পন্দমান ল্যাজ, কেপ কেনেডিতে টেনশনে টান টান রোদ চশমা পরা হাজার হাজার মানুষ-মানুষীর মুখ। এক লহমার এক ভগ্নাংশের জন্য আপনার মুখে কী ফুটে উঠেছিল নীল, ভয় ? না পৃথিবীতে আর কোনওদিন ফিরতে না পারার আশঙ্কিত বেদনা ? অলড্রিন তো তবু লঞ্চ-এর আগে ফোন করে জোয়ানকে বলেছিলেন, যদি কিছু হয়, মনে রেখো তোমাদের ভালবেসেছিলাম। আপনি তো কিছুই বলেননি ?

তার পরেই তো টেক অফ। কন্ট্রোল রুমের গুড লাক অ্যান্ড গুডস বিড এর উত্তরে আপনি থ্যাংক ইউ বলে মৃদু কণ্ঠে প্রথম রিপোর্ট করলেন।

আকাশযানের মধ্যে আপনি খুব আড়ষ্ট বোধ করছিলেন, আমি বুঝতে পারছিলাম দেখেই। সারা পৃথিবীর মানুষ প্রতি মুহূর্তে আপনাদের দেখছে টেলিভিশনের পর্দায়। কন্ট্রোল রুম ওয়াচ করছে। পাউরুটির স্লাইসটা মাথার ওপর ডিগবাজি খাচ্ছে স্পেস ক্রাফটের মধ্যে, আর কেমন অনায়াসে আপনি ম্যাজিশিয়ানের মতন তাকে ধরে মাখন লাগালেন—আজকাল টোস্টার থেকে বেরিয়ে পাউরুটির স্লাইসরা আপনার সামনে নিশ্চয়ই সাদা, নিশ্চেষ্ট শুয়ে থাকে। এখন সত্যিই জীবনে কোনও উন্মাদনা নেই, নীল।

চাঁদে নামার আগে কী টেনশন। যেমন আসার কথা, ল্যান্ডমার্কগুলি তেমন আসছে না। হয়তো কমপিউটারে প্রোগ্রামিং-এর ভুল। ওঁরা ল্যান্ড করবেন, না করবেন না ? শেষ মুহূর্তে ভেবেচিন্তে ঝুঁকি নিয়েছে কন্ট্রোল, যা হওয়ার হবে, ল্যান্ড করো। পাঁচশো ফুট নীচে চাঁদের মাটি। এই তো চাঁদ একেবারে কাছে—উঁচুনীচুগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট। নীলের কপালে তেরছা হলুদ আলো। আস্তে করে বললেন, মিশন সাকসেসফুল।

অনেক ধুলো জুতোয়, মডিউলের মেঝেতে, ভিজে ছাই-এর সোঁদা গন্ধ—এই কি চাঁদের ঘ্রাণ ? আকাশযান থেকে মডিউলটি বিযুক্ত হয়ে চাঁদে নামতেই এই সব অলীক গন্ধ ঘিরে ধরেছে নভচরদের। নীল টলমল পায়ে হেঁটে এগোচ্ছেন, স্টেটস অফ আমেরিকার পতাকা টাঙাবেন সেই বিজন আকাশ-

দ্বীপের মাটিতে।

কেন জানি না, আজকাল মাঝে মাঝেই আমার সেই নিঃসঙ্গ পতাকাটির কথা মনে পড়ে নীল, পঁচিশ বছর হয়ে গেল, পৃথিবীর কোনও এক দর্জির মেশিনে সেলাই হওয়া ফ্ল্যাগটি এক অচেনা মায়াবী বায়ুমণ্ডলের হাতের দোলে ধীরে ধীয়ে দুলছে। তাকে আর ফিরে দেখতে যায়নি কোনও মানুষ, কোনও অভিযাত্রী। কেউ ফিরিয়েও আনেনি তাকে।

গত রবিবার আমাদের বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল। লম্বা ড্রাইভ নয়, এখান থেকে আঠেরো মাইল দূরে হলডেন বলে ছোট একটি গ্রাম আছে, সেখানে সতেরোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দের গির্জা আছে একটি। কখনও গেছেন ? আপনি তো কোথাও যান না। দাঁড়ান, এক রবিবার সকালে যাব। ফিরবো লাঞ্চ টাইমের পর। ইংলিশ পাব্-এ কখনও দুপুরের খাওয়া খেয়েছেন ?

খাইনি। তবে যাওয়া হয়নি শেষ পর্যন্ত। আগের দিন রাতে বুবলির জ্বর হল, কানে ইনফেকশন, কাশি। শমিত আর মিলুর যাওয়ার আছে শমিতের এক সহকর্মী পল-এর বাড়ি। ওদের প্রোগ্রামটা হঠাৎই ঠিক হয়েছিল, আমার প্ল্যানটা আমি খুব সংকোচে শুক্রবারেই ওদের জানিয়ে দিয়েছিলাম। তবু রবিবার সকালে শমিত বাঁকাভাবে বলেছিল, মার অ্যাপয়েনমেণ্টটা বেশি জরুরি। আফটার অল, এই বয়সের বন্ধুত্ব। আমরাই না হয় পলকে ফোন করে…।

খাট থেকে বুবলি করুণ মিনতি ভরা চোখে লোলা নদীর ধারের সেই উইলো গাছটার মতন আমার দিকে তাকিয়েছিল।

আমার যাওয়া হয়নি। আটটার সময়, বেরনোর আধঘণ্টা আগে নীলকে ফোন করে দিলাম।

কেউ জানে না, নীল আমাকে একটা জিনিস দিয়েছেন। একটা ছবি। সেটা আমি আমার সুটকেসের একেবারে নীচে রেখে নরম একটা ধনেখালি শাড়ি তার ওপর বিছিয়ে দিয়েছি। এই বাড়িতে আমার কোনও নিজস্ব জায়গা নেই। একটি ড্রয়ার বা আলমারির তাকও। অ্যাপোলো আট যখন চাঁদের কক্ষপথে ঢুকেছিল, সেই সময় জিম লণ্ডেলের তোলা চাঁদের আকাশে পৃথিবীর উদয়। সারা বিশ্বজগৎ কালো, অন্ধকারে। একমাত্র রঙের বৃত্ত এই নিঃসঙ্গ গ্রহটি। আমাদেরই পৃথিবী। যে মুহূর্তে ওই ফটোটি তোলা হয়, তখন আমি কী করছিলাম ? বেহালার বাড়িতেই হয়তো বিছানার চাদর টান টান করে পাতছিলাম শোবার ঘরের খাটে, বিকেলে গা ধুয়ে চুল বেঁধে সিঁথেয় আলতো করে সিঁদুর দিচ্ছিলাম হয়তো। আমাদের বাড়ির পেছনে সজনে গাছটায় একটা কোকিল ডাকছিল, হৃদয় উজাড় করে দিয়ে। ওই ফটোর মধ্যে অন্তরীণ হয়ে আছে আমার বেঁচে থাকার একপল, একটা দিনের কয়েক লহমা। খুব ভালবাসত আমায় সুপ্রকাশ, নতুন বিয়ের পরের সেই দিন-গুলোতে। সেই দিক দিয়ে দেখলে, ভালবাসার মধ্যে বাঁচার আমার জীবৎ-কালের এ এক অমূল্য অদৃশ্য ছবি।

আজ যেমন টুক করে এসে ঘাস ছাঁটার কাঁচিটা নিয়ে গেলেন, একদিন দুপুরে তেমনই টুক করে এসে ছবিটা দিয়ে গেছিলেন নীল। হ্যাঁ, সেদিন দুধ চিনি ছাড়া চা খেয়েছিলেন এককাপ।

বলেছিলেন, যখনই সূক্ষ্ম কোনও কষ্ট হয়, মনে হয় হেরে গেলাম, বা কিছু চেয়েছিলাম, বঞ্চিত হয়েছি, তখনই আমি ওই পৃথিবীর ছবিটার দিকে তাকাই। একখানি দূরত্ব থেকে যখন দেখি, মনে হয় কী অকিঞ্চিৎকর আমাদের ব্যর্থতাগুলি! আমাদের হাহাকার দৌড়ঝাঁপ, ছটফটানি, সব কিছু স্থির অথচ অদৃশ্য হয়ে জমে আছে ওখানে। মনটা তখন আপনা থেকেই শান্ত হয়ে আসে। এ হ'ল নিজে থেকে নিজেকে ছিঁড়ে আলাদা করে দেখা। এইভাবে নিজেকে নিয়ে দূরে চলে যেতে হয় কখনও কখনও সীমা। বাঁচা সহজ হয় তাহলে।

রাতে ঘুমোবার আগে মাঝে মাঝেই আমি ওই ছবিটা দেখি আজকাল। ঘুমে তলিয়ে যাওয়া নিঃশ্বাসে বুবলির ছোট্ট বুক ওঠে নামে। সুপ্রকাশের চিঠি আর আসবে না বুঝতে পারি। শমিতের রাগ, রুক্ষতা এও বুঝি নিজের মতন করে। যেমন বুঝি মিলুর চাপা অসহায়তা, ছটফটানি। সেদিন রবিবার নীলকে ফোন করার পর শাড়িতে জড়ানো ফটোটা নিয়ে টয়লেটে গেছিলাম। কলেজের দিনগুলোর মতো ফ্লাশের শব্দ দিয়ে কান্নার আওয়াজ ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। নীলের মৃদু গলা কানে আসছিল, আমি কিছু মনে করিনি সীমা। তাছাড়া আবও কত রবিবার আসবে যাবে, অনেক রবিবার।

আট আঙুলের আটা ধুয়ে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে ঘাস ছাঁটার মৃদু, একটানা শব্দ শুনছি। নীল প্রাণপণে কাজ করছেন লনে। ভূপতিত পাতা ও ঘাসেদের নিঃশব্দ চিৎকারে ভরে উঠছে হলুদ দিনটি। বিকেলে নীল কাঁচিটা ফেরাতে আসবেন। আমি ওইভাবেই দরজা থেকে হাত পেতে নেব ভোঁতা অস্ত্রটাকে। বলব, ধন্যবাদ। এরপরও রবিবার আসবে, আরও আরও রবিবার।

নীল, আমি অপেক্ষা করব।

ট্রেনটা স্টেশনে এসে ঢুকতেই তাকে ঘিরে ধরল শব্দের ভাপ, অমলেট-পাওভাজির গন্ধ ও রোদ-চাপা এক বিষণ্ণ বিকেলের আলো। বাইরে থেকে কেবল দেখা যায় এয়ারকন্ডিশন্‌ড্‌ কামরার কালো কাচই, মানুষের মুখ ঠাহর করা যায় না। না, এগোবার সিদ্ধান্ত নিল দিবাকর পাটিল। তারপর কুলিরা যেখানে কামরার দরজাটা পড়বে বলেছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে গেল।

রোদ-চশমা পরে নিয়েছিল শ্যামলী। তার সঙ্গে একটাই বড় সুটকেস। তবে চাকা দেওয়া। সেটাকে টেনে আনতে আনতে ভেতর থেকে দিবাকর পাটিলও তার চিন্তিত মুখাবয়ব দেখতে পায়নি। সামনের কুপের গুজরাতি পরিবারটি খাবার জলের কুঁজো ভেঙে ফেলায করিডরে জল। সেই জলের ওপর দিয়েই সুটকেসটিকে হাঁটিয়ে এনে কামরার দরজা খুলে বাইরে এল শ্যামলী। ওর পায়ে কোলাপুরি চপ্পল। ভিজে। ততক্ষণে দিবাকর পাটিল ভেতরে ঢুকে শ্যামলীর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছে সুটকেসটা। দিবাকরের পেছনে একটি লাজুক যুবক—ফর্সা, বেঁটে, দুই গালে ব্রনর দাগ। একে তো চেনে না শ্যামলী।

ও আমাদের সম্পৎ-এর ভাইপো। এখানে ব্যাঙ্ক-ক্লার্ক। ওকেও নিয়ে এলাম।

ছেলেটা হেঁট হয়ে শ্যামলীকে প্রণাম করতে এল। কিন্তু পা ছুঁলো না—ছুঁলো প্ল্যাটফর্মের মেঝে।

থাক থাক, মিছিমিছি ওকে আনতে গেলেন কেন? দুজনেরই সময় নষ্ট।

চল্লিশ ফুট ডায়ামিটারের দুই কুয়ো এবং খানপাঁচেক ডিজেল পাম্পের মালিক দিবাকর পাটিল এ বছর শুকনো লঙ্কা, বাজরা ও আখের ব্যবসায় লাখের ওপর লাভ করেছে। কিন্তু আজও রাজারাম পুরুষোত্তম যোশী বা তাঁর পরিবারের সামনে দাঁড়ালে দিবাকরের জিভ জড়িয়ে আসে, চোখ নেমে যায় মাটির দিকে এবং অকারণে হাত কচলাতে থাকে সে। ওর কাঁচুমাচু মুখ দেখে শ্যামলী বুঝল, দিবাকর ছেলেটিকে ডেকে এনেছে, পাছে ইংরেজি বলতে হয়, এই ভয়ে। সাত বছর পরে এই আসা শ্যামলীর। বিয়ের পর থেকে প্রতিদিন অল্প অল্প করে শব্দনিচয় কুড়িয়েবাড়িয়ে এক কাজ-চালানো ভাষা অবশ্য রপ্ত করেছে সে। তবে ওদেশে তো বাড়িতে বলার সুযোগই হয় না। অন্তত সন্দীপ তার সঙ্গে মরাঠি বলেনি কোনওদিন—ইংরেজি বলেছে। তাদের জোড়াতালি দেওয়া সম্পর্কে ইংরেজিই বেশ, কাজ ফুরোবার পর শুঁকলে মণিবন্ধে লৌকিকতার ঘ্রাণটুকুও থাকে না।

আজকে গাড়ি বিফোর টাইম। সঙ্গের ছেলেটি, মানে সম্পতের ভাইপো

বলে উঠল।

এ গাড়ি কখনও লেট হয় না। ওদিকের পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ট্রেন লাইনের দিকে তাকিয়ে আছে দিবাকর।

সে এখন একমনে ভাবছে তাদের গন্তব্যস্থল, কীভাবে যাবে সেই কথা। বিকেলের রেলওয়ে স্টেশনে একটি আলাদারকম মন-কেমন-করা আছে, শ্যামলী ভাবল। ওভারব্রিজের ও প্রান্তে ঝিরঝিরিয়ে কাঁপতে থাকা অশ্বত্থ গাছটি, ব্রিজের ওপর মানুষের যাওয়া-আসা, ব্রেকভ্যান থেকে মাল নামানোর শোরগোল। অমলনের গাড়ি বদলের তীর্থযাত্রীরা মাটিতে মোটা সুতি চাদর বিছিয়ে আরামের জোগাড় করছে, এ ছবি শ্যামলী বেশ কয়েকবার দেখেছে। নানারকম মন নিয়ে কতবার সে এই দৃশ্যপটটিকে গ্রহণ করেছে। আজও তার বড় ভাল লাগল এই বিকেলটি। দিন দশেক আগে এই শহরে দশহরার ভাসান নিয়ে বড়সড় দাঙ্গা হয়ে গেছে। গুলি, রক্তপাত, মানুষের মৃত্যু, দোকানপাট জ্বালানো। কারফিউ উঠে এই সবে শান্ত হয়ে পা মেলে বসেছে শহর-গঞ্জ। কলকাতা থেকেই রাজারামকে আসার দিনক্ষণ জানিয়ে তার করেছিল শ্যামলী। রাজারামের বয়স আশি পেরোল এই গ্রীষ্মে। এতদিন নিজেই নিতে স্টেশনে এসেছেন, গ্রাম থেকে গাড়ি বদলে, এখন আর শরীরে ও সাহসে কুলোয় না। রোদের দিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে, হাঁফ ধরে ওভারব্রিজে চড়তে, সেই জন্য শ্যামলীর পাঠানো তারের গোলাপি কাগজটি নিয়ে ভাবতে ভাবতে তিনি গণপতি মন্দিরের রাস্তায় যাচ্ছিলেন, পথে দিবাকরের সঙ্গে দেখা। দিবাকর পাটিল বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে জানিয়েছে, স্টেশনে সেই যাবে। বহিনী এতদিন পরে আসছে, পথঘাট, বাসরুট, ট্রেনরুট, সে সব কী আর মনে আছে? আমিই যাব, নানা। আপনি একদম ভাববেন না। সম্পতের ভাইপোকে তুলে নেব শিবাজি চক থেকে। ছোকরা ফটাফট ইংরেজি বলে।

সুরাত প্যাসেঞ্জার' বড় লেট করে যে। না হলে ওটাতেই আসতে সুবিধে ছিল। বউকে স্টেশনে বসে থাকতে হবে না-হক আড়াই ঘণ্টা। না না, কলকাতা হয়ে আসছে, বড় কষ্ট হবে, তুমি স্টেশন থেকে বেরিয়ে বহড়ুর জিপ নিয়ে নিও। না হয় আড়াই শোই নেবে, নিক—আমি কালই টাকা তুলে দেব তোমায়।

টাকার কথা থাক, আন্না। আমি পরে এসে নেবখন সুবিধেমতন। মাটির দিকে তাকিয়ে বলেছে দিবাকর। ওইটুকুই তার সাহস।

শ্যামলীর সুটকেস হাতে এবড়োখেবড়ো পায়ে এগিয়ে চলেছে দিবাকর—ভুঁড়ি, পেশোয়াসদৃশ পাকা গোঁফ। ওভারব্রিজের নিচে একচিলতে দোকানে দাঁড়িয়ে অনেক দুধ ও চিনি দেওয়া চা খেল ওরা। বিদেশে থেকে দুধ চিনি দিয়ে চা খাওয়ার স্বভাবটাই চলে গেছে। কলকাতায় অবশ্য ও আন্দাজমতন দুধ মিশিয়েই নেয়, তবে এখানকার মতন মোষের দুধের চল নেই কলকাতায়।

কড়াই থেকে জিলিপি তুলে খবর কাগজের ওপর সাজাচ্ছে দোকানদার।

জিলিপি খাবেন ভাবি, গরম? সম্পতের ভাইপো শুধোয়।

জিলিপির দিকে শ্যামলীর নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকাকে লুব্ধতা বলে ভুল করতে পারে কেউ কেউ। ঘোলা, জ্বলে যাওয়া তেল, গাঢ় ও অস্বাভাবিক কমলা জিলিপি। কাগজের ওপর লেপটে আছে কারও মাথার চুল। এ জিনিস খাওয়ার প্রবৃত্তি বা সাহস, কোনোটাই নেই আজ শ্যামলীর। পনেরো বছর আগে নতুন বিয়ের পর সে এবং সন্দীপ লোভীর মতন গরম জিলিপি ও আলু-বড়া শালপাতার ঠোঙায় ধরে বাসডিপো অভিমুখে চলে গেছিল অটোরিকশা চেপে।

দাদা আসতে পারল না? এলে ভাল হত। আন্নার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না আজকাল।

সন্দীপ বয়সে ছোট। দিবাকর তবু তাকে দাদা বলেই ডাকে, রাজারামকে আন্না ডাকার সুবাদে।

দাদার অফিসে বড্ড কাজের চাপ। এখন ছুটি পাওয়া শক্ত। আমি তো এসেছি। আন্নাকে ভাল ডাক্তার দেখাব দরকার পড়লে।

না না, তেমন কিছু কি আর? বেফাঁস বলে সামলায় দিবাকর। আসলে মনটাই ভাল নেই তেমন। মনোহর ডাক্তার মারা গেলেন গত বছর। তার আগের দেওয়ালিতে বসন্ত গোখলে। আন্না একেবারে একা পড়ে গেছেন।

রাজারাম তাঁর দীর্ঘ জীবনে কোনওদিন অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাননি। বড় জোর এক ডোজ হোমিওপ্যাথি বা আয়ুর্বেদিক, তাও মনোহর ডাক্তার লিখে দেবেন। এল এল এম পাস করে বিরনগাঁওতেই আজীবন প্র্যাকটিস করেছেন মনোহর। অ্যালোপ্যাথির সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি ওষুধও লেখেন। গাঁ-গঞ্জের এটাই দস্তুর।

বসন্ত, মনোহর এরা দুজনেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন রাজারামের। মনোহর বছর চারেকের বড়, বসন্ত ছোট। বসন্তবুয়ার কী হয়েছিল? শ্যামলী জিজ্ঞেস করল।

ছেলে-ছেলের বউ রান্নাঘর আলাদা করে দিয়েছিল অনেকদিন। বুড়ো-বুড়ি নিজেই রেঁধে খেতেন। বুড়ির জন্য চা করতে বসন্তবুয়া রান্নাঘরে গেছিলেন ভোরবেলা, গায়ে আগুন লেগে···

বহড়ুর জিপে আরও দুজন যাত্রী আগেভাগেই বসেছিল। একজন বুড়ো, দেখলে মনে হয় শ্রীমন্ত চাষী, সাদা ঝকঝকে খদ্দরের পাঞ্জাবি, পাজামা, গান্ধীটুপি—পালধি যাবে। আর একটি বউ, কাছা দিয়ে পুনেরি শাড়ি পরা, আধঘোমটা মাথায়, কোলে একটি ছোট মেয়ে—সে যাবে বিরনগাঁও ছাড়িয়ে এরেন্ডোল। দিবাকরদের দেখে ড্রাইভার হাতে চাঁদ পেল, অন্য প্যাসেঞ্জারের জন্য দাঁড়াতে হবে না। সম্পতের ভাইপো মিনমিন করে বলল, আমি আবার মাঝপথেই—মানে আজ একটু রাজবাড়ায় কাজ···

ঠিক আছে, শ্যামলী হেসে বলে, তুমি মাঝপথেই নেমে যেও এখন। দিবাকরকাকা তো আছেই সঙ্গে।

গত সাত বছরে খান্দেশ বদলেছে। ধনধান্যে ভরেছে। হাইওয়ের দুধারে

যেখানে খালি টাঁড় জমি ছিল সেখানে উঠেছে কারখানা, হোটেল, ওয়ার্কশপ। কে বলবে, এই কালো মাটির দেশে বৃষ্টি নেই? এক ইঞ্চি জমি কেউ খালি ছাড়েনি কোথাও। গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে উঠছে জোয়ার, বাজরা, আখ, মাঝে-মাঝেই আল বরাবর বাবলার ঝাড়—বাবলা এখন উন্নত পশুখাদ্য। রাস্তা ছুটেছে চওড়া একটি ফিতের মতন, বিশাল, পরিচ্ছন্ন। এক পাশে জলের পাইপওয়ে গেছে ভুসাবল থেকে সোজা জলগাঁও হয়ে রাজবাড়া পর্যন্ত। এসব কিছুই ছিল না যখন সাত বছর আগে শ্যামলী শেষবার এসেছিল। সেবার সন্দীপও ছিল সঙ্গে, আর আট বছরের রাজর্ষি। রাজবাড়ার পরে রাস্তা নিচু হয়ে নেমে গেছে পালধির দিকে। এ রাস্তা হাইওয়ে নয়। পঞ্চায়েতের। মনোযোগ, মেরামতের অভাবে ফাটাচটা। আঁকাবাঁকা। যেখানে বসতি ঘন, সেখানে বাস-ট্রাককেও সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। কোথাও শুয়োর এসে ছিটকে পড়বে, কোথাও শিশু টলমল করতে করতে হঠাৎ রাস্তা পেরোবে।

সন্ধের আভা ছড়িয়ে পড়ছে সারা আকাশে। একধারে সদ্য বেড়ে ওঠা ইউক্যালিপ্টাস বন দুলছে। অন্য ধারে গ্রাম-সীমানার উঁচুনিচু গোচারণ-ভূমি। এখন কি ভোর—হ্যাঁ, এখন সকাল ক্যালিফোর্নিয়ায়। সন্দীপ তার আটত্রিশতলার অ্যাপার্টমেন্টে ঘুমিয়ে আছে, এখনও ওঠেনি। উঠবে আটটায়, যখন তার সাইড টেবিলের ঘড়ি কোকিলস্বরে সময় জানাবে। চোখ খুলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মুখ না ধুয়েই সোজা রান্নাঘরে যাবে সন্দীপ। কালো চা খাওয়ার পর তার ধোঁওয়াটে চৈতন্যের জট খুলবে। তারপর দ্রুত রেডি হয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঠিক চল্লিশ মিনিটের মাথায় সে গাড়ি স্টার্ট করবে, অফিসের জন্য। ফিরবে রাত নটার পর।

শ্যামলী আসার আগের দিন সন্দীপের ফোন পেয়েছিল।

—তাহ'লে সত্যিই যাচ্ছ?

—কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?

—তুমি একা গেলে বাবার কষ্ট কি কমবে?

—যদি না কমে, তবে কি তুমি আসবে সন্দীপ?

—তুমি জানো, আমার যাওয়া অসম্ভব! সন্দীপ তীক্ষ্ণ হয়েছে।

—জানি তো। শ্যামলী একেবারে শান্ত, তাহ'লে আর বাবার মন খারাপ নিয়ে ভাবছ কেন মিছিমিছি?

—বাট হোয়াই আর ইউ গোয়িং শ্যামলী? জোরটা ছিল 'ইউ'-এর ওপর।

—হাটে হাঁড়ি ভাঙবে কি করে আমি না গেলে? বাবাকে তাঁর গুণধর ছেলের কীর্তিকাহিনী বলতে হবে না? তুমি কী কী করো, কোথায় থাকো, কার সঙ্গে, সব—

—এই, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছ! সন্দীপ লঘু করতে চেয়েছিল আবহাওয়া।

—মোটেই না। যা সত্যি সেটুকু বলব না!

—তুমি নিষ্ঠুর। বাবার বয়স কত জান?

—আমি জানি না। তোমার বাবা—তোমার জানার কথা।

—বেশ। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সন্দীপ বলেছিল, যা ভাল বোঝ করো। তবে একটা কথা ওঁকে আমি চিঠিতে লিখেছিলাম কয়েক মাস আগে, এখনও কোনো উত্তর দেননি বাবা। ওই ভাঙা বাড়িটা বিক্রি করে যে কোনো শহরে, মেট্রোপলিসে উনি বাড়ি ভাড়া নিতে পারেন। আমি রি-ইমবার্স করে দেব। প্রতি মাসে ওই বাড়ির পেছনে নানা খরচা। কখনো খোড়ো ছাত ঢালাই করছেন, এই সেদিন ওয়্যারিং খুলে লাগালেন, নর্দমা রিপেয়ার—একে তো অত টাকা ব্লক্‌ড্‌ হয়ে আছে, বেচে দিলে সেগুলো ইন্‌ভেস্ট করা যায়—

—তোমার কত টাকা দরকার, সন্দীপ ?

—আবার সেই বাঁকা বাঁকা কথা ! তুমি ইন্‌সাফারেব্‌ল্‌ একটি। টাকা বাবার অ্যাকাউন্টেই থাকবে। কিন্তু নিজের বলেই যে বুড়ো বয়সে টাকাগুলো নষ্ট করার স্বাধীনতা ওঁকে দেওয়া যায়, তা তো নয় !

—টাকার দরকার হ'লে বলো। চেক লিখে দেবো'খন। বলে শ্যামলী ফোন রেখে দিয়েছিল। আহত বাঘের মতন নিজের ক্ষতস্থান বেশ খানিকক্ষণ ধরে এবার চাটুক সন্দীপ। বলবে না কেন শ্যামলী, ও তো নিজে থেকে ফোন করেনি—করেছিল সন্দীপই। গায়ে পড়ে, যেচে নিয়েছে এই সব মন্তব্য। বিদেশে, প্রায় সামাজিক সম্পর্কবিহীন, কঠিন জীবনযাপনে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে শ্যামলী। সন্দীপের বান্ধবী এক নয়, একাধিক। যদিও লারাকে ও বিয়ে করবে, মোটামুটি ঠিক। অন্তত লারা বা সন্দীপের তরফ থেকে কোনো আইনগত বাধা আর নেই। লারার বয়স আটত্রিশ, দুই মেয়ের মা, চাকরি করে, সুন্দরী এবং বিবাহযোগ্যা। ওয়াশিংটনে পড়তে চলে যাচ্ছে রাজর্ষি এ বছরই। শ্যামলীর অ্যাপার্টমেন্টে হুহু করে বেড়াবে শীত, বসন্তের হাওয়া। শূন্যতাকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ জেনে ভরাট করার জন্য কাউকে জীবনে নিয়ে আসার কথা এখনও ভাবেনি শ্যামলী। তাই সে প্রায়ই ভাবে, ফিরে যাব। গ্রাজুয়েশনটা শেষ হোক রাজর্ষির। দেশে ফিরে যাব বাকি জীবনের জন্য। চল্লিশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একধরনের উদাস দার্শনিকতা রোদ-ছায়া ফেলে মানুষের গায়ে-মাথায়। তারই মায়ায় শ্যামলীও ভাবে, আর তো বছর কুড়ি ! একটা জীবন, কেটে এল বলে ! এবার অক্টোবরের গোড়ায় একদিন সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে বুকর‍্যাকে ধূসর পুরোনো পঞ্জিকার পাতা ওল্টাতে গিয়ে সে হঠাৎই বহু দূর থেকে ভেসে আসা এক ডাক শুনতে পেয়েছিল, পরিচিত কয়েকটি তিথির, একটি আধা-ঘুমন্ত গ্রামের, বয়েল গাড়ির বলিষ্ঠ চাকার পেছনে উড়তে থাকা ধূলির···তার চোখের সামনে আবছা থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল রাজারাম পুরুষোত্তম যোশীর শীর্ণ মুখের রেখাগুলি, একটি গেরিমাটিরঙা পুরোনো ইটের বাড়ি, একটি আঁকাবাঁকা গলি, পেট্রোম্যাক্স-জ্বলা গঞ্জ-বাজারের কোলাহল-রাঙানো সন্ধেবেলা, ময়লার গন্দায় মহানন্দে গড়াতে থাকা মা ও বাচ্চা শুয়োর···তার ঐশ্বর্য-দীনতা, ভালো-মন্দ সব কিছু দু হাতে জড়ো করে এক গ্রাম ডেকেছিল প্রায় অচেনা একটি মেয়েকে,

বিরনগাঁও…বিরনগাঁও ডেকেছিল !

সন্ধে জ্বালতে বসে রাজারাম ছোট্ট জানালাপথে মুখ বাড়িয়ে শ্যামলীকে বললেন, চা খেলে ? তোলা উনুনে পেতলের ডেকচিতে জল ফুটছে দেখ, চান করে নাও। তোমার জন্য বাজরার আটা এনে রেখেছি, দিবাকর ওর গণপৎপুরের ক্ষেত থেকে এনেছে, এমন মিষ্টি আটা তুমি কখনো খাওনি। আড়ায় দেখ বরণি (হাতলঅলা পেতলের পাত্র)-তে বেসন আছে। কাঁচা লংকা ভেজে নেব মুচমুচে করে…

আখের গুড় দেওয়া ঘন চা, কাপের প্রান্তে ধুলোর বলয়, অনেকদিন ব্যবহার হয়নি। রাজারাম চা খান না নিজে, তবে কাপ দুটিই ধুয়ে রেখেছিলেন। আজ চা ছাঁকতে গিয়ে শ্যামলী দেখছিল ওঁর শীর্ণ হাত দুটি কাঁপছে…

এখন রাজারাম গৃহদেবতাদের স্নান করাবেন, পুরনো বসন বদলিয়ে নতুন পট্টবস্ত্র পরাবেন, চন্দন লাগাবেন তুলসীর পাতায় করে, তারপর একে একে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সমস্ত দেব-দেবীদের আবাহন আরম্ভ হবে—ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই। কুসুমলতা বেঁচে থাকতেও এ কাজে কোনোদিন কাউকে ডাকেননি রাজারাম। আজও দুর্বল হাতে চন্দন নিজেই ঘষেন, কুয়ো থেকে জল তুলে দেবতার পুজোর বাসন ধুয়ে নেন। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে শ্যামলী ওঁর কুয়ো থেকে জল তোলা দেখছিল কিছুক্ষণ আগে, আধো অন্ধকারে।

সন্দীপ যোশী, আজ থেকে পনেরো বছর আগে এই বৃদ্ধ একশো বছরের পুরনো খাটা-পায়খানা নির্মমভাবে ভেঙে দেবার জন্য রাজমিস্ত্রী ডাকিয়েছিলেন। বিয়ের খরচের ওপর আরও আট হাজার টাকা, এই সময়ে ! বলে কুসুমলতা উৎকণ্ঠিত হলে, বলেছিলেন, আমাদের বউ যে কলকাতার মেয়ে, ওর কষ্ট হবে। যাবতীয় আত্মীয় বন্ধুর অনুরোধ ঠেলে ফেলে দিয়ে এই প্রাচীনপন্থী বিয়ের আসর তুলে নিয়ে গেছিলেন বিরনগাঁও থেকে মুম্বই, কেননা গাঁয়ের লোক অনাবশ্যক কৌতূহলে প্রশ্ন করে দুঃখ দেবে নতুন বউকে, কেন তোমার বাবা মা ভাইবোন কেউ এল না, মুম্বইতে এসব শুধোবার সময় নেই কারও, গাঁয়ের লোক গাড়িভাড়া খরচা করে দৌড়োবে না সেখানে। তুমি ভুলে গেছ সন্দীপ ! ভুলে গেছ দু দশক আগে স্টেট্‌স্‌-এ যাবার প্লেনের টিকিট সঞ্চয় ও ধারদেনায় টাকা জড়ো করে কে কিনে দিয়েছিল তোমাকে ! সেই রাজারামের জন্ম ওই চিলতে ঘুপচি ঘরে, যেখানে আজ রাখা হয় কাঠকয়লা, গুল্ ও কাঠ, পুরনো খবর কাগজ, পেতলের বাসন, তোলা উনুন—আজ থেকে আশি বছর আগে, টগবগ করে ফুটতে থাকা এক দুপুরে। আজ থেকে ষাট বছর আগে এ বাড়িতে বউ হয়ে এসেছিলেন নাগপুরের মেয়ে, তোমার মা কুসুমলতা। দেড়শো বছরের পুরোনো গির্জা দেখাতে আমাকে টেনেহিঁচড়ে একশো কিলোমিটার ড্রাইভ করে নিয়ে গেছিলে তুমি, আর তোমার প্রপিতামহ পুরুষোত্তম গঙ্গাধর যোশীর তৈরি এই বাড়ি সার কারখানার মালিক মদন

জৈন অথবা কেরোসিনের হোলসেলার মহাদেব আগরওয়ালার হাতে সালংকারা কন্যার মতন একশো কুড়ি বছরের রোদ-বৃষ্টির স্মৃতিসহ তুলে দিতে বুক কাঁপবে না তোমার? তাও তো এ বাড়ির খোড়ো ছাত তোমার ডলারে সারাই হয়নি, এ বাড়ির নর্দমায় যে-টাকা পড়েছে তাও রাজারামের স্বোপার্জিত। ধুলো-ওড়া বাঁকাচোরা গলির শেষে পাথরের স্ল্যাব বাঁধানো উঠোন, তারের জালি ঘেরা বারান্দা, এ তো কেবল এক দিনযাপনের খাঁচা নয়, এ ঘর ছেড়ে উৎখাত করবে এঁকে তুমি, বম্বে, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজে এক কামরার ফ্ল্যাটে! তুমি ভাড়া রি-ইমবার্স করতে চাও! ফরাসী পারফিউমের সুবাস দিয়ে মুছে ফেলতে চাইছ ওই কাঠের আগুনের ধোঁওয়ার গন্ধ! দেরি হয়নি! বড় দেরি হয়ে গেছে!

আগামী কাল নরক চতুর্দশী। পরশু দীপাবলী। তারপর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। এককালে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবে গমগম করত এই ছোট্ট বাড়িটি। কুসুমলতা দ্রুত চলে গেছেন, সন্দীপ এ দেশে থাকে না, পাড়ার গোনাগুন্তি ক'টি লোক এসে বাতাসা-নকুলদানা প্রসাদ নিয়ে যায় হাত পেতে, এইটুকুই। বন্ধু মনোহর নেই, বসন্ত নেই। রাজারামের খুড়তুতো বোন রত্নাবলী থাকেন দুই গ্রাম ছাড়িয়ে মালধিতে, তিনি আজ পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। এক বাড়িতে ছোটবেলায় দুজন বড় হয়েছেন হেসেখেলে, টানা সত্তর বছর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোঁটা দিয়ে রত্না আজ আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। নরক চতুর্দশীর ব্রাহ্মমুহূর্তে আগে পট্‌কাবাজির শব্দে কেঁপে উঠত এ বাড়ির চার দেয়াল, নরকাসুর বধ করার পর শ্রীকৃষ্ণের মত দেহে তেল-অগুরুর প্রলেপ লাগিয়ে স্নানে বসত এ বাড়ির পুরুষেরা, দরজার সামনে, আহারের থালার চারদিকে আলপনা, পিতৃপুরুষের জন্য চিনেলণ্ঠন জ্বলবে কার্তিক মাসভ'র। আজ এই বাড়িখানি নিশ্চুপ, শান্ত। তবু শ্যামলী আসবে বলে আলপনার রং কিনে এনেছেন রাজারাম। লণ্ঠন কিনেছেন, শাক ভাজা হবে বলে শাকের বিড়ে। প্রদীপের জন্য সলতে বানিয়েছেন নিজের হাতে, রেড়ির তেল এনেছেন।

খাওয়াদাওয়ার পর মেঝেতে পাতা বিছানায় রাজারাম শুয়ে পড়লে ওঁর মশারি ভালো করে গুঁজে দিয়ে পাশেই নিজের বিছানায় বসে শ্যামলী। মৃদু কণ্ঠে কথা বলছে দুজনে। আগেও শ্বশুর-বউ-এর মধ্যে ঘোমটা টানা অথবা আড়ালের বালাই কোনোদিন ছিল না, আজও এই শূন্য ঘরে নেই কোনো পর্দা।

দিবাকরের ভাইপো, সে কাজ করে বম্বের কোনো কাগজকলে। বৃহৎ মুম্বই-এর শহরতলি ডোম্বিবলিতে সেই দেখে দেবে ভাড়া একটি বাড়ি। ভালো বাড়ি, কলের জল, বিজলি। ছশো টাকা ভাড়া। ভাড়া তো খোকাই দেবে। সংক্রান্তির পরই উঠে যাবো ঠিক করেছি। দিবাকররা তো থাকতে চায় না এখানে, ওদের নিজেদের বসতবাড়ি আছে, চাষের জমি তারই লাগোয়া। এখানে ওরা হয়তো দোকানই করবে, অথবা গোদাম।

—আপনি কি কিছু···মানে দিবাকর কি কিছু অ্যাডভান্স দিয়েছে

আপনাকে, বাবা ? শ্যামলী খুব শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করেছে। সে যেন এমন এক নাটকের গলিপথে হাঁটছে, যার শেষ তার ঘনিষ্ঠভাবে চেনা।

—পঞ্চাশ হাজার ফিক্সড্ ডিপোজিট করেছি। বাকি টাকা বাড়ি ছাড়ার আগের দিন দেবে। ওর ধান উঠবে সেই সময়। আমার পেন্‌শনে তো কুলোয় না জানোই। মুম্বইতে, তা সে শহরতলিই হোক আর যাই হোক, দেড়গুণ খরচ। খোকাও এত করে বলল, আর এখন তো কুসুম নেই, মনোহর নেই, বসন্ত…

—বম্বেতে কে আছে আপনার ?

নিঃশব্দে একটু হাসেন রাজারাম। —কেউ থাকবে না, এই গৃহদেবতারা ছাড়া। তবে কি জানো, এই শেষ বয়সে নিজের বুদ্ধিতে চলতে বড় ভয় হয়। তোমরা আছ, পড়াশুনো করেছ কত বেশি, বড় বড় অফিস চালাচ্ছ—তোমরা যেমন চাও তেমনটি নাহলে যে জোর পাই না বুকে…

ভোর ভোর ঘুম ভেঙে যায় শ্যামলীর। কুয়োর তলদেশ থেকে হিম এসে ঢুকছে ঘরে। দেওয়ালের ফোকরে তারের জালি দিয়ে কুসুমের পুরনো শাড়ি টাঙানো। তাতে শীত আটকায় না। বাইরের কলতলায় মুন্সিপালিটির জল পড়তে লেগেছে তোড়ে। খাবার জলের বড় বড় কলসী ভরে তুলছেন রাজারাম। চানের জল ভরছেন ভেতরের ঘরের মস্ত পেতলের বাসনে। শ্যামলী উঠে বসতেই হাঁ হাঁ করে এলেন—আহা, ঘুমোও ঘুমোও। এতটা পথ এসেছ— এ তো আমার রোজকার কাজ। শ্যামলী অবশ্য শোয় না, জেদ করে বিছানায় বসে থাকে। জল ভরণ শেষ করে রাজারাম একটি শুকনো ধুতি পরে এসে বলেন, ভারী ভারী বাসন—দিবাকর বলেছে এগুলি না দিই যেন কাউকে, ওই নিয়ে যাবে। কিছু টাকা জুড়ে দেবে বাড়ির দামের সঙ্গে। তুমি যদি পারো কেবল ওই ঘড়াটা নিয়ে যাও। এ দেশেই রেখে দিও কারও কাছে। কুসুম জল আনত ওটাতে নতুন বিয়ের পর। আমি আর টেনে বেড়াতে পারি না এ বয়সে—অথচ ফেলে যেতে মায়া লাগে।

শ্যামলী বুঝতে পারে এই মুহূর্তে তার বুকের মধ্যে নড়াচড়া করছে ধাক্কা দিচ্ছে যে কষ্ট, তার কোনও নাম আজও দেওয়া হয়নি মানবসম্পর্কের ইতিহাসে। রাজারাম ও কুসুমলতার সঙ্গে কলকাতার অবিনাশ মিত্র রোডের শ্যামলী বসুর কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। যার আছে, সে এই সময় ঘুমিয়ে আছে অন্য গোলার্ধের নিশীথ রাতে, শঙ্খসাদা কোনো রমণীর বাহুবন্ধনে। ক্যাম্‌পোস আবাহিত তার ঘুমে চিড় ধরে না। কে এই বৃদ্ধ, শীর্ণ মুখ, কোটরে বসা চোখ—যিনি গত রাতে তাওয়ার ওপর হাত দিয়ে রুটি সমান করতে করতে বলছিলেন, কী মিষ্টি বাজরা, মুখে দিয়ে দেখো ! পনেরো বছর আগে, নিরাভরণ হাতে, পুরনো এক ধনেখালি শাড়িতে প্রথম এ বাড়িতে এলে, সকৌতুকে তাকে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে ছোট্ট পিঁড়েতে বসাতে চেয়েছিলেন রাজারাম—এটায় বসো, আমার মা রাঁধতেন এতে বসে, আমাদের গৃহিণীদের পরম্পরা।

উঁহু উঁহু, শ্যামলী মুখ টিপে কুসুমলতাকে দেখিয়েছিল, যতদিন মা আছেন, ততদিন নয়। কুসুম কত গর্ব করে ভাঁড়ার ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলেছিলেন, কী, হল তো! আগ বাড়িয়ে বলতে যাওয়া—বলি কার ছেলের বউ সেটা তো দেখবে, না কি!

শ্যামলী এসেছে বলে সন্ধের মুখে তাকে দেখতে এল লালটেন ধোবার বউ। সামনের একতলা বাড়িটা ওদের। রাস্তাটা বারোয়ারি, তবু তাতে খুঁটি টাঙিয়ে লালচাঁদ, যে সময়ের মারে লালটেন হয়ে গেছে, সারি সারি জামাকাপড় মেলবে, এবং ঝগড়াঝাঁটির নানা পরিস্থিতি তৈরি হবে আচমকা। দেওয়ালি বলে কদিন শান্তি। লালটেন-এর বউ শ্যামলীর হাতের একখানি মাত্র চুড়ির ডিজাইন ছুঁয়ে দেখে নিল আঙুল বুলিয়ে। লালটেন ধোবার পঙ্গু ছেলেটা সকাল থেকে ন্যাড়া ছ্যাতে বসে আছে। ফানুস ওড়াবে। গত বছর মামা-বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে শহর বাজারে তৈরি ফানুস দেখে এসেছে সে। বিরন-গাঁওতে সে জিনিস পাওয়া যায় না। জলগাঁওতে পাওয়া যায়, অগাধ দাম। কিন্তু কিনলে আর মজা কি রইল, ছেলে নিজেই বানাবে। রঙিন কাগজ কেনা হয়েছে, সরু বাঁশের কাঠি জোগাড় হয়েছে, তার্পিন তেল। সঙ্গীসাথী কেউ নেই, সারাদিন একা বসে কাগজ কাটছে, ছুরি দিয়ে কাঠি চাঁচছে, আর রাস্তায় যে যাচ্ছে, তাকেই আধো গলায় চেঁচিয়ে বলছে, কাকা, আজা, নানা, সন্ধেবেলা এসো, ফানুস উড়বে।

চৌদ্দটি প্রদীপ জ্বলে নিবু নিবু হয়ে এসেছে শ্যামলীদের ঘরে, উঠোনে, তুলসীমঞ্চে। পাড়ায় চলছে আতসবাজির মহড়া। দিবাকর পাটিল এসেছে, খাটিয়ায় শোয়া রাজারামের পায়ের দিকটায় বসে আস্তে আস্তে কথা বলছে, শ্যামলী ওর সিল্কের শাড়ি বদলে আটপৌরে শাড়ি পরে আসতে ভিতরে যাবে, সামনের বাড়ির ছাতে হাঁউমাঁউ কান্না। লালটেন বেধড়ক মারছে ছেলেটাকে, ছেলেটা গুঙিয়ে কাঁদছে। ওদের সামনে জমায়েত উৎসাহী জনতার ভিড় টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। হাসছে কেউ কেউ, কারও মুখে টিটকিরি, লে বাবা, এ হল শহরের মানুষ, কেউ এমনিই ঘরমুখো হাঁটছে।

লালটেন চিৎকার করছে, এতগুলো কাগজ, কাঠি, তেল, আকাশ থেকে পয়দা করেছে তোর মায়ে! টাকা জ্বালাচ্ছিস, সর্বনাশ করছিস আমার! তিনব তিনটে ফানুস পুড়ে ছাই হল, একটাও জ্বলল না!

যন্ত্র নয়, কারিগরী নয়, কী যে আশ্চর্য এক ভারসাম্য আছে বাতাস ও আগুনের। বাতাস পেলে বাঁশের ঝুড়িতে বসানো তেলের পিদিম জ্বলে, সেই আগুনের শিখা হাওয়াকে গরম করে ধীরে ধীরে ফুলে ওঠে পাতলা কাগজের রঙিন অবয়ব। তারপর ভেসে ভেসে ফানুস আকাশে ওঠে, যত সে দূরে যায়, কাগজের বলে আর মনে হয় না তাকে, আলোর আভা ফুটে বেরোতে থাকে এমনভাবে, যেন সে হলুদ, কমলা বা লালরঙা একখানি পূর্ণিমার চাঁদ! এমনটিই হওয়ার কথা, কিন্তু হাঁদা ছেলেটা পারেনি। হাওয়া এসে ক্ষেপিয়েছে আগুনকে, দাউ দাউ করে জ্বলে আগুন ছিঁড়ে নিয়েছে কাগজের কাঠামো,

নিমেষে কাগজ জবলে ছাই, ঝ্প করে নিচে এসে পড়েছে খাঁচা, পিদিম, ছিটকোনো তেল। বার বার তিনবার। ভিড় মুচকি হাসছে, অপমানিত বাপ এলোপাথাড়ি মারছে, আর ছেলেটার বুকফাটা চিৎকারে খান খান হয়ে যাচ্ছে গন্ধকের ধোঁওয়া মাখা গলির আলো-অন্ধকার।

দিবাকর কাকা!

দেওয়ালির পরের দিন সকালে পাড়াময় ছড়িয়ে আছে জবলে যাওয়া তুবড়ি, পোড়া ফুলঝুরি, মরা কালিপট্কা। ক্ষয়াটে হলুদ রোদ।

দিবাকর পাটিল শ্যামলীর সামনে, মাথা নিচু, মাটির দিকে চোখ। পঞ্চাশ হাজার টাকার একখানি চেক নরম একটি চাউনির মতো আলতোভাবে দিবাকরের পুরুষ হাতে রেখেছে শ্যামলী। দিবাকর কাকা, ঠিক আছে তো! বাবা এ বাড়িতেই থাকবেন। সংক্রান্তিতে আলু উঠলে আপনাকে আর দৌড়ঝাঁপ না করলেও চলবে। ডোম্বিবলির ওই বাড়ি, সে আপনি মানা করে দিন, কেমন? তাছাড়া আমরা তো আছিই—আমি, সন্দীপ দাদা, যখন দরকার এসে পড়ব।

কষ্টে মাথা নাড়ে দিবাকর। পুরোটা সে বোঝে না। ভাঙাচোরা ভাবে খানিকটা আন্দাজ করতে পারে এই জটিল প্রক্রিয়ার। একটা ভয় এবং ভাষাজ্ঞানের অভাব তার জিভটাকে টেনে ধরে। খানিক পরে গলা ঝেড়ে দিবাকর পাটিল জানতে চায়, বম্বে ব্যাংকের চেক, খালাস হতে কতদিন লাগবে? এক হফ্তার বেশি না তো?

ভারী ভারী সব পেতলের বাসন, বলতে গেলে ওগুলোর ধাক্কাই তাকে বেজেছে বেশি, ঘুরনোর মাকে বলে এসেছিল, সব বাসন একদিন বয়েল গাড়িতে উঠিয়ে গণপৎপুরের রসুইঘরে ঢেলে দেবে।

বুকের পাথর বুকে লুকিয়ে তবু দিবাকর ভারী সুটকেসটা নিয়ে শ্যামলীকে পোঁছোতে চলে। বিরনগাঁও-এর রেলস্টেশনে সাইকেলটি হাঁটিয়ে নিয়ে রাজারাম এসেছিলেন। শ্যামলীকে ট্রেনে তোলার সময় বেশি কথা, আবেগ কিছুই উপচে পড়েনি ওঁর চোখেমুখে। প্রণামের উত্তরে ওর পিঠে চিবুকে শীর্ণ খস্খসে আঙুল কটির স্পর্শ পেল শ্যামলী।

—তোমরা মাঝে মাঝে এলে বড় ভাল লাগে। সন্দীপকে রাজুকে নিয়ে এস এবার যখন আসবে। খোকাকে বলো আমি এখানেই রইলাম, ও যখন চায় আমি এখানেই থাকি। কুসুম ওই মাঝের ঘরে শেষবার আমায়…আসলে আমি আর কোথায় যাব বলো দেখি। এখানেই তো সব, সমস্ত স্মৃতি, এত মায়া-মমতা…

স্টেশন পিছনে রেখে ট্রেনটা দুধারের কালো মাটি ও কার্তিকের ভরন্ত পৃথিবীর বুক চিরে ছুটতে আরম্ভ করতেই শ্যামলী কপালে উড়ে এসে পড়া চুলগুলিকে সরিয়ে নেয়। হলুদ বিকেলটির দিকে তাকিয়ে মনের মধ্যে এক নিবিড় ভালো-লাগাকে খুঁজে পায় সে। শ্যামলী পেরেছে—নিঃশব্দে, বিনা রক্তপাতে, কয়েকটি অনিবার্যতার মুখ ঘুরিয়ে দিতে পেরেছে সে।

এইভাবে যদি সে না বলত, তবে কি রাজারাম পুরুষোত্তম মত বদলাতেন! যে সন্দীপ বিশেষ করে বলে দিয়েছে, বাবা, আপনি এখানেই থাকবেন! এই বাড়িতে আমাদের বিয়ের স্মৃতিও তো আছে, আমি বউ হয়ে এসেছিলাম এখানে প্রথম, এখান থেকে বম্বের শহরতলিতে পোষাবে না আপনার। দেখুন, আমাকে টাকা সঙ্গে দিয়েই পাঠিয়েছে সন্দীপ। দিবাকরকে তো টাকাটা ফিরিয়েই দেওয়া যায়, ও তো বলতে গেলে নিজেরই লোক…এইভাবে না বললে!

শ্যামলী অন্য কিছুই ছিঁড়ে-খুঁড়ে বার করেনি। তাদের বিচ্ছিন্ন বিবাহ, সন্দীপ-লারার ভবিষ্যৎ জীবন, রাজর্ষি চলে যাবে কলেজ হস্টেলে, একা হয়ে গেলে শ্যামলী তখন…কী দরকার! থাক না চাঁদের না দেখা মুখটির মতন পৃথিবীর ওই অন্য গোলার্ধ, ওখানকার দিনরাত, ওখানকার মানুষেরা। শ্যামলী আবার আসবে, সামনের কি তার পরের বছর, পেছনের চিলতে ঘরটার দেওয়ালে লম্বালম্বি চিড় ধরেছে একটা। ওটা সারাতে হবে তো?

ট্রেনের সিটে মাথা হেলিয়ে সুরাত প্যাসেঞ্জারের ঝক্ঝক্ শব্দের ভেতর তার শ্রান্ত দুই চোখের মধ্যে আর একটি উজ্জ্বল ছবি খুঁজে পায় শ্যামলী। নরক চতুর্দশীর রাতে হেরে ভূত হয়ে গেলেও, দীপাবলীতে জিতে গেছিল লাল্টেনের ওই পঙ্গু ছেলেটা। মার খাওয়া, ফোলা ঠোঁট, গায়ে-পিঠের ব্যথার মধ্যেই ফিসফিস করে একে-ওকে ধরে সে আবার ছড়িয়ে ছিল তার মন্ত্রগুপ্তি। ছেঁচড়ে ছাদে উঠে, কোনোমতে দাঁত-মুখ টিপে সে আবার ফানুস বানিয়ে ছেড়েছিল। ভীতু লাল্টেনের বউ শ্যামলীর হাত থেকে টাকা কটা নিয়ে দৌড়ে চলে গেছিল ছেলেকে লুকিয়ে দিতে, লাল্টেন দেখলে বেধড়ক মারবে তাকেও, ছেলেকেও।

ফানুসটা উড়েছিল। মরিয়ার মতন জীবনমরণের সীমানায় দাঁড়িয়ে যখন সে তারাজ্বলা অমাবস্যা আকাশের হাতছানি শোনে, তখন কী এক অদ্ভুত কৌশলে হাওয়া ও আগুনের সখ্য হয়ে যায়, হাওয়া দুলে দুলে হাসে, পেখমের মতন জ্বলে কোমল আগুন। তারপর কাগজের লাল মস্ত শরীরখানি হালকা হয়ে আকাশে উঠতে থাকে—উঠতেই থাকে। চশমার ওপর দিয়ে চোখ তুলে লাল্টেন ও সমবেত ভিড় প্রথমে সন্দেহভরা অবিশ্বাসে তার গতিপথে চেয়ে থাকে। শেষটায় যখন ফানুসের শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে তার আত্মার অলৌকিক আলো, এবং সেই আলো উড়তে থাকে বিনা তোয়াক্কায়—এক বিস্ময়, মুগ্ধ ভালোলাগার ভাপ উঠে আসে এঁদো গলির বুক থেকে ওপরে।

আকাশের বুকের মাঝখানটায় এসে ফানুসটা একেবারে হতচকিত হয়ে যায়। এত দূর কোনোদিন আসেনি তো আগে। নিচে রয়ে যায় গঞ্জের দীপাবলীর গুঞ্জন, মিট্মিটে চিনে লণ্ঠনগুলি, ছোট ছোট জ্যামিতিক জীবনযাপন। এক অপরূপ গাঢ় বেগুনি অন্ধকার ফানুসটাকে হাতে তুলে নিয়ে আদর করে, খেলে। ওই নরম আদরে কেবল ঘুম পায়, ঘুম পায় তার, বুঝি খানিকটা ঘুমিয়েও পড়েছিল, চমকে চোখ খুলে দেখে, সামনে তীব্র

লুব্ধক, কালপুরুষের কাছে এসে গেল কী সে ? হঠাৎই একটা আলোর ঢেউ তাকে লুফে নেয়, দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে পোড়ে ফানুস, আর ভেতর থেকে ছোট্ট একটা হাসি তাকে বলে, ফানুস, তোমার খেলা শেষ ! কাগজ পোড়া ছাই যদি আবার উড়তে উড়তে নিচে নামে, লাল্‌টেনের ছেলের ঘুমন্ত কপালটা মনে করে বড় কষ্ট হয় ফানুসের, সে হাওয়াকে বলে, ছাইগুলি তুমি রাখোই না হয়, নিচে পাঠিও না !

নধর-গম্ভীর একখানা মেঘ এসে ঝম্‌ঝম্‌ ক'রে বৃষ্টি দিয়ে গেল সুনাবেড়ার মালভূমি অঞ্চলে। এ মেঘের বাপ কে, নিম্নচাপ না সাইক্লোন, এ তল্লাটে বসে জানার পথ নেই। বিজলিই নেই, তায় টেলিভিশন। অন্ধকারে বুড়ো বাঘের মতন পথচলতি কারও হাতে ঘড় ঘড় করে ওঠে ট্রান্‌জিস্টর-রেডিও—তাও কালেভদ্রে—তারপর সে আওয়াজ মিলিয়ে যায়। খবর কাগজ পৌঁছোয় অনেক দেরিতে—স্থানীয় ভাষায় বাজে নিউজপ্রিন্টে ছাপা সেই সব সাতবাসি খবর ছুঁয়েও দেখতে ইচ্ছে করে না। সুধাময় নন্দ নিজের চারপাশে একখানা ঘেরাটোপ বানিয়ে নিয়েছে বেশ। রোগা, ঈষৎ কুঁজো, মোটা কাচের চশমায় সুধাময়ের আজকাল দূরের জিনিস কাছে চলে আসছে, কাছের জিনিস চলে যাচ্ছে দূরে। নতুন বাইফোকাল নিয়ে সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর মতন টলমল করে কিছুদিন ঘুরতে হয়েছিল তাকে। তা সে-ও তো অনেকদিন হয়ে গেল। কাচের অনুভূমিক জোড় সুধাময়ের দৃষ্টিপথকে দু-খণ্ড করে দিয়েছে। চট্‌ ক'রে সুধাময় কাউকে চিনতে চায় না, সদ্য আলাপ দিয়ে কেউ তাকে ছুঁতেও পারে না। ডানার জল ঝেড়ে ফেলা ওই মেঘখানার মতন, চুপচাপ, গম্ভীর, একরকম আছে।

এখন সুধাময় নন্দ চন্দনমহলের ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে। বৃষ্টির পর আশ্চর্য হলুদ এক আলোয় ভরে গেছে চরাচর। চারপাশের আগাছা ঝোপে দিনমানে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। এমন শান্ত বিকেলটি, যেন পা টিপে টিপে কাউকে না জানিয়ে সন্ধেয় মিশে যাবে।

বাঁ-আঁ-আঁ···হিরণ্যগুব্ধতার বাঁটে মুখ দেওয়ার আগে শম্বারু পহরিয়ার বাছুরটা ডেকে উঠল। এখান থেকে নীচের দৃশ্য দেখা যায়। এমন কিছু উঁচু নয় ঢিবিটা। তবু দূরে চোখে পড়ে কাঞ্চনসাগর—অজস্র লাল পদ্মফুলে ছওয়া জল। ঢিবির চারদিকে আগাছা, জংলি কুল, অর্জুন, বাব্‌লা ও পিয়াশালের মিশ্র জঙ্গল। একটু দূরে উত্তর-পূর্ব কোণে নতুন একঝাঁক ঝুপড়ি তৈরি করেছে আংকাটোলি ছেড়ে চলে আসা দলছুট কিছু পরিবার। তারপর বেড়া দিয়ে ঘেরা সুধাময়দের ক্যাম্প-অফিস। নতুন ঝুপড়িগুলোর ডান হাতি সরু একখানি পায়ে-চলা-পথ। সেই পথ ধরে কিছু দূর গেলে আংকাটোলির পুরনো বস্তি।

ওখানে এখন কেউ থাকে না। সবাই চলে গেছে। মাটির ঘরগুলি ছেড়ে নতুন বসতিতে উঠে যাবার আগে যতদূর সাধ্য উপড়ে নিয়ে গেছে বাঁশ, খড়, টালি, দরজা, জানালা। তারপর গত দু'বছরের রোদ-বৃষ্টিতে মরে-হেজে গেছে বসত বাড়িগুলি। কেবল লক্ষ্মণ সিং সামন্তর পাথর-কাঠে গড়া

অট্টালিকার টানা জাফরি দেওয়া শূনশান বারান্দা দেখা যায় এই ঢিবির ওপর থেকে।

আজ রাতে কি বৃষ্টি হবে? আসলে বৃষ্টির সময় তো এটা নয়। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। মনশুন এখনও রওনাই হয়নি, দূরে দক্ষিণ সমুদ্রে কোথাও মাতৃগর্ভে আড়ামোড়া ভাঙছে। বৃষ্টির ছিটেফোঁটা হলেই কাল সকালে কাজ করতে গড়িমসি করবে পিচারু বুড়োর দলবল। আজও গরম ছিল দুর্বিষহ। ঠুকঠাক কাজ হয়েছে।

চন্দনমহলের এই ঢিবিটা আশপাশের জন্য ঢিবিগুলোর তুলনায় বেশ উঁচু, বড়ও। বছর পনেরো আগে জঙ্ক নদীর ধারে দানি রাজার টিলা খুঁড়ে পাওয়া গেল কোশল স্থাপত্যের শিবমন্দির। পণ্ডিতমহলে অল্পস্বল্প ঢেউ। চন্দনমহলে খননের কাজ তার কিছু দিনের মধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। অল্প অল্প করে নিপুণযত্নে মাটির পরত তুলে বার করে আনা হয়েছে পোড়া ইট, কলসীর ভাঙা কানা, কুড়ি ফুট মতন গভীর এক চৌকো স্থাপত্য—এটাই হয়তো ছিল এই জনপদের রত্নভাণ্ডার। সুধাময় নন্দর ধারণা, এর ওপর দিকে ছিল ওয়াক্ টাওয়ার গোছের কিছু, কারণ একমাত্র এই উচ্চতা থেকেই পুরো উপত্যকাটা ভাল ক'রে দেখা যায়। তলায় ছিল গোপন গর্ভগৃহ—দেখাই যাচ্ছে; কে জানে আরও খুঁড়লে হয়তো কোনও দরজা পাওয়া যাবে, যেখান থেকে আরও, আরও নীচে যাবার সিঁড়ি নেমে গেছে।

জঙ্ক নদী এখান থেকে দেখা যায় না। কাঞ্চন সাগর আর নদীর মাঝামাঝি একটি গাঢ় সবুজ বনরেখা আছে। এই বনরেখার ওপারে দৃষ্টি গেলে হয়তো নদীটিকে পাওয়া যেত। পাথর আর পাথর তার বুক জুড়ে। তারই মধ্যে দিয়ে দুই ধারায় কলকল করে বয়ে যাচ্ছে জল।

সুনাবেড়া মালভূমির উঁচু কোনও দিক্শূন্যতা থেকে কবে এলোমেলো পায়ে নেমে এসেছিল নদীটি। অনেক অনেক শতাব্দী আগে। তারপর বহুদিন তার চালচলন নিয়ে কোনও কথা ওঠেনি। উনিশশো তেতাল্লিশের অজন্মায় এ অঞ্চলে মানুষ মরেছিল। ছেষট্টির দুর্ভিক্ষেও পথের ধারে মানুষ ও বলদের কঙ্কাল পড়ে থাকার কথা বেসরকারি সূত্রে জানা গেছে। খরা-অনাবৃষ্টির পৌনঃপুনিক ঝাপট খেয়ে হঠাৎ মানুষজনের খেয়াল হয়, আরে, এই স্বৈরিণী নদীটির কোমরে বেড়ি পরালে তো বেশ হয়! কেউ বলল, বাঁ ক্যানালে এগারোশো কুড়ি আর ডান ক্যানালে বাইশশো পাঁচ হেক্টর চাষ হ'তে পারে। শুরু হয়ে গেল সার্ভের তোড়জোড়। তখনও এই উপত্যকা অঞ্চলে মাটি খোঁড়া চলেছে। চৈত্র পরব, নুয়াখাই, করমা থেকে ছুটি নিয়ে কঙ্কালসর্বস্ব মজুররা মাটি কাটছে। প্রায় পাঁচ বর্গমাইল জোড়া এক অঞ্চলের তলা থেকে বেরিয়ে আসছে পোড়া ইঁট, সার সার বাড়ির ভিত, মন্দিরের গর্ভগৃহ, মরাহাজা কুয়ো···তখন পর্যন্ত সবাই ভেবেছিল, এমনই চলবে। তাড়া তো নেই কোনও। সুধাময়ের গুরু আফজল আসাদ বলতেন, হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর খনন চলেছিল বছরের পর বছর ধ'রে। আরে এ কি ছেলেখেলা!

এ তো পুকুর-কাটা নয় যে একশো মজুরে জুটিয়ে কোদাল চালিয়ে দিলাম! এ এক নিপুণ শিল্প। এর তুলি হ'ল কোদাল-গাঁইতি-শাবল, ভাস্কর হ'ল গাঁ-গঞ্জের অনপড় মজদুর। এদেরই মায়াস্পর্শে মাটির নীচ থেকে ঘুমন্ত অতীত পৃথিবী আস্তে আস্তে ধূলিবসন ত্যাগ ক'রে উঠে আসে।

সুনাবেড়া মালভূমির প্রত্ন পাথরগুলির বরাতে কিন্তু সময়ের টানাটানি লেখা ছিল। বাঁধের জমির সার্ভে শেষ হয়েছে কি হয়নি, আরম্ভ হয়ে গেল জমি অধিগ্রহণের বিপুল জটিল সব কারনামা। তারপর যা হয়, চারপাশের গাঁয়ের জমির দাম বাড়তে আরম্ভ করল হু-হু ক'রে। বাড়বেই, কারণ আঙকাটোলি, রমনাগুড়া, তেলিভাসা এইসব গ্রামের মানুষরা তো এবার ঘর ছাড়বে, নতুন জমির খোঁজে বেরোবে।

দাবানলের মতন খবরটা ছড়িয়ে গেছিল। জল আসছে, জল। জল আসছে। ওই নদীর ওপর বাঁধ তৈরি হবে। তার বিশাল জলাধারে ডুবে যাবে আশপাশের ছ'খানা গ্রাম। ডুবে যাবে ওই পদ্মফুলে ভরা কাঞ্চনসাগর, নালা পরবে যার বুক থেকে পদ্মফুল তুলে টোলির মুখে ওরা সাজাত এতদিন। ডুবে যাবে পুরনো বসতির কাছ ঘেঁষা পশুচারণভূমি। হ্যাঁ, এইসব মাটি খুঁড়ে বার করে আনা সভ্যতার স্তম্ভ, চিহ্নগুলিও ডুবে যাবে। গাঁয়ের মানুষরা অবশ্য তাই নিয়ে কেউ ব্যস্ত নয়। ওসব ওদের 'সোনা-খোঁজা' বাবু সুধাময়ের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার।

মাটির তলা থেকে ইঁট, মৃৎপাত্রের টুকরো, মূর্তি এই সবের সঙ্গে উঠেছে ছোট ছোট পাতলা সোনার চাকতি, হয়তো মুদ্রা, গোমেদ জাতীয় পাথর, পুঁতির টুকরো। সে সব সযত্নে তুলে এনে কাচের বোতলে তুলোর মধ্যে রাখা হয়েছে। বুড়ো পিচারু বিন্দা অনেক সাহায্য করেছে সুধাময়কে। পিচারুর বয়স নিশ্চয়ই সত্তর পেরিয়েছে, দেখায় আরও বুড়ো—কুঁজো, ভাল করে হাঁটতে পারে না, বসলে হাঁটুতে থুতনি লেগে যায়। এ অঞ্চলের মানুষজন তাকে ভালবাসে, মানে। তার সরু হাতখানি তুলে সিগন্যাল না দিলে কাজে জুটবে না কেউ। তাছাড়া পিচারু বসে একমনে দেখে ক্যাম্প অফিসে কীভাবে নানা রকমের স্পেসিমেন গ্রুপ করে সাজানো হয়, চুনের দাগ দিয়ে মাটিতে চৌকো সব ঘর কাটা হয়েছে। দেখতে দেখতেই কখনও পিচারুর ঘুম আসে। তার মুখের লালায় জানুসন্ধি ভিজে একাকার হয়। ইতিহাসের ব্যাপারগুলো যথাসাধ্য ওকে বুঝিয়ে বলেছে সুধাময়, তবু নিজের ঘোলাটে চিন্তায় বুড়ো জানে, ওই সব মাটি-টাটি খোঁড়া আসলে সোনার খোঁজ। শহর থেকে এসে ক্যানভাস জুতো আর শার্ট-পেন্টুলুন পরা সুধাময় সোনা খুঁজছে, শহরে নিয়ে যাবে বলে!

সেই কবে থেকে এই বন-পাহাড়কে জোঁকের মতন কামড়ে ধরে আছে অভাব, আন্ত্রিক ও মস্তিষ্ক-জ্বর। বর্ষার অনেক আগে থেকেই গাঁ ছেড়ে কাজের খোঁজে অন্যত্র যাওয়া শুরু হয়ে যায়। পাশে রায়গড় অঞ্চলে মজুরির রেট বেশি। এদিকে, ঘরের পাছদুয়ারে তখন মহাজনদের রমরমা। ভাদ্রে ছোট ধান

উঠবে, তা আবার ফুরাতে ফুরাতে তলানিতে ঠেকবে শীতের মুখেই, তারপর মাণ্ডিয়ার জাউ, মহল সেদ্ধ, আমের আঁধির আগাপাশতলা…

জল আসবে এই হল্লায় কতবছর হল মানুষ ঘর ছাড়তে আরম্ভ করেছে। প্রথমে আংকাটোলি ফাঁকা হয়ে গেল। ওটা তো একেবারে জলাধারের পেটের ভেতর। তারপর রমনাগুড়া, তেলিভাসা, চিলকলচুয়াঁর মানুষ আস্তে আস্তে জমি জঙ্গল নতুন রুজির সন্ধানে বেরোতে লেগেছে।

গোণ্ড্, ভুঞ্জিয়া, পহরিয়া—বেশির ভাগ এরাই থাকে আশপাশের এই ছ-সাতটা গাঁয়ে। একদা পহরিয়াদের মূলবৃত্তি ছিল কামারের, এখন তারা বাঁশের কাজ করে। ভুঞ্জিয়াদের মধ্যে আবার দুটো শ্রেণী 'চিন্দা'রা চাষী আর 'চক্‌রিয়া'রা পাহাড়ের ঢালে জুম চাষ করে অথবা শিকার। গোণ্ড্‌রা হ'ল গোয়ালা। এ অঞ্চলের মস্ত মস্ত গোরুর পালগুলি তাদেরই, হত্তিশগড়ি লরিয়া বুলি প্রথম প্রথম বুঝতে পারত না সুধাময়, এখন সে মোটামুটি লরিয়া বলতে পারে। মাঝে মাঝে দু-একটা হাল্কা রসিকতাও করে নেয় কুলিকামিনদের সঙ্গে, যদিও এমনিতে সভ্য সমাজে তার মুখ সব সময়েই বিষণ্ণ গম্ভীর।

সুধাময় অনেকক্ষণ হ'ল চন্দনমহলের ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে সাঁঝ ঢলা দেখছে। মেঘের নীচে মস্ত, রাঙা সূর্য। অন্ধকারে বিশ্বচরাচর ডুবে যাওয়ার একটু আগে সে সাবধানে হাতে টর্চ জ্বালিয়ে ক্যাম্পের দিকে যাবে। মণিরাম তার জন্য ধুঁধুলের তরকারি আর রুটি ক'রে রেখেছে। তাই খেয়ে যখন ক্যাম্পখাটে লুঙি আর গেঞ্জি পরে টান-টান হবে সুধাময়, রাতপাখির ডাকের সঙ্গে ঝলকে ঝলকে কুর্চিফুলের অগোছালো, মন-কেমন-করানো গন্ধ ছুটে এসে শ্রান্ত তাকে ঘুম পাড়াতে চাইবে। আংকাটোলির দিকে যাবার সরু পায়ে-চলা-পথটার দুধারে কত কুর্চিফুল ফুটেছে এবার—এরা বলে কুরেই। এত রকম মন-কেমন-করা—আঃ, সুধাময় আর পারে না!

এই অন্ধকার নেমে আসার আগের সময়টা বড় অদ্ভুত। এক অতীন্দ্রিয় পৃথিবী তার পাখা ছড়ায় অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে। সেই কবে বিজ্যের পায়ের কাছে নিষাদ আর কোশল রাজ্য জেগে উঠেছিল। নর্মদার জন্মভূমি অমরকণ্টক—উত্তরে সেই অমরকণ্টক থেকে দক্ষিণে মহানদীর উৎস, পশ্চিমে ওয়েন গঙ্গার উপত্যকা থেকে পূবে জঙ্কনদী, এর মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল মহাকোশল, কানিংহ্যামের এইরকম মত। অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপিতে এর নাম ছিল আর্টবিক প্রদেশ। মৌর্যরা কোনওদিন একে করায়ত্ত করতে পারেনি। আবার সাতবাহনদের নথিপত্রে এর নাম ছিল 'মহাবন'। নিষাদ রাজ্যের বিচিত্র রাজধানী 'গিরিপ্রস্থ' বলে যাকে বর্ণনা করা হয়েছে মহাভারতে, অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের হিসেব করলে তার অবস্থান আংকাটোলির ধারেকাছেই ছিল কোথাও। হিউয়েন সাং মহাকোশল পরিভ্রমণে এসেছিলেন—ওয়ারেন তাঁর বইতে লিখছেন—ছশো ত্রিশ থেকে ছশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একসময়, মহাকোশলের রাজধানী ছিল এই জঙ্কনদীর উপত্যকাতেই। হয়তো হিউয়েন সাং ওই কাঁচা, পায়ে-চলা-পথটা ধরে এখন যে আংকাটোলি নেই, তার

পাশ দিয়ে হেঁটে নদীর ধারে গিয়েছিলেন। ওঁকে দেখার জন্য পুরললনারা কি উঁকিঝুঁকি মারছিল জানালার পিছন থেকে, শিশুরা ওঁর অদ্ভুত পোশাকে আকৃষ্ট হয়ে ঘাসের ডাঁটা মুখে ভরে চিবোতে চিবোতে পিছন পিছন আসছিল! তখন এইসব গাছেদের প্রপিতামহরাও ছিল না। এইসব পাখিদের পূর্বজরা জন্মায়নি, অন্য গাছ, অন্য পাখি, অন্য প্রজাতির অনেককিছু, নদীটিও ছিল নিশ্চয়ই, এরা হিউয়েন সাং-কে দেখেছে।

সাঁঝ নামার মুখে, পাখিদের অবিশ্রান্ত ডাকাডাকি জুড়িয়ে এলে মাটির বুক থেকে এক রিমঝিম দুঃখের বাষ্প উঠে এসে সুধাময়কে ঘিরে ফেলে। বারোশো বছর আগে এখানে যারা ছিল, ওই ছোট ছোট সারি গাঁথা মাটির নীচেকার ঘরগুলিতে, যারা ওই ধসে যাওয়া পাথুরে কুয়োর চত্বরে বসে দিন যাপনের গল্পগাছা করত এমন সন্ধেবেলা, এই জনপদের অদৃশ্য নগরকোটাল, শিবমন্দিরের পূজারী, রত্নঘরের পাহারাদার, সন্ন্যাসী, রমণী ও শিশুরা তাদের স্তব্ধ কলকাকলি হিজিবিজি কাটাকুটি খেলে চরাচরে। জল আসছে; স্পিল্‌ওয়েের কাজ চলেছে আজকাল দিনরাত, তিনটে শিফটে। রাতে ফ্লাড-লাইটে কাজ চলে। বাঁধটা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে টইটুম্বুর হয়ে উঠতে চলেছে জলে। জলের সশস্ত্র পায়ের শব্দে মাটির শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে বিদ্যুৎ-সঙ্কেত। সব ডুবে যাবে, এই সব কিছু…মাটির নীচ থেকে তিল তিল করে বার করে আনা মহাকোশলের রাজধানী…ডুবে যাবে জলে। অনেক অনেকদিন পরে ঢাউস একটি কাল্‌বোস দুপুর রোদে ঘাই দিয়ে উঠলে কেউ জানতেই পারবে না, কোনও পাতাল-রমণীর হাসি তার কান্‌কোয় পিছলে গিয়েছিল কিনা! কিন্তু সে সব তো অনেকদিন পরের কথা। এই মুহূর্তে সুধাময়ের বুকের ওপর পাথরের মতন চেপে আছে চারদিকের মাঠ-বন তোলপাড় করে উঠে আসা এক ব্যথিত জিজ্ঞাসা…সুধাময় আমাদের বাঁচাবে তো? জল আসার আগে নিয়ে যাবে তো আমাদের?

দূর, কী করে বাঁচাবে! আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, তায় শঙ্করাকে! কী যে টাকার টানাটানি, সে সুধাময়ই জানে। হেডকোয়ার্টার থেকে সময়মতো টাকা আসে না, প্রায় প্রতিমাসেই মাইনে হয় পনেরো তারিখের পর। লেবার পেমেণ্ট নিয়ে বড় রকমের ঝামেলা হতে পারত, কিন্তু ইউনিয়ন নেই, বুড়ো পিচারু আছে, তাই একরকম চলে যায়। ভালরকম যারা খাটতে পারে, তারা প্রায় সকলেই ভিন্‌দেশে, ভিন্‌গাঁয়ে গেছে—রয়ে গেছে কেবল ঝড়তি-পড়তিরা। এখানে কাজের তাল ঢিমে, থেমে থেমে রয়ে রয়ে কোদাল শাবল চালানো, এই আধবুড়ো হাড়-জিরজিরেরা ভেবেচিন্তে কোনওমতে চালিয়ে দেয়। আটবছর আগে, নতুন এসে টাকার জন্য অনেকরকম দৌড়ঝাঁপ করেছিল সুধাময়। নিজেই মাথা খাটিয়ে রঙিন মলাটের প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করেছিল, গোলাপি-নীল-হলুদ—দিল্লী, বোম্বে, প্যারিসেও পাঠানো হয়েছিল, কেউ সাড়া দেয়নি। এতদিন পর সকলেই জেনে গেছে কেউ সাড়া দেবে না। মানুষের খিদে, শুকনো ডাঙার হাঁ-করা তেষ্টার জবাব মিলেছে—জল আসছে। জল

এসে একটি স্বচ্ছ অঙ্গবস্ত্রের মতো ঢেকে দেবে মাটির নীচেকার এই সব অস্ফুট ছটফটানি।

কয়েকদিন আগে সুধাময় আঙকাটোলির পুরনো, পরিত্যক্ত পাড়ায় গিয়েছিল। সেদিন বৃষ্টির কোনও লক্ষণ ছিল না, বিকেলের রোদে সাঙ্ঘাতিক ঝাঁজ। সেই আশ্চর্য লোকটার সঙ্গে সুধাময়ের আচমকাই দেখা হয়ে গেছিল—বয়সের আগেই বুড়িয়ে যাওয়া মুখ, কাঁচাপাকা চুল, কাঁধে একটা গামছা, নীল জামা, তার সঙ্গে ধুতি। গলায় একরাশ মাদুলি, শিকড়-বাকড়।

একেবারে ভাঙাচোরা ফাঁকা একটা বাড়ির মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসেছিল। কী করছিল ওখানে—দিনদুপুরে ভূত নাকি—চম্‌কে গিয়েছিল সুধাময়। সহদেব, নাম বলেছিল, লোকটা জাতিতে গোণ্ড্—আন্দাজে বোঝা উচিত ছিল, কারণ ওই শুনশান বাতিল পাড়ায় ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা কালো পাটকিলে অনেকগুলি গোরু।

এখানে কী করছ?

লরিয়া বুলিতে আনমনে সহদেব কথা বলছিল, কথার মধ্যেই যেন সজল, উদাস চোখ দুটি ওর আঙকাটোলির সারা শরীরে ঘুরছিল। অদ্ভুত কথা তো—এমন বাপের জন্মে কখনও শোনেনি সুধাময়। "মে, ইগাঁ ছোড় দেহঁ। হজুর ইহর মোর ঘর রহিস, ইহর মোর পুরখা বাপমান্‌কে ভিটামাটি রহিস্, নওয়াঁ গানে রহেবার্ মোর মন্ নি লাগথে—গাই গোরু মান্ ভি সব্ দিন সাঁঝ্ হোয়েলে জুনা থান্ লা ভাগ যাথে—ইহর্ ওমান্‌কে ভি তো গোঠ্ রহিস্—গোরুমান্‌কে সাঙ্গ্‌মে মেঁ ভি এহালা ঘিচা আথ—"

ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে নতুন গাঁয়ে জমি কিনে ঘরদোর করে বসত করেছে সহদেব অথচ এখানেই ওর বাপ-পিতেমোর ভিটে। কিন্তু নতুন গাঁয়ে গাই গোরুদের মন লাগে না একেবারে—বিকেল হতেই ওরা সহদেবকে টান্‌তে থাকে। আঙকাটোলির গা ঘেঁষে যে পশুচারণভূমি—ওইখানে চরতে চলে আসে সহদেবের গরুর পাল—তারাই একরকম হিঁচড়ে টেনে আনে সহদেবকে—এখানে এলে নিজের ছেড়ে যাওয়া বাড়িঘর ঘুরেফিরে দেখে ও। বাড়ির সামনে কাঁচা পথের ওপারে একটা মরা, শুকনো অজুর্নগাছ। ওই গাছের নীচে গ্রামদেবীর মূর্তি পুজো হ'ত। মহল্লার লোক যাওয়ার আগে গ্রামদেবীকে তুলে নিয়ে গেছে—তারপর আস্তে আস্তে গাছটাও মরে গেল শুকিয়ে—যেন এই শূন্য পাড়ায় ওর বাঁচার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছিল।

এই সোনা-খোঁজা বাবু, সহদেব হঠাৎই সুধাময়কে পিছন থেকে ডেকেছিল, এই যে আমাদের তড়িঘড়ি গাঁ ছেড়ে যেতে বলল সরকার-মালিক, পানি আসছে, পানি আসছে হল্লা হ'ল—কই, এখনও আসেনি তো! আমাদের আর ক'টা বছর নিজের ভিটেতে থাকতে দিত না হয়—কী হ'ত! এই প্রশ্নের জন্য সুধাময় তৈরি ছিল না, তবু মিছিমিছি সহদেবের গরুর পালের ক্ষুরের ধুলো থেকে নাক বাঁচাতে রুমাল চেপে ধরেছিল মুখে। কী বল্‌তে? টুকরো টুকরো হয়ে গেছে আঙকাটোলি। চাষের জমি একজায়গায়, বসতবাড়ি অন্যত্র। জমির

দামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেরে গেছে ক্ষতিপূরণের হাতে গোনা টাকা। বাপ এক জায়গায়, ছেলে অন্য কোথাও। কাকা-ভাইপোর আর দেখা হয় না নতুন গাঁয়ে গিয়ে। ঘর ছেড়ে যাবার দিন প্রজেক্টের সারি সারি ট্রাক যখন মাল তুলে নেবে বলে দাঁড়িয়েছিল—কী কান্নার রোল আঙকাটোলিতে! গলা জড়িয়ে ধরে মায়ে-ঝিয়ে কাঁদে, ভিটে ছেড়ে যাবার আগে আছাড়ি-পিছাড়ি খায় সমর্থ পুরুষ। চশমার আড়ালে সেদিন সুধাময়েরও পৃথিবী ঝাপসা হয়ে গেছিল, কিন্তু কী করতে পেরেছে সে! বাঁধের কাজ হিসেবমতন এগোয়নি। লোহার দাম বেড়েছে, বেড়েছে সিমেন্টের। ঠিকাদার তার পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে ঘরে গেছে, ইঞ্জিনিয়ার সময়ের টানাপোড়েনের হিসেব দিয়েছে অডিটকে—আচ্ছা, সহদেবরা তো আরও দুটো বছর বাপ-পিতেমোর ভিটেয় থাকতে পারত, ওদের যারা তাড়াল, তাদের কাছে হিসেব চাক দেখি কেউ!

উদাস এই সাঁঝপৃথিবীতে সুধাময় কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। যেমন পায়নি তার নিজের কোনও জিজ্ঞাসার উত্তর। সুধাময়ের জীবনটা এরকম না হয়ে অন্যরকম তো হ'তে পারত—এমন কেউ কি আছে, যাকে এই কথা জিজ্ঞেস করা যায়? চন্দনমহলের ঢিবির ঠিক মাঝখানটায় যেখানে রত্ন-ঘরের গভীর খনন চলেছে, সেখানেই উল্টে মরে পড়ে আছে নিবর্ণ এক পিয়াশাল। বাকলে তার কত দীর্ঘ যন্ত্রণার রেখা সব, আঁকাবাঁকা ডালগুলি স্তব্ধ কোনও ফসিল চিৎকারে আকাশের দিকে যেতে চেয়েছিল। সামান্যই রিসার্চ গ্রান্ট ছিল তখন, কয়েকটা পেপারও বেরিয়েছিল, কিন্তু পায়ের নীচে দাঁড়াবার জমি, মানে চাকরি ছিল না। নাহলে কি রুমা তাকে ছেড়ে যেতে পারত? রুমা চলে যাবার পর দিন বদলের অমোঘ নিয়মে প্রতিমা এসেছে, কিন্তু প্রতিমাই বা কী পেয়েছে সুধাময়ের কাছ থেকে? একরত্তি ছেলেটার আট মাস না পুরতে জন্ম, প্রতিমাকে বাঁচাতে তড়িঘড়ি শরীর চিরে বার করে আনা, ছ'বছরে দাঁড়িয়েছে, সাতে কথা ফুটছে, এখন বারো বছরে দেওয়াল ধ'রে চলতে পারছে, মুখ দিয়ে লালা ঝরে। সঙ্গমের মুহূর্তে রুমার মুখ বার বার মনে আসত। সমস্ত শরীর দিয়ে ধাক্কা দিয়েও সেই দীপ্তি সরাতে পারেনি সুধাময়। তাই কি ফুটল না ওই কিশলয়? কে বলবে? এই বয়সে অহরহ পুজো-আচ্চা-মানতে শুকিয়ে জীর্ণ হয়ে গেছে প্রতিমা, কপালে মস্ত সিঁদুরের ফোঁটা ধেবড়ে থাকে, মণিবন্ধে লাল-কালো নানা সুতো বাঁধা। এই সুদূর জঙ্গলে সুধাময়কে কেন আসতে হ'ল ঘর ছেড়ে, তার কোনও গড়ফাদার নেই কেন? তাড়া-তাড়া দরখাস্ত, শেষে কোর্ট কেস, কী না করেছে সুধাময়! প্রতিমার চুড়িগুলি বিলীন হতে হতে ওইভাবেই কি লাল-কালো সুতো হয়ে গেছে! তবু বেরোতে পারেনি এই গোলকধাঁধা থেকে। ওই প্রত্নপাথরগুলি অথবা আঙকাটোলির মতন তুমুল জলমগ্ন সুধাময়ের ভবিষ্যৎ।

এবার চলে আসার সময় প্রতিমা ছাড়তে চাইছিল না তাকে একেবারে; কত আর ছুটি বাড়াবে, দু-দিন, তিন-দিন, তবু আসতে হ'ল। আলনা থেকে জামা-কাপড় তুলে টেবিলের ওপর রাখা সুটকেসে গোছাচ্ছিল সুধাময়।

লোডশেডিং, ম্লান আলোয় প্রতিমার কপালের মস্ত টিপটা তার খুব কাছে এসে দুই চোখের ভিতর বিষাদমাখা চাউনি দিয়ে কী যেন খুঁজছিল।

—হ্যাঁগো, তুমি আবার ওইসব সোনা-টোনা নিজের কাছে রাখছ না তো! রেখো না বাপু, ওসব ভাল না, মাটির তলায় ছিল মানুষের হাড়-গোড়ের সঙ্গে। আমাদের তো এই অবস্থা, লোভ করতে গিয়ে হিতে-বিপরীত হবে, বড্ড ভয় করে আমার।

সোনা-খোঁজা-বাবু বলে তাকে এখানকার মানুষ। সত্যিও, আবার মিথ্যেও। প্রথম দিকে অনেক সোনার পাত, টুকরোটাকরা বেরিয়েছে। কাজ করতে করতে মেট্ বা সরদার টুক্ করে কুড়িয়ে নিয়েছে। বুড়ো পিচারু তখন অত বুড়ো ছিল না, কাজের ঢিবিতে নিয়মিত যেত, কতবার কোমরের কষিতে বামাল গুঁজতে গিয়ে সুধাময়ের দিকে তাকিয়ে ফিক্ লাজুক হেসেছে বুড়ো। নিরন্ন দেশের কঙ্কাল মানুষ—এদের কিছু বলতে পারেনি সুধাময়। এই তো কদিন আগে মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কেটে বেআইনি গোমেদ পাথর খুঁজতে গিয়ে মাটি চাপা পড়ে মারা গেল চারটে নেহাতই বালক-মজুর। ভিন্‌দেশি ব্যবসাদার সঙ্গে সঙ্গে ফেরার, ছেলেদের বাবা-মায়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতেও পারেনি। সুধাময়ের তোরঙ্গে গোপন তুলোয় মোড়া অমন দু'চারটে সোনার পাত কি আর নেই! ফাঁড়ির নতুন হাবিলদার ঠাট্টা করে কতবার কাঁধে চাপড় মেরেছে, জানতে চেয়েছে, দেখতে চেয়েছে, গম্ভীরভাবে এড়িয়ে গেছে সুধাময়। অদ্ভুত ওই পাতগুলো, গোল, ঠিক সমান নয়, কী সব অচেনা হরফ, একটাতে এক রমণীর আবছা মুখ, মুখের অপার্থিব হাসিটা কীভাবে খোদাই হয়েছিল, এতদিনেও তার রহস্যমায়া উবে যায়নি···

এখন এক-একটি দিন যাচ্ছে, গ্রীষ্ম পেরিয়ে বর্ষা, বর্ষা পেরিয়ে শরৎ-হেমন্ত-শীত, মাটির পরত খুলে ক্রমাগত বেরিয়ে আসছে নানা বিস্ময়, নদীর কোমরের ইস্পাত কংক্রিকেটের শেকলখানি মজবুত হয়ে এঁটে বসছে, সুধাময় নন্দ ততই নিশ্চিন্তভাবে বুঝতে পারছে প্রতিমার হাতের হারিয়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া চুড়িগুলি এ জীবনে আর ফেরানো হবে না তার, তবু রোজ শুতে যাবার আগে একবার সে ওই সোনার টুকরোগুলিকে দেখে, ঘ্রাণ নেয়, প্রাণ ধরে ফেলতে পারে না। সুধাময় বুঝতে পেরে গেছে, একদিন মধ্যরাতে আচম্‌কা জল আসবে, ক্যাম্পখাট দুলিয়ে, তোরঙ্গ ভাসিয়ে সুধাময়কে দ্রুত টেনে নেবে তার কোলাহলমাখা স্পন্দনের ভিতর; ওই পাতাল-নরনারী পাতাল-শিশুদের সঙ্গে জীবনযাপন আরম্ভ হবে সুধাময়ের—অনেক অনেক দিন পর মাঝদুপুরে এক ঢাউস কাল্‌বোস ঘাই দিলে কেউ জানতেই পারবে না যে আংকাটোলির সোনা-খোঁজা-বাবু আজও তল খুঁজে পায়নি।

বাল্বচরের ওপর দিয়ে গেছে আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা। রেখাটির অন্য পথ ছিল না, সীমান্তে নদী থাকলে এই রকম হতে বাধ্য। আসলে রাষ্ট্রশক্তির খুঁটির জোর যতই থাকুক, অথবা সময়ের সঙ্গে ভোল পাল্টাবার বিদ্যে, নদীটি হাজার হোক তার অনেক অনেক আগে এসেছিল। জলে-জলেই যাচ্ছিল আন্তর্জাতিক রেখা, মাঝখানে জেগে ওঠা ধু ধু বাল্বদ্বীপ খালি তাকে যেতে নাহি দিব ভঙ্গীতে আটকাতে চায়। তাই সে সামান্য হোঁচট খেয়ে, ভেজা পায়েই বাল্বচরে উঠেছে। ওপারের রাষ্ট্রটি নতুন, বছর বাইশ আগে নানা ওলটপালট, রক্তপাত, লুণ্ঠন ইত্যাদির মধ্যে ওঁয়া-ওঁয়া শব্দে জেগে উঠে সে প্রথমেই শুনেছিল নদীর ছলাৎ। নদীর নয়, নদের। কেউ কেউ নদ হয়ে জন্মায়, অন্যরা নদী। কপোতাক্ষর মতন ব্রহ্মপুত্রও নদ। জনমানসে ভাবমূর্তিকে চাঙ্গা করে রাখতে রাখতে খানিকটা পুরুষালী গাম্ভীর্য ক্রমশঃ তার মজ্জায় ঢুকে গেছে। হাজার হাজার বছরে কত কিছুই দেখেছে ব্রহ্মপুত্র। পুষ্যবর্মণ চলে গেছেন, হিউয়েন সাং এসেছেন কামরূপে, পরমভট্টারক পরমেশ্বর রাজা শ্রীহর্ষের পর বর্মদেব বনমাল সাম্রাজ্যকে পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত বিছিয়ে দিয়েছেন। পালবংশের রত্নপাল, ইন্দ্রপাল, ধর্মপালেরা ক্যারাভানের মতন সময়ের ওপর হেঁটে গেছেন। পৃথুর সঙ্গে যুদ্ধে মুছে গেছেন মহম্মদ ইব্ন্ বখ্তিয়ার। এই সমস্ত কিছুর আগে একদিন বেহুলা বলে মেয়েটি ধোবাবুড়ীর ঘাটে স্বর্গের রাস্তা শুধিয়েছিল, অথবা হয়তো আসেই নি কোনোদিন? তাই কি পাথরটা, কাছারির পাছদুয়ারে পাঁচিল ঘেরা মস্ত পাথরটাকে বড় নতুন মনে হয়েছিল অনিমেষের! এমন আলতো হাতে কাপড় আছড়েছে নেতা ধোপানী, যে সময়ের দাগই পড়েনি পাথরে?

অনিমেষের পাশে বসে ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল প্রহ্লাদ মৈত্র। প্রহ্লাদও কলকাতার ছেলে। কিন্তু এই ক'দিনেই প্রচুর ম্যাপট্যাপ জুটিয়ে নিয়েছে, বইপত্র। একই স্টলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটালেও ওসব বইপত্র অনিমেষের চোখে পড়বে না। কিন্তু কিভাবে টেনে তাদের বার করে আনে প্রহ্লাদের মোটা কাঁচের চশমার পেছনের বিহ্বল দৃষ্টি। তবে এখন ঐ রেখাটিকে দেখে অনিমেষ লোভীর মতন ভাবছে জল পেরানোর কথা। নিষিদ্ধ জগতের ডাক। পাসপোর্ট নেই, অথচ বর্ডার পেরিয়ে এলাম, বাড়ীতে বলা যাবে।

নদের জল স্লেটের মতন, শান্ত, গম্ভীর ভাবে এ কূল থেকে ও কূল জুড়ে আছে। ওদিকের তীর পেন্সিল-স্কেচের মতন আবছা, আকাশে আলো নেই। এ পাড়ে, নিচ রাস্তার পর ঢালু জমি নেমে গেছে জলের দিকে।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে বড় ছোট ফেরী নৌকারা, একখানা বিশাল যাত্রী পারাপারের বার্জ দাঁড়িয়ে। খেয়া পার হয়ে যাবে মেঘালয়। নদীর ধারে অনেকগুলি ছোটো চায়ের দোকান গজিয়ে উঠেছে, একখানা টিকিট ঘর মোটর লঞ্চের জন্য। এমন জায়গায় বিনা কাজেই অনেকখানি সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। অনিমেষের কিছু কাজ ছিল। অন্ততঃ কিছু কাজ সেরে এলে তার পক্ষে ভালোই হত। কিন্তু দুপুরের পর থেকে অনিমেষের মনটা কেমন লম্বাটে হয়ে ঝুলে পড়েছে। সকালে আজ কোন অধিবেশন ছিল না। স্নান করে পাজামা পাঞ্জাবি পরে হাসনুদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে সে একা একা মঞ্চের পেছনে যেখানে অতিথিদের খাওয়ার মণ্ডপ, সেখানে যাচ্ছিল। জায়গাটার নাম নেহরু উদ্যান। কিন্তু পায়ে পায়ে ঘাস উঠে এত ন্যাড়া মাটি, যে কোনদিন ফুল ফুটবে বলে মনে হয়নি অনিমেষের, মণ্ডপের দড়ি বাঁশ খোলার পর বসন্ত এলেও। ভোর সাড়ে পাঁচটায় এক কাপ চা। হাসনুর মা বেশ তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন। কিন্তু ওর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও অনিমেষ জলখাবার খেতে রাজি হয়নি। একে ওদের বিব্রত করা, এটা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে গৃহস্বামীর অলিখিত চুক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই নেই—এই খাওয়া-দাওয়া, তারপর অচেনা পরিবেশে, একা, বাড়ীর মেয়েদের সামনে বসে মুখ নীচু করে লুচি বেগুন ভাজা খাওয়া ঠিক অনিনেষের ধাতে নেই। মণ্ডপে বরং চিত্তদারা থাকবেনই, এলাহাবাদের সুমিতা বিশ্বাসের সঙ্গে গতকালই আলাপ হয়েছে, একসঙ্গে গল্প করতে করতে ব্রেকফাস্ট—এইসব ভাবতে ভাবতেই বাঁদিক থেকে এ্যাই অনিমেষ শালা, তাকা একবার শুনে অনিমেষ ব্রেক কষে। ঝড়ঝড়ে পুরোনো একটা ব্লু ডিজেল এ্যামবাসাডারে ঠেসাঠেসি হয়ে চিত্তদা, সুমিতাদি, অলক সেন এবং অচেনা আরও দুজন লোক।

এখনও খাওয়া হয়নি ? সুমিতাদি ঘাড় নেড়ে হেসেছে, যাও, আজ ভালো জিলিপি আছে।

চিত্তদা বলেছে আমরা গৌরীপুর যাচ্ছি। লাঞ্চের আগেই ফিরে আসবো। অনিমেষের তেতো হাসি দেখে চিত্তদা একটু অপ্রতিভভাবে জুড়ে দিয়েছিল।

তুই তো যেতিস না। কাল রাত্তিরে আমাদের যা আওয়াজ দিলি···না হ'লে তোকে ওখান থেকেই তুলে নেওয়া যেত···

ঠিক আছে। যান না। দুপুরে দেখা হচ্ছে তো।

মুখে হাসি রেখেই অনিমেষ গেট দিয়ে ভেতরে এগিয়েছে। কিন্তু গাড়ীটার ধুলো মিইয়ে যেতেই ওর বুকের মধ্যে লাফ দিয়েছে একটা ভয়, এখন অনিমেষ একা, একদম একা···অবশ্য জলখাবার খেয়ে হাসনুদের বাড়ীতে ফিরে যাওয়া যায়, বড় লেখাটা এগোনো যায়, তবে এখানে একটা বইও আনা হয়নি, লেখাটা এলেবেলে হয়ে যাবে। কিন্তু এক্ষুনি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না ওদের বাড়ি। এই সময়ে বাড়ীর মেয়েরা অগোছালো হয়ে চানে যায়, ভিজে কাপড় মেলে, চুল আঁচড়ায়, পুরুষগুলি ওদের বাড়ীতে কেমন যেন সবসময় অদৃশ্য, গলায় আওয়াজই নেই, কেমন একটা অস্বস্তি হয় অনিমেষের।

চিত্তদা তাকে একবারও বলতে পারল না? গতকাল সন্ধেবেলা অনিমেষ কী বলেছিল এখন একেবারে ধোঁওয়াটে হয়ে গেছে মনের মধ্যে, কিন্তু কখনোই বলেনি যে গৌরীপুরে যাওয়ার গাড়ী পেলে সে যাবেই না। বরং চিত্তদাই বলেছিল, গাড়ী পাওয়া যাবে না। কাল ভি আই পিরা আসছে। তাদের চামচেদের জন্য তিন-চারটে গাড়ী মজুদ থাকবে। আমাদের কোথাও যাওয়া হবে না।

সুমিতা বিশ্বাস বলেছিল, তাতে কী হয়েছে, আমরা তো নদীতে যেতে পারি। ওই তো হাঁটাপথে ঘাট।

প্রমথেশ বড়ুয়ার বাড়ীর প্রসঙ্গে তেমন কিছু উচ্ছলতা দেখাতে পারেনি অনিমেষ। এটা ওর স্বভাব। প্রতিমা বড়ুয়ার গাওয়া গান দুটি ওর ভারী সুন্দর লেগেছিল, ওঁর শান্ত, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য, যা বয়সে দীপ্তই হয়, শুকোয় না, ছুঁয়ে গেছিল ওকে। কিন্তু যে মানুষকে মঞ্চের নীচ থেকে দেখে ভালো লাগে, দিনের আলোয় তার কাছে গিয়ে, অথবা তাদের স্মৃতিভরা ঘরদুয়ার দেখে আনন্দ পাবে এমন মনে হয়নি অনিমেষের। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ভীড়ে কি আদুরকে গিয়ে বলা যায়, এই যে আপনার ফিল্ম দারুণ লাগে, অথবা রবীন্দ্রসদনে সুচিত্রা মিত্রকে কমপ্লিমেণ্ট দেওয়া মুখের ভাষায়…এসব মনেই ভাঁজ করে রেখে দেওয়ার জিনিস, দিনের আলোয় বিছিয়ে দেওয়ার নয়…

চিত্তদা এটা বুঝতে পারেনি। চিত্তদার পক্ষে বোঝা সম্ভবই নয়। তাই রাগ করা এই পরিস্থিতিতে একেবারে অমূলক।

জলখাবার খেয়ে খানিকটা এ-পথে ও-পথে ঘুরে নদীর ধার ঘেঁষে যে কাঁচা রাস্তাটি গেছে তা বেয়ে অস্থায়ী ঝুপড়িগুলোর জীবনযাপন দেখতে দেখতে আবার শহরের মধ্যে ফিরে এসেছে অনিমেষ। সময় অল্পই কেটেছে। মন খারাপটা মেলায়নি। অদ্ভুত এই জায়গাটা। এখন শীতের বেলায় এখানে ওখানে পাতলা জটলা, বাড়ীর বারান্দায় ইতস্তত গুঞ্জন, যদিও ভীড় কোথাও নেই। গত তিন রাত ধরেই অন্ধকারে উপচে পড়ছিল মানুষ, একটা রাস্তাতেও ভালো আলোর ব্যবস্থা নেই। মঞ্চ অবশ্য আলোয় আলোময়, মণ্ডপেও হ্যালোজেন। আলো আছে পথের মোড়ে মোড়ে। আকাশ বাতাস জোড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ, নজরুলগীতি—আর মানুষের চলাচল, কেউ হেঁটে চলেছে মঞ্চের দিকে, কেউ দলবেঁধে ফিরে আসছে…দুর্গাপুজো দুর্গাপুজো ভাব চারিদিকে…

এমন জায়গায় এত, অ্যাঁ, ভাবা যায় না। চিত্তদা উইংস-এর কাছে দাঁড়িয়ে প্রবন্ধের ওপর আলোচনা শোনার জন্য সমবেত ভীড় দেখে চমকে গেছিল। অবশ্য এদের মধ্যে আড়াই হাজার অন্যান্য প্রদেশের ডেলিগেট্‌স্—তাতে কী! তাদের ধরেই হাজার দশ বারো মানুষ। সাহিত্যবিষয়ক সম্মেলনে এমন উচ্ছল ভীড় কে দেখেছে। উলটে-পালটে দেখেও ওরা কেউ কোনো অশালীন আচরণ দেখেনি, হিন্দি গান চালানোর জন্য অনুরোধ, কিংবা কফি স্টলে তরুণী মেয়েদের দেখে ইশারা। অলক সেন বেঁকতে চায়নি। ছোট জায়গা

তো আফটার অল, এখানকার মানুষের মধ্যে এখনও গ্রাম্যস্বভাব একটু বেশি বেশি···তবে চিত্তদা বলেছিলেন, তা নয়। এখানে এই সম্মেলন দোল-দুর্গা-পুজোর মতন করে নিয়েছে মানুষ। মরুভূমিতে ক'ফোঁটা জল, এরা কি আর পাবে এইসব, অন্ততঃ বছর পাঁচেক তো নয়ই···

প্রশংসা, তবু নেগেটিভ। কৃতিত্বটা এদের ভালোবাসার কি শৃঙ্খলার নয়, প্রকৃত শহুরেপনার অভাবে যে মুখচোরা সঙ্কোচ তৈরী হয়, তার ওপর চাপানো হয়েছে।

অনিমেষের এত রকম চুলচেরা বিচার করতে ইচ্ছেই করেনি। বরং তার ভালোই লাগছিল, যেভাবে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা খাতা নিয়ে অটোগ্রাফের জন্য মাঝে মাঝেই তাকে ছেঁকে ধরছিল—এত অটোগ্রাফ তিনদিন একটানা—কোনোদিন কি অনিমেষ দিয়েছে। দ্বিতীয় অধিবেশনের পর মঞ্চ থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতেই লালপেড়ে সিল্কের শাড়ি, লাল ব্লাউজ, খোঁপায় ফুল, কপালে চন্দনতিলক চোদ্দ বছরের একখানি গর্জন তেল মুখ অনিমেষকে অভিভূত করে দিয়েছিল।

আমাকে অটোগ্রাফ দেবেন! খাতাখানা বুকে চেপে ধরে মুঠোয় সবুজ কলম, মেয়েটি কাছে সরে এসেছিল, আমাকে আগে··· । আনকোরা শঙ্খ সাদা পাতায় কলম ঠেকাতেই অনিমেষ শুনেছিল—উফ্ সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি!

রোদ্দুরে কানের দুল ঝলসাচ্ছে।

তোমার নাম কি ?

হেমনলিনী।

বাঃ, সুন্দর নাম। কে রেখেছিলেন ?

আমার ঠাকুমা, উনি মারা গেছেন।

পলক পড়ল। চোখের ওপরের পাতায়ও কাজলের নিপুণ রেখা। কী অপরূপ ছোট্ট কপাল।

এইটুকু মেয়ে, হেমনলিনী কি অনিমেষের কোনো কবিতা পড়েছে ? দূর, এখানে কি কলকাতার লিট্ল্ ম্যাগাজিন আসে ? হেমনলিনী মিলিয়ে যেতেই হাসিভরা মুখে অনিন্দিতা ছুটে এসেছিল।

দেখি, ওকে কি লিখে দিলেন ! আমায় একটা কবিতা···

অনিন্দিতার পর টিংকু, তারপর স্নেহাশিস, তারপর তপন,···আসলে, প্রথম বক্তা স্বনামধন্য দেবব্রত মুখোপাধ্যায় নীচে নামার পরই আঞ্চলিক শাখার সভাপতি যিনি কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এসে ওঁর দুটি হাত ধরে, আমি মুগ্ধ বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য কমিটির সচিবের স্ত্রী ; আমি একেবারে অভিভূত ···বলে দেবব্রতকে দ্রুত নিজের বান্ধবীদের ভিড়ে টেনে নিয়ে যান। কচি-কাঁচারা দেবব্রতকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে, তারপরই অনিমেষ, একেবারে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা।

এত সই দিচ্ছিস কেন-গাড়োলের মতন ! চিত্তদা বলেছিলেন। ব্যাজ, ওই

গলার উত্তরীয়-টিয় খুলে ফ্যাল্, কেউ চিনতে পারবে না ভিড়ে। কেউ আসবে না।

আদেখ্‌লেপনা হয়ে যাচ্ছে নাকি ?

দূরে, কাঁধে ঝোলা, ঘাড় গুঁজে শিশুসাহিত্যিক গৌরচন্দ্র বসুকে আবেগের সঙ্গে সই দিতে দেখে জনমানসে নিজের সম্ভাব্য ছবিটা আঁকতে ইচ্ছে করল অনিমেষের।

তাই বলে এই শহরের দেওয়া সব কিছুই কি আর নেওয়া যায় ?

যেমন নেওয়া যায় না তার প্রত্যাখ্যান, মুখ ফেরানো !

গতকাল সন্ধেবেলা ইচ্ছে করেই দু-দুবার সোজা পথ ছেড়ে বাস-স্টেশন ঘুরে মণ্ডপে গেছে অনিমেষ। ফণীবাবু বলেছিলেন, গেটেই থাকবেন। ওকে দেখলেই বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাবেন। সেই ভয়ে।

মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, রোগা, লম্বা, মাথায় টাক, ঝুলে পড়া ঠোঁট, ফণীবাবুকে দেখে কোনো আকর্ষণ বোধ করেনি অনিমেষ, সেই প্রথম সন্ধের সভায়। ফণীবাবু কিন্তু ছাড়েন না। অনেকে মিলে দাঁড়িয়ে কথা বলেছে, হঠাৎ লম্বা গলা বাড়িয়ে, "আমাকে এ-শহরে কেউ চেনে না, বুঝলেন তো, আমার স্ত্রীর পরিচয়েই আমার পরিচয়…"

এছাড়া, "আসলে তো অনিমেষবাবুর আমাদেরই কাছে থাকার কথা, আমার স্ত্রী কবিতা বলতে অজ্ঞান, কিন্তু ঠিক ওঁর আসার আগের দিন, বুঝলেন, ওয়ার্কিং কমিটি একেবারে হাতেপায়ে ধ'রে…কলকাতা থেকে একসঙ্গে তিনজন ভদ্রমহিলা এসেছেন…আমাদের একেবারে হাতেপায়ে, নাহ'লে…"

এরপর অনিমেষকে অস্বস্তিতে কোণাকোণি হেঁটে কোথাও চলে যেতে হয়।

আসলে সেই প্রথমদিন, পড়ন্তবেলায়, ভীষণ ক্ষিদে নিয়ে অনিমেষ এই বাড়ীর সামনেই এসে পেঁৗছেছিল, ভাড়া করা জীপের পেছনে বসে, পায়ের কাছে স্যুটকেস। উদ্যোক্তারা বলে দিয়েছিলেন ড্রাইভারটিকেই, টাউনে ঢুকে ফণী মুখুজ্জের বাড়ী নিয়ে যাবে সোজা। ওই নীল টুক্‌টুকে দরজা দুটি, জাল দেওয়া জানলা, বাইরে ছোট্ট বাগান বেশ লেগেছিল তার। ড্রাইভারও ক্লান্ত। ট্রেন তিন ঘণ্টা লেট ছিল। কুচবিহার রোড স্টেশন থেকে খোয়া বার করা ক্লিষ্ট রাস্তা ধরে হাইওয়ে। শীতের দিন তাই রক্ষে, রোদে কষ্ট হয়নি। তবে বিহু নাচের বালখিল্যরা আসামে ঢোকার পর অনেকবার গাড়ী থামিয়েছে, পয়সা চেয়েছে। শহরের পথ আরও জটিল, নানা রকমের ভীড়, নানা বাঁক। শেষ পর্যন্ত ঠিকানা খুঁজে ড্রাইভার চিরকুটটি হাতে নিয়ে ঢোকার উপক্রম করতেই যে নারীকণ্ঠ জানলাপথেই এই এখানে না, আমাদের এখানে আর না, ধ্রুবদা আঞ্চলিক শাখার সভাপতিকে বলে দিয়েছি তো…এই রবে বেজে উঠেছিল। ফণীবাবুর অনুরোধে চা খেতে খেতে আবার তা অন্যসুরে শুনতে ইচ্ছেই করছিল না অনিমেষের। কিন্তু এ কথা যেমন চিত্তদাকে বোঝানো যায়নি, তেমন ফণীবাবুকেও বোঝানো যাবে না। তার থেকে ঘুরপথে

যাওয়াই ভালো। ভদ্রলোক বলে দিয়েছেন, যত রাতই হোক, আসবেন। ডিনারের পর এক কাপ কফিই নাহয়···আমি এই গেট-এ অপেক্ষা করব।

মেঘলা দুপুরের আলোছায়া মেখে ব্রহ্মপুত্র কেমন স্মিতমুখে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অনিমেষ এবার পা বাড়াবে। একটা নৌকা চাই। সুমিতাদিকে নিয়ে কেটে পড়েছে চিত্তদাটা, শয়তান। কেমন বাইপাস করে বেরিয়ে গেল অনিমেষটাকে। অনিমেষ একাই বেড়াতে যাবে। বড় একটা নৌকো নিয়ে জমিদারের মতন নদীবক্ষে ঘুরবে। প্রহ্লাদটা আবার আসতে চাইবে না তো সঙ্গে? প্রহ্লাদ গম্ভীরভাবে দূরে তাকিয়ে আছে—নৌকো চাই? দাঁড়াও, আমি দরাদরি করে দিচ্ছি। একদিনে পাঁচ-ছটা নৌকো এ্যারেঞ্জ করেছি তো, আমায় এরা লোকাল বলে জানে।

পাশের চায়ের দোকানদারই বেঞ্চিতে বসে থাকা একটা লোককে খুঁচিয়ে তুলে দিল—এই তো রমজান মিয়াঁ যাবে। এ্যাই রমজান··· । রমজানের খালি গা, পরনে লুঙ্গি, অল্প দাড়ি, ভাবলেশহীন গায়ের রং—একশো টাকা নেবো, আড়াই ঘণ্টা ঘোরাবো, কোমরের কষি বাঁধতে বাঁধতে বলেছে, চলুন, চলুন। প্রহ্লাদ দরাদরিতে বিফল হয়ে ম্যাপটা দিয়ে দিল অনিমেষকে। রাত্তিরে ফেরৎ দিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে।

স্লেট-রঙা জল কেটে নৌকো এগোয় মৃদু। দূরে সরে যাচ্ছে তটের রেখা। সামনে বালুচর, তাই নৌকো একটু কোণাকুণি এগোচ্ছে। কূল ঘেঁষে ভাঙা পাঁচিল, ভাঙা পাঁচিলের পর চুনকাম করা নতুন পাঁচিল, চত্বর, তার পেছনে বিশাল গুরুদ্বার, মাথার সোনার চুড়ো আলোয় চমকাচ্ছে। দু'হাজারের কাছাকাছি ডেলিগেট এবার ওখানেই আছেন, বিরাট এক পক্ষীমাতার মতনই ওই সাদা বাড়িটা সবাইকে বুকে জাপটে ধরে নিয়েছে। কাছাকাছি চর দুটি ফাঁকা। ওদিকে বস্তি .আছে—ঐ ওখানে। নৌকো বাইতে বাইতে জলে পেতে রাখা মাছ ধরার জাল এড়িয়ে রমজান চলেছে, ওর সঙ্গে আছে বিল্লু বলে একটি অল্পবয়সী ছেলে।

তোমরা কি এদেশের, না ওদেশের?

শুনে রমজানের মুখের ওপর দিয়ে কোনো ছায়া হেঁটে গেল না। তবে ও অনিমেষের দিকে না তাকিয়েই বলল, আমরা তো আগে টাউনেই থাকতাম, বস্তিতে, এখন চরে চলে গেছি।

চরে থাকতে ভালো লাগে? টাউনে আসতে রোজ খেয়া পেরোনো?

রমজান বলল, চরই তো ভালো। ফসল হয়। পলিমাটি। খেয়া পেরোতে হয় তো কি! আমার একটা জাহাজ, খালার একটা জাহাজ। সারাদিন বাস প্যাসেঞ্জারদের ওপারে ছাড়ি। বর্ষাকালটা অবশ্য টাউনেই কাটাই। ওখানে পানি ঢুকে যায়, মাচা-ফাচা সব জলের তলায়।

টাউনে কোথায়?

ওই যে গুরুদ্বার, ওই সাদা বাড়ীটা দ্যাখলে না? ওরাই খেতে দেন,

থাকতে দেন। দুইটা জাহাজে পোলাপুলি সব লইয়্যা চইল্যা আসি।

আচ্ছা ওই সামনের চরের বস্তিটা ঘুরিয়ে আনো না! কারা থাকে দেখি। আড়াই ঘণ্টা ঘোরাবে তো বলেছ।

মাঝনদীতে একটা যাত্রীনৌকো জেলেদের সঙ্গে দরাদরি করছে। জেলেরা ডিঙিতে করে মাছের নমুনা নিয়ে ওদের কাছে গেছে। মাছগুলো ধড়ফড় করছে। লাফাচ্ছে। কিন্তু দামে পোষালো না। রমজান বিচিত্র হেসে বলল, আপনারা তো ভয় পান, আমাদের লগে আইস্‌তে ভয়। নাহ'লে এক জায়গায় লইয়্যা যাইত্যাম চলেন। আমাদের বাড়ী যাবেন? বলে যেম রহস্য-ভরে অনিমেষের মুখ চোখ হৃদয় সব দেখতে চাইল।

অচেনা দেশ। বিজন-বিভুঁই। একা অনিমেষ। যাবে? যদি আর না ফেরে, কেউ জানতে পারবে না।

হাসনুর মায়ের মুখটা ওর চেতনায় টলটল করে উঠল। ষাট পেরিয়েছে তো অনেকদিন, ছেলেমেয়ের বয়স জুড়ে হিসেব যা পাওয়া গেল। চামড়া এখনো মসৃণ টানটান, চোখমুখ ঘুরিয়ে যখন কথা বলেন, ভুরু দুটো মাঝ-কপালে উঠে যায়।

ঝুলবারান্দায় বুকের তলায় কাঠের রেলিং চেপে দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে অনিমেষকে দেখাচ্ছিলেন গলির অন্ধকার মাখা অন্য দিক্‌টা। বাঁ দিকটা স্ট্রীট লাইটে উজ্জ্বল, সামনে একটা ছোট্ট খেলার মাঠ।

ঐ—ঐখানে দাঙ্গা বেঁধেছিল। ওদিকটাতেই ওরা বেশি তো। আমি ভয়ে মরি। বিভু কলকাতা গেছে। বাড়ীতে হাসনু, আমি আর বউমা। সারা রাত বুঝলে, চীৎকার, বোমার শব্দ, ধুঁয়া দেখা যাচ্ছে। মিত্তিরের ছেলে-দুটো সন্ধেবেলা এসে বলে গেছে দরজা খুলবেন না, যাই হোক না কেন। মাঝরাতে ঐ গেটের কাছে অনেকগুলো লোক, দরজা খুলুন খুলুন করছিল —ওরাই, বুঝলে তো, কেউ জল চায়, একজনের চোট লেগেছে, একজন পুড়ে গেছে···

খুললেন গেট?

পাগল, খুলি কখনও! বিধবা মানুষ, একা থাকি, তাও তো কত্তা বাড়ীটা করে গেছেন তাই···তা উনি যাবার পর থেকে সময় আর কাটে না বাবা। মেয়েটার মুখের দিকে তাকালে বুক ধড়ফড় করে···

মুখ না ফিরিয়েও অনিমেষ বুঝতে পেরেছিল, মশারী টাঙানো শেষ করে হাসনু নিঃশব্দে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

মেয়েটার রং ময়লা, চুল এলো খোঁপা বেঁধে রাখে সব সময়, চাপা নাক, বড় বড় চোখে ব্যথার ছাপ, মুখখানা গোলগাল, শরীরটা কৃশ। শিলচরে বিয়ে হয়েছিল, বেশ ভালোমত দেওয়া-থেওয়া করে। বিয়ের জল গায়ে না পড়তেই মেয়ে ফেরৎ, জিনিসপত্রগুলো এখনও আসতে পারেনি।

হাসনু আছে এ বাড়ীতে সেই থেকে। কতদিন থাকবে? হয়তো আমৃত্যু। ওর দিদি জ্যোৎস্না এসেছিল ছোটভায়ের বিয়েতে। বিয়ে-থা মিটে গেছে।

দিদি যাই যাই করছে। জ্যোৎস্নার পর হাসনু, হাসনুর পর বিভু। বিভুর বউ এখন এক-গা গয়না পরে নতুন শাড়ীর খস্ খস্ শব্দ তুলে এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াচ্ছে। আড়াই মাস বিয়ে হয়েছে। তবু বউ এখনও নতুন। পাওয়া শাড়ীগুলো উল্টেপাল্টে রোজ পরছে বোঝা যায়। একদিন অনিমেষ ঘরে ঢুকতেই হুড়মুড় করে পালিয়ে গেল বউ। দেরাজে কি যেন খুঁজছিল। খুঁজবেই। ঘরটা ওদের দুজনের। তবে এ ঘরের বিছানা তোলে হাসনু, অনিমেষ যখন উঠে মুখ ধুতে যায়। মশারী পাট করে আলমারীতে রাখে। টেবিল, চেয়ার ঝাড়ে মোছে। অনিমেষের শুকনো জামাকাপড় এনে ভাঁজ করে রাখে। এই কাজকর্মের মধ্যে অনিমেষের আনা বইগুলি নেড়েচেড়ে দেখে। প্রথমদিন সন্ধেবেলা মায়ের সঙ্গে কবিতাপাঠ শুনতেও গেছিল।

এসব করতে হবে না আপনাকে, অনিমেষ হাসনুকে বলেছে, বিছানা আমি তুলে রাখব, জামাকাপড়ও এনে রাখব…

হাসনু নিঃশব্দে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে গেছে। জ্যোৎস্না তার ভাঙা খোঁপা হাতে জড়িয়ে নিয়ে বলেছে, করুক না। ওর মন লাগছে তো। কেউ তো এমন আসে না এখানে। তাছাড়া, আপনি আমাদের অতিথি। লেখেন টেখেন। আমাদের মধ্যে হাসনুই একটু যা বইটই পড়ে, লাইব্রেরী থেকে বই আনে।

তাই নাকি, কি ভালো লাগে তোমার হাসনু ?

অনিমেষ ওকে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু ঘরের মেঝেতে হাসনুর ছায়া লোটাচ্ছিল।

দরজায় নখ ঘষার মৃদু শব্দের পর, কবিতা, দুম্ করে বলে পালিয়ে গেছিল মেয়েটা।

যে মেয়ে বাপ-মার ঘরে জন্মায়, বড় হয়, হাসে-খেলে, সে যখন এইরকম অসময়ে ফিরে আসে, তখন কোনো কিছুই আর আগের মতন করে পায় না। জ্যোৎস্না বলছিল, দাঙ্গার পর থেকেই মা কেমন যেন চিন্তায় শুকিয়ে যাচ্ছেন। বাবা নেই, বিভু বাইরে বাইরে থাকেন, ঘরে অত বড় মেয়ে…এইরকম এলাকায় থাকা…এখানে তো কোনো রকম বাধানিষেধ নেই, নদী পেরিয়ে হরদম ওপার থেকে রোজ লোক আসছে, টাউনের বস্তিতে থেকে যাচ্ছে, নদীর চরগুলো তো বেদখল হয়ে গেল…

অনিমেষ চিন্তার ভিতর থেকে মুখ তুলে দেখে নৌকো বাঁয়ে ঘুরে যাচ্ছে। এখানে নদী অত চওড়া নয়। ডান দিকের পাড়ে সারি সারি খেয়া নৌকো বাঁধা, রমজান মিয়াঁর ভাষায়—জাহাজ। বালুচরে কারা যেন তিসি বুনেছে। গাঢ় হলুদ ফুলে ছয়লাপ হয়ে আছে বালুচর। স্লেট-রঙা জলে সেই হলুদের ছায়া দোলে, ভাঙে, চুরমার হয়। সূর্য মাথার ওপরে, তবে এ রোদ কষ্ট দেয় না, গাঢ় শীত এদেশে। কাল সন্ধেবেলা মণ্ডপের তেরপল ছিঁড়ে শীত ঢুকছিল। হাসনুর মা, জ্যোৎস্না এদের কথা ও আশঙ্কার সঙ্গে রমজানের "আম্নারা তো ভয় পান"-কে মেলাবার চেষ্টা করছিল অনিমেষ। কত দূর

নিয়ে এল এই লোকটা ওকে ? ওদিকের তটরেখা এখন একেবারে ঝাপসা। ইচ্ছে করলে ফেরা যাবে না, যতক্ষণ না রমজান নিজে থেকে ওকে ফেরায়। লোকটা আড়াই ঘণ্টা, একশো টাকা এই সব হিসেবকিতেব ভুলে প্রাণপণে স্রোতের বিপরীতে নৌকো বাইছে—বুকটা, বুকের খাঁচাটা উঠছে পড়ছে।

একসময় ওদিকের পাড়ে নৌকো লাগিয়ে ডাকল, আসেন। বিল্লুও নামল। কী বিশাল এই নদ। নদীর স্রোতধারার বুকেই পাশাপাশি এই রকম দু-তিনটে চর, তবে এটা তো বিরাট এক দ্বীপ। আগে আগে রমজান যাচ্ছে, পেছনে বিল্লু, সবশেষে অনিমেষ। একটু দূরে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল বিল্লুটা। ওদের পায়ে পায়ে এখন জড়াচ্ছে রাশি রাশি খড়কুটো, সবে ধান কাটা সারা হয়ে গোলা ভরা হয়েছে। ম-ম করছে নতুন খড়ের গন্ধ।

বাঁয়ে ঘস্ ঘস্ হাস্কিং মিল চলেছে।

এটাও তোমার ?

খালার ছেলের।

খোলা আকাশের নীচে কেবল হাওয়া, ধান, ধানের গন্ধ।

রমজান এগোচ্ছে।

ধু ধু ফাঁকা। ক'ঘর থাকে এখানে, কে জানে ?

এক জায়গায় ছ-সাতটা খোড়ো চালের কুঁড়েঘর প্রায় গোল করে ঘিরে রেখেছে উঠোনকে। একরাশ ন্যাংটো ছেলেমেয়ে জটলা করছে।

বউয়েয়া উবু হয়ে বসে গল্পগুজব করছিল।

ওদের আসতে দেখে সবাই ছত্রখান।

ও মা, এই বাবু আমার জাহাজে আসতেছিলেন, নিয়্যা আসলাম, কলকাতার লোক।

বুড়ীর মুখ দন্তহীন, ভাঙা চশমা, হিজিবিজি মুখ। কী ভাবে পর্দা করবে ভেবে পায় না।

ও বড় ভাবী—ও ছোট ভাবী আইস, আইস—লজ্জা কীসের !

কেউ আসে না। রমজান ডাকে। ঘরের ঘুপচি অন্ধকারের ডেতর মুখে কাপড় গোঁজা খিল খিল হাসি।

ঘরদোয়ারের পেছনে, ঢালু বালির ওপর, বাপরে কী কাণ্ডই করেছে রমজান্‌রা। মাসকলাই ফলেছিল এত এখানে !

ফসল কাটা মাঠ ছটফটাচ্ছে। চাল বেয়ে উঠেছে লাউয়ের, শিমের লতা।

রমজান অনিমেষকে ছাড়ে না। ঢেঁকিঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে শহুরে মানুষকে ঢেঁকি দেখায়। দুই ভাবী আমিনা, সজিদা ও নিজের বোন শকীলার সঙ্গে আলাপ করিয়া দেয়।

এই ক'মাস যা আমাদের সময়, বুইঝ্‌লেন ! বর্ষার পানি এলে এই চর ডুববে, ঘরের মাচানতক ডুইব্যা যিব পানির তলায়। আমরা সবাই ওই দুই খ্যান জাহাজ ভইর‍্যা ওই ওপারে…টাউনে। সে বড় কষ্ট—তিন চার মাস একটানা।

গরম গরম সেদ্ধ মুরগীর ডিম আসে সাত-আটটা। কাঁসার গ্লাসে চা, জল।

নিন্, আর কী দিবা আপনারে, গরীবের ঘর।

অনিমেষের মুখের মধ্যে দেশী ডিমের কুসুম গলছে। এই সময় রমজানকে জিজ্ঞেস করা যায় কি, এতই যদি কষ্ট চর ছেড়ে দিয়ে টাউনে গিয়ে থাকো না কেন, বরাবরের মত? অনিমেষ জানে, বছরে আটমাস রমজানরা এই বালুচর আঁকড়ে পড়েই থাকবে। পলিমাটি ঝলকে ঝলকে ওদের মুঠো ভরে ফসল দেবে। আরও দু-একটা জাহাজ কিনবে ওরা, পুজোর মরসুমে টাউন বন্ধ হয়ে গেলে ঘরগুলি সারাবে নিজেরাই। এতখানি ফাঁকা জমি—সব, সব ওদের। আবার কবে ওপার থেকে মানুষজন আসবে, পলিমাটির জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হবে, ততদিন পর্যন্ত ঝক্ঝকে নীল এই শীতের আকাশের নীচে ধোঁওয়া গন্ধ বিকেল গাঢ় হোক।

নৌকোর ঘাট পর্যন্ত কচিকাচাগুলো কোলাহল করতে করতে ওদের সঙ্গেই আসে, কথা শোনে না।

ওপারে যখন পৌঁছোলো, সন্ধের মুখে একে একে বাতি জ্বলে উঠেছে ঘাটের নৌকোয়, দোকানে, শহরের বাড়িঘরে। আজ রমজানের অন্য ট্রিপ হয়নি। ঘরে গিয়ে ফিরতেই ঘণ্টা দেড়েক সময় গেছে। তারপর আবার অতখানি জল পেরিয়ে ফেরা। তবু ও হাসিমুখেই বিদায় নেয় অনিমেষের কাছ থেকে। ঘাটের কাদা ভাঙ্তে ভাঙ্তেই অনিমেষকে চেপে ধরে সারাদিনের ক্ষিদে ও শীত।

মণ্ডপে গরম চা চলছে, তাঁর সঙ্গে খাস্তা কচুরি।

চিত্তরা হৈ হৈ করে অনিমেষকে ডাকে। কোথায় ছিলি বল্ তো, দুপুর থেকে আমরা খুঁজে খুঁজে···ওভাবে কেউ যায়?

অচেনা জায়গা, এখানে রায়ট্ হয়ে গেছে ক'দিন আগে!

চিত্তদা বেশ চটেছে বোঝা যাচ্ছে অনিমেষ-এর ওপর। আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর চিত্তদা ওকে দিল্লির রাজেন চতুর্বেদীর কাছে নিয়ে যাবে বলেছিল। চিত্তদা ভালবাসে অনিমেষকে—অনেকদিন তো লিখছিস, এখনো যদি কিছু না হয়, আর কবে হবে? চতুর্বেদীর ট্রাস্ট দ্বিভাষিক অনুবাদের জন্য বই সিলেক্ট করে, ওর চোখে লেগে গেলে এদিকে দিল্লি, ওদিকে সাউথ, দুদিকে ছড়াতে পারবি। দেখি, বই আছে তো সঙ্গে? তিনটে বই সঙ্গে ছিল। অনিমেষের নতুন কবিতা সঙ্কলন, অঘ্রাণের স্বর। একটা দিয়েছে ধ্রুবদাকে, একটা হায়দরাবাদের প্রবীণ ডেলিগেট শরৎ দেবকে, কবিতা ভালোবাসেন বলেছিলেন। একটা মাত্র বই। ওটা চতুর্বেদীকে দিবি, ওঁর নাম লেখ ইংরেজিতে, দূর্ ওখানে না, উৎসর্গ-পৃষ্ঠায়। এখনও বই দিতেই শিখলি না।

যখন যাবো, তখন নাম লিখলেই হবে তো?

অনিমেষ বইটা কাঁধের ঝোলায় ভরে নিয়েছিল গতকাল। ঘরভর্তি অনুরাগী-রাগিনীদের মধ্যে রামের নেশায় গাঢ় চতুর্বেদীর পায়ের কাছেই

একটু জায়গা ছিল কেবল। ওখানে বসা যায় নাকি? মুখের কাছে গ্লাস ধরেছিল একজন অনতিতরুণ কবি। এত ভীড় যে চিত্তদা ওঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিলেন, আমরা কাল আসবো। দিস্ ইজ অনিমেষ রায়, এ ভেরি ব্রাইট বেঙ্গলী পোয়েট।

কাল রাত্রিবেলা শোবার সময় ঘরে ঢুকে দেখেছিল, মশারী টানটান, টিপয়ে খাবার জল ঢাকা দেওয়া। যথারীতি কাচা জামাকাপড় টেবিলে ভাঁজ-করা। হাসনু সব কিছু সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

জামাকাপড় বদলানোর জন্য দরজা বন্ধ করার একটু আগে জ্যোৎস্না এল।

মা শুয়ে পড়েছেন। আজকে আপনাদের খাওয়ায় কি ছিল? ইলিশ দেয়নি? ব্রহ্মপুত্রের ইলিশ খুব ভালো। ওকে কি রমজানের বাড়ী যাওয়ার কথা বলবে আজ অনিমেষ? আরও দু'একটা কথার পর জ্যোৎস্না উঠল।

আপনি শুয়ে পড়ুন। পরশু ভোরে যাবেন তো। রাত হ'ল। দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়েও ফিরে চলে এসেছিল আবার। তখনই অনিমেষ বুঝেছিল হাসনু ধারে-কাছেই আছে, যায়নি। জ্যোৎস্না একটু লজ্জা-লজ্জা হেসে বলল।

এই আমার বোন কি বলে দেখুন!

কি বলছে হাসনু?

ও আপনার কবিতার বই চায় একটা। দেবেন? কাল রাতেও অনিমেষ জানত পরের দিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর চতুর্বেদীজীর কাছে নিয়ে যাবে চিত্তদা। কাজেই অপ্রতিভ। আচ্ছা কলকাতায় গিয়ে পাঠিয়ে দেব, এখন তো নেই আর সঙ্গে। একটু হেসে চলে গেছিল হাস্নুহানা ওর দিদির সঙ্গে।

আজ অনিমেষ সকাল থেকেই বিপথগামী হয়েছে। গৌরীপুর যাবার জন্য গাড়ীতে জায়গা পায়নি। দুপুরে একসঙ্গে খায়নি। যখন চতুর্বেদীর পায়ের কাছে বসে তাঁকে নিজের বই উপহার দেবার কথা, তখন অনিমেষ রমজান মিয়াঁর ঘরে বসে মুরগীর আণ্ডা খাচ্ছে। জ্যোৎস্নার মা, জ্যোৎস্না শুনলেই চম্‌কাবে। চিত্তদা-সুমিতাদিও কেমন নাকে কাপড় দেবার মতন চোখ করেছিল।

জিনিসপত্র দ্রুত হাতে গুছিয়ে নিচ্ছিল অনিমেষ।

সমাপন উৎসবেই বোধহয় গেছিল এ-বাড়ীর সবাই, এখনো ফেরেনি। কাজের মেয়েটি দরজা খুলে দিয়ে ফিরে গেছে।

সকাল সাড়ে আটটায় বাস আসবে। এক্কেবারে রেডি থাকতে হবে। স্টেশন ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। সবাইকে টাউনে তুলে নিতে নিতে যাওয়া।

বালিশে মাথা রেখে অনিমেষ ভাবল, অরক্ষিতা নারী ও আগ্রাসন এই নিয়ে একেবারে পুণ্যবর্মন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত লম্বা একটা লেখা দাঁড় করানো যায়। আগে রাজার সৈন্য যেত। লুণ্ঠনের উপজীব্য ছিল ধনসম্পদ ও নারী। বিদেশী সৈন্যর হাত থেকে ঘরের পর্দা বাঁচানোর নামে নারী পায়ে

শেকল পরেছে, মাথায় ঘোমটা, বোরখা ইত্যাদি, তবু শেষরক্ষা হয়নি। স্বাধীনতার পর এসেছে রাজনৈতিক বিবাদ, সংঘর্ষ, দাঙ্গা, প্যারামিলিটারি ফোর্স। শেষ চ্যাপ্টারে থাকবে হাসনুর মা। হাসনু আর রমজানে বন্ধুত্ব করিয়ে দেবে কাল এক সময়। রাখি-ফাকি বাঁধা হবে হাতে। বাইরে আগুন, বোমার শব্দ, চীৎকার, কেউ জল চাইছে, দ্রুত পায়ে নিচু শব্দে এসে কোলাপসিবল্-এর ফাঁক দিয়ে গ্লাস গলিয়ে দিচ্ছে হাসনু…

কপালে রোদ। ভোর। সেই সঙ্গে দরজায় মৃদু হাতের টোকা। ইস্, সাতটা বেজে গেছে! ভাগ্যিস গতকাল সব কিছু গুছিয়ে রেখেছিল অনিমেষ!

হাসনুর মা, জ্যোৎস্না, নতুন বউ বার বার উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। হাসনুর মা অনেকক্ষণ বসলেন, গল্প করলেন।

হাসনু আসছে না। আটটা কুড়ি। বাস আসার সময়ে সেই আশঙ্কা, যা অনিমেষের মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, ভয়ে পরিণত হয়। চুল চুড়ো করে বাঁধা, গাছকোমর হাসনু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে, আপনি না খেয়ে যাবেন না। আমি লুচি ভেজেছি। শরৎ-সাহিত্যে বাঙালী রমণী। গরম লুচি দিয়ে ততোধিক গরম বেগুনভাজাকে জড়িয়ে ধরে মুখে গোঁজা। তিনটে খেয়ে হাঁফাচ্ছে, এমন সময় নীচে ক্লীনারের চীৎকার, বাসের হর্ন—কই আসুন! বড় বাস, গলিতে ঢুকবে না, মোড়ে যেতে হবে সুটকেস নিয়ে। খবর কাগজ পলিথিনে দ্রুত বাকি লুচিগুলোকে জড়িয়ে হাসনু নীচে নেমে যায়।

প্রাচীন বন্দর-শহরখানির কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তটি এইরকম ছিল অনিমেষ রায়ের ঃ

অনিমেষ আগে হাঁটছে, হাতে সুটকেস, কাঁধে ঝোলা।

পেছনে লুচির প্যাকেট ধরে হাসনু।

বাসে ওঠার আগের মুহূর্তে ক্লীনার সুটকেসটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, ওপরে রাখবে।

ড্রাইভারকে আত্মস্থ ডান হাত তুলে থামতে বলে অনিমেষ। তারপর ঝোলা থেকে 'অঘ্রাণের স্বর' বার করে উৎসর্গের পাতায় 'হাসনুহানা দেবীকে, আতিথ্যসুন্দর দিনগুলিতে' লিখে বইটা তুলে দেয় হাসনুকে। হাতে লুচির তেল, তাই হাসনু দ্রুত গাছকোমর খুলে আঁচলে বইটা নেয়, যেন শিউলি অথবা গন্ধরাজ নিচ্ছে একরাশ। অনিমেষের সারা শরীরে শিহরণ বয়ে যায়। বুঝিবা সে নিজেই একটি ফুলে ভরা গাছ।

ঠোঁট দুটি না খুলেই, কেবল চোখ দুটি দিয়ে হাসনু বলে, আবার আসবেন।

এরপর সার্কিট হাউসে বাকিদের নিতে গেলে চিত্তদা স্নেহমাখা স্বরে ওকে ডাকেন, আয়, গাড়োল!

ল্যাণ্ডিং-এ সামান্য দম নিয়ে সিঁড়িটা ধীরে ধীরে দোতলায় উঠে গেছে। কাঠের সিঁড়ি, তীব্র লাল কার্পেটে মোড়া। পুরনো, পালিশ করা মেহগনির রেলিং।

রাঙা ও খয়েরির সেই সিম্ফনির শেষে ছেলেটা সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে। দু' হাত পকেটে। প্রস্তুত হয়ে যেন রুক্মিণীর জন্যই অপেক্ষা করছিল।

কাঠ ও পাথরে তৈরি এই প্রাচীন বাড়িটার নীচের তলায় ডাইনিং হল, বিলিয়ার্ড রুম, লাউঞ্জ। এ ছাড়া চারটে বড় ঘর। চোদ্দজন ট্রেনির আটজনই নীচে থাকে, দোতলায় রুক্মিণী, অমৃতা কাপুর, প্রিয়া দেশমুখ আর তিনটে ছেলে। এই মুহূর্তে রুক্মিণী ছাড়া অন্য সবাই নীচে বসে গল্পগুজব করছে, কিংবা গান শুনছে। ছেলেটা, মানে, নওরোজ কি রুক্মিণীর পায়ের শব্দও চেনে?

একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে, একটা হাত পকেট থেকে দ্রুত বার করে রুকুর রাস্তা আটকে দিয়েছে।

আজ ভীষণ শীত, না?

রুক্মিণী গম্ভীরভাবে বলল, পথ ছাড়ো।

না, ছাড়ব না। আমার ঠোঁট দুটো জমে যাচ্ছে। একটু গরম করে দেবে?

মাথাটা একটু কি টলে গেছিল রুকুর! অপমানে গাল দুটো ফেটে আগুন বেরোচ্ছে। ওর ডান হাতটা চকিতে উঠে এসেছিল, কিন্তু লক্ষ্যস্থানে পৌঁছবার আগেই বজ্রমুঠিতে ধরা পড়ে ছটফট করছে বাইশ বছরের ক্ষীণ মণিবন্ধ।

হাত ছাড়ো!

চেঁচায়নি, তাহলে অন্যরা ছুটে আসবে। মৃদু কণ্ঠেই বলেছে রুক্মিণী।

নওরোজের পদ্মপলাশ চোখে অবুঝ রাগ, গ্রিসিয়ান নাকে, চিবুকের ভাস্কর্যে গাঢ় অভিমান। লাহুল উপত্যকার ছেলে রুকুর হাতটা যেন একরকম ছুঁড়েই ছেড়ে দিল।

আমাকে বিশ্বাস করতে পার না, না! বুঝতে পার না, তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি বলেই আমি এত হেল্পলেস! কেমন মেয়ে তুমি?

রুকুর কানে নিজের হৃৎশব্দ কিছুতেই মেলাচ্ছে না। ও আর পিছন ফিরে তাকায়নি। আহত মণিবন্ধ অন্য হাতে চেপে ধরে আছে। নিজের ঘরে ঢুকে বালিশে মুখ গুঁজে তবে স্বস্তি।

আসার পরের দিন থেকেই ছেলেটা ভীষণ জ্বালাচ্ছে রুকুকে। দূরে বসে একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, ম্যাল-এর পথে নিঃশব্দে পিছনে

আসা, ডিনারের পর সবাই ওপরে চলে গেলে বিষণ্ণ মুখে একা একা গান শোনা। মাঝে মাঝে কোটের পকেটে চিরকুট রেখে দেবে।

বাইরের র‍্যাকে কোট, টুপি সব রেখে লাউঞ্জে ঢোকে ওরা। সেই ফাঁকে চিরকুট রেখে যায় বোধহয়। একমাস হতে চলল, দিনে-রাতে সব সময় এই একই আকুতি, কথায় অথবা চুপ করে থাকায়—ভীষণ, ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি তোমাকে রুক্মিণী, আর থাকতে পারছি না, প্লিজ বিশ্বাস করো। কী যে করে রুকু! ওকে সব সময় ঘিরে আছে আনন্দ মেশা এক ভয়ের শিহরণ, ওর দিকে আগুন এগিয়ে আসছে, কিন্তু পালাতে ইচ্ছে করছে না রুক্মিণীর।

আজ রবিবারের শান্ত সকালে অথৈ নীলিমার মধ্যে বসে চারদিন আগেকার সন্ধেটা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে রুকুর। সেদিন বিকেলেই আবার প্রথম তুষারপাত দেখেছিল ও। আর সন্ধেরাতে আগুনে ছ্যাঁকা খেয়েছিল। সব মিলিয়ে দিনটা কখনও হারাবে না ওর জীবন থেকে।

গাঢ় সবুজ মখমলের শেষে পাথর ও কাঠে তৈরি এই পুরনো বাড়ীটা দীর্ঘ কাঁচে ঘেরা, তারই লাউঞ্জে বসে সেদিন রুকুরা ক্লাস করছিল। এমনিতে ওদের ক্লাস হয় এই কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে অন্য একটা দোতলা বাড়িতে। সেদিন অধ্যাপকের নিজেরই আলসেমি লাগছিল। লাঞ্চ-এর পর কেউ বেরোয়নি। ইলেকট্রিক হিটার লাগানো হয়েছে দুটো। তা ছাড়া ফায়ার প্লেস-এ গনগন করে জ্বলছে কাঠের আগুন। ওরা জনা পনেরো, প্রফেসর গুপ্তাকে নিয়ে। শীত বাড়ছে। রক্তের মধ্যে যেন অনুভব করা যাচ্ছিল তাপমানের দ্রুত অবতরণ।

হঠাৎ কাঁধে টোকা দিল কেউ। রুকুর পাশে বসা চণ্ডীগড়ের ছেলে সুখদীপ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছিল, দ্যাখো দ্যাখো, বরফ পড়ছে।

হ্যাঁ, সেই তো প্রথম বরফ দেখেছিল কলকাতার মেয়ে, মুগ্ধ হয়ে। দেখেছিল, মলিন মেঘ-মেঘ আকাশের গভীর থেকে মোৎজার্টের সঙ্গীতের অমোঘ ব্যঞ্জনার মতন নেমে আসছে অসংখ্য স্নো-ফ্লেক্স। দেখতে দেখতে লনের গাঢ় সবুজ ঢেকে গেল পাতলা বরফে। প্রাচীন বাড়িটার কাঁধে ও কার্নিসে বরফের চূর্ণ, পাহাড়ি দেবদারুর ডানার ঝালরে সাদা বরফ। ক্লাস শেষ হলে কিছুক্ষণ লাউঞ্জে বসে গান শোনা গেল। অমৃতা আর সুখদীপ ওইটুকু জায়গাতেই ভাংড়া নেচে দেখাবে। ওদেরও টানছে। মিজোরামের লালসাওয়া একটা রঙিন ছাতা নিয়ে দু পাক নেচে নিল। টানা ডাইনিং টেবিলে সকলে মিলে একসঙ্গে গরম সুপে চুমুক। চিয়ার্স! টু দ্য ইয়ার্স ফার্স্ট স্নো-ফল।

এই কলরবের মধ্যেই রুকু বুঝতে পেরেছিল, একজন ওই টেবিলে নেই—নওরোজ।

কোনওমতে ডিনার সেরে ঘরের দিকে দৌড়েছিল রুক্মিণী। পিঠের ওপর শীতার্ত খোলা চুল।

দস্তানা পরার অভ্যেস হচ্ছে না কিছুতেই, বার বার হাতে হাত ঘষতে হয় উষ্ণতা ফিরিয়ে আনতে। দোতলার সিঁড়ির মুখে পৌঁছতেই সেই আগুনের

ফুলকি ওর পথ আটকেছিল নওরোজ।

কব্জিটা হঠাৎ একটু ব্যথা-ব্যথা করে উঠল আবার। কোলের ওপর স্কেচবুক আর প্যাস্টেল রং নিয়ে রুকু এখন আনমনে খেলা করছে। ভাবছে, খুব আলতো করেই ভাবছে, কী করে দূর পাহাড়ের ঢাল ও বাঁকগুলিকে ধরবে, সামনের ওই গোলাপি চেরি-মঞ্জরীগুলিকে। গভীর নীল আকাশ ওর ওপর স্নেহভরে ঝুঁকে আছে, সত্যিই যেন নীলিমার ঘ্রাণ রুক্মিণীর শরীরে। দূরের বরফঢাকা চূড়াগুলি থেকেই যেন শীতের ঝাপট হঠাৎ ওকে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। সাড়ে দশটা নাগাদ নীল রঙের খুদে ট্রেনটা তীক্ষ্ম শিস দিয়ে পাইন বনের পর্দার পিছনে দেখা দিল। তার ইঞ্জিনের ধোঁয়া জড়াতে চাইছে দেবদারুর শিখরে। পারল না। ধোঁয়াগুলি ভেঙেচুরে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল শেষপর্যন্ত।

ট্রেনটার দিকে তাকালেই রুকুর মনে পড়ে যায় সেই দিনটার কথা, একমাস আগে যেদিন প্রথম ও দুদিনের সফর পেরিয়ে এখানকার ছোট্ট পাহাড়ি স্টেশনটায় এসে নেমেছিল। ভাবলেই একরাশ মন-কেমন-করা ওকে কলকাতার দিকে টানে। আর সেই সঙ্গে শীতভাবের মতন একটুখানি ভয়-মেশা আনন্দ রুক্মিণীর বুকের মধ্যে শিরশিরিয়ে ওঠে। ওই এসে পৌঁছনোর দিনটা কি ওর জীবনকে বদলে দেবে একেবারে?

এখন শীতের হাওয়া নিজের ভাষায় আদর করে যাচ্ছে রুকুকে। চাঁপা-গৌর ওর দুই গালে এই ক'দিনেই গোলাপি আভা ফুটেছে। ঠোঁট দুটি আরও রক্তিম হয়ে উঠেছে। পুলোভারের ওপর শালেও শীত মানাচ্ছে না, আঙুল-গুলি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তসরের স্কার্ফের নীচে ছটফট করে কপালে এসে পড়ছে দুরন্ত চুল। নাঃ, কিচ্ছু হচ্ছে না ছবিটা! রুকুর চোখে জল এসে পড়ছে। পাহাড়টা কেমন যেন জরদ্গব হয়ে গেছে ওর স্কেচবুকে, আকাশের নীলটা রক্তহীন, ফ্যাকাসে, চেরিগুলো কথা বলছে না। এই যে দৃশ্যপট ওকে মায়াভরে ঘিরে আছে, সে-ই কেমন ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সবাই কি ছবি আঁকতে পারে নাকি?

রাগ করে রুকু উঠে পড়ল।

পায়ের নীচে একরাশ হলুদ পাতা মাড়িয়ে দ্রুত ওপরে উঠতে লাগল রুক্মিণী। পাহাড়ের ঢাল কেটে বানানো পাথুরে সিঁড়ি। গত পরশুও এই সিঁড়িতে পাতলা বরফ জমেছিল, পা টিপে টিপে উঠেছে। যাতে হঠাৎ পা না পিছলে যায়। সিঁড়ি ফুরোলে গাঢ় সবুজ মখমলের মতন লন। প্রাচীন এই অরণ্য-পর্বত-ঘেরা বাড়িতে স্বাধীনতার আগে থাকতেন ভাইসরয়ের ফাইনান্স-মেম্বার। নানা রাজ্য থেকে এসে ওরা চোদ্দজন একবছর ট্রেনিং নেবে এখানে, ভবিষ্যৎ নিয়ে কত জল্পনা কত ভাবনা। কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল। আসতে না আসতেই পাহাড়ি হাওয়ার ঝাপট।

আজ ভোর থেকেই রুকুর মনটা নানা কারণে ভার। বাড়িতে ট্রাংকল

করেছিল। মায়ের জ্বর। মা তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।

রাঙাদি ফোন ধরেছিল। আর দীপু খানিকটা বকবক করেছে, রুকুর ছোট ভাই।

কিন্তু কথা বলতে বলতেই আচমকা লাইনটা কেটে গেছে, মন ভরেনি।

নওরোজের জন্যও রুক্মিণীর মনের একটা পাশ বিষণ্ণ, আর্ত হয়ে আছে। কত চেষ্টা করছে, কই রাগ তো করতে পারছে না! ছেলেটা গত তিনদিন কোথায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, কী করছে রুকু জানে না। পুলোভারের দুই পকেটে রং, হাতে স্কেচবুক রুকু কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। লাউঞ্জটা এখন কেমন সুন্দর উষ্ণ, ফায়ারপ্লেসটা ভোর থেকে জ্বলছে বলে। একটা সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে তামিলনাড়ুর বালকৃষ্ণণ শুভলক্ষ্মী শুনছে চোখ বন্ধ করে। মাথার কাছে পলিথিন ব্যাগে নতুন বুট জুতো। জুতোজোড়া ক্ষয়ে যাবে এই ভয়ে কৃষ্ণণ চান্স পেলেই পা থেকে খুলে রাখে। রুকুর পায়ের শব্দে চোখ খুলে অল্প হাসল ছেলেটা।

গত তিনদিন নওরোজ প্রায় অদৃশ্য, ডাইনিং হলেও দেখা যায় না। বেশ কয়েকটা ক্লাসও মিস করেছে। ভিতরে ভিতরে কী যে ওকে কষ্ট দিচ্ছে ক্রমাগত। অথচ এই নওরোজই কেমন নিরীহ ভালমানুষের মতন স্টেশনে নিতে এসেছিল রুক্মিণীকে। অ্যাকাডেমির ডাইরেক্টর নিজেই নওরোজকে পাঠিয়েছিলেন উদ্যোগী হয়ে। কারণ নওরোজ হিমাচলেরই ছেলে। আগে এসে পৌঁচেছে। যে আগে এসেছে, সে অন্যদের রিসিভ করবে, এটাই এখানকার প্রথা। দুদিন সফরের শেষে রুকু তখন ক্লান্ত। চুলে, হাতে, মুখে কয়লার ধুলো। কলকাতা থেকে দিল্লি। দিল্লি থেকে রাতের ট্রেনে কালকা। সেখান থেকে নীলরঙের খুদে ট্রেনটা রুক্মিণীকে নিয়ে এসেছে রোদজ্বলা সবুজের মধ্যে দিয়ে, পাহাড়ের নানা বাঁক ঘুরে। অনেকগুলি সুড়ঙ্গ পড়েছে পথে। সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আরও গভীর হয়ে বেজে ওঠে চাকার ঝমঝম। শেষে উল্টোদিকের মুখে হঠাৎ আলো এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে যায়। সেদিন স্টেশনে হ্যাণ্ডশেক করার জন্য শান্ত, নির্মল হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল নওরোজ। ভাস্কর্যের মতন নিখুঁত ওর কপাল, নাক, ঠোঁট বিস্মিত করেছিল রুক্মিণীকে। নওরোজ কিন্তু কোনও কথাই বলেনি আর। এক হাতে বড় সুটকেস আর অন্য হাতে রুকুর ব্যাগটা অনায়াসে তুলে নিয়ে আগে আগে হাঁটতে শুরু করেছিল, কোনও আপত্তি শোনেনি। দেবদারু ও পাইনের ছায়া-সুগন্ধে-আচ্ছন্ন পায়ে-চলা-পথ ধরে চলতে চলতে রুকু বুঝতে পেরেছিল, এই উপত্যকার পাখিগুলির পরস্পরের মধ্যে কেমন সুন্দর বোঝাবুঝি। এ থামল তো ও ডেকে উঠল।

ঘটনার সূত্রপাত দ্বিতীয় দিনে। তখনও অধিকাংশ ট্রেনি এসে পৌঁছয়নি। প্রাচীন বাড়িটা প্রায় ফাঁকা। রুকুর বিরক্ত ও বিষণ্ণ লাগছিল একা ঘরে বসে।

সুনসান ছাতের রোদ্দুরে ঘুরে ও বিলিয়ার্ড রুমে এসে বসেছিল। সুখদীপ আর নওরোজ বিলিয়ার্ড খেলছিল। একটু পরে সুখদীপ বেরিয়ে গেল, কুক হরিরামকে তিনকাপ কফির কথা বলতে। নওরোজ একমনে একাই খেলে যাচ্ছে। ছাত থেকে নেমে আসা ঝুলন্ত আলোটা বিলিয়ার্ড টেবিলের সবুজ জমিকে স্বর্গীয় এক আভা দিয়েছে। 'কিউ'টা এই মুহূর্তে একটা সাদা বলকে ছুঁয়ে আছে, নওরোজের তীক্ষ্ন চোখ লাল বলের ওপর, হঠাৎ মৃদু গলায় টেবিলের দিকে তাকিয়ে ও বলে উঠল, পাগল করে দিয়েছ তুমি আমায়!

রুকু একেবারে চমকে উঠেছিল।

ঘরে আর কেউ নেই তো? কাকে বলছে নওরোজ? কে কাকে পাগল করে দিয়েছে?

কিছু বুঝে ওঠার আগেই টেবিলের কোণ ঘুরে ওর খুব কাছে চলে এসেছে নওরোজ। পাশের চেয়ারে বসে রুকুর মুখের ওপর বিশাল দুই চোখের বিষণ্নতা রেখে বলেছে, প্রমিস! মিথ্যে কথা বলছি না। কী যে হয়েছে আমার! আমি সত্যিই ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি তোমাকে, রুক্মিণী—কী করে বোঝাব বল তো?

রুকু একেবারে আড়ষ্ট। কোনও মতে, ক্ষমা চেয়ে বিলিয়ার্ড রুম থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, এই মাত্র। সুখদীপের হাতে ট্রেতে কফি। সুখদীপ চেঁচামেচি করে রুকুকে কফি খাইয়েছিল। রুকুর বোধবুদ্ধি একেবারে ভোঁতা তখনও। এমন আকস্মিক, অকপট প্রেম নিবেদন, তাও আবার প্রায় অপরিচিত এক ভিনদেশি ছেলের মুখে—রুকুর কল্পনার একেবারে অতীত এ জিনিস। কলকাতায় য়ুনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ছেলেদের সঙ্গে মেলামিশি—সে ছিল একেবারে সহজ। কদাচিৎ কেউ বলেছে, বাঃ, আজ তোকে দারুণ দেখাচ্ছে রে! কিংবা ভিড় বাসে পিছন থেকে ঠেলেঠুলে কেউ অপ্রত্যাশিত পাশে এসে বসল। বৌধায়ন একবার প্রচুর মদ খেয়ে রুকুর হাত ধরে ঘ্যানঘ্যান করে ক্ষমা চেয়েছিল, এইটুকুই।

একেবারে পিছনটায় ভলিবল কোর্ট, টেনিস কোর্ট—ছোট একটা পাথরের সিঁড়ি সেখান থেকে আবার নীচের পাহাড়ে নেমে গেছে। বাড়ি, ঘাসের গালিচা. কোর্ট সবই পাহাড়ের নানা স্তর ও তলে তৈরি করা হয়েছে সুনিপুণ যত্নে। বোগেনভিলিয়ার এক গাছ আবিরের মতন অজস্র ফুল বিছিয়ে দিয়েছে নিজের ছায়ায়। সেখানে একটা পাথরের ওপর চুপ করে বসে আছে নওরোজ। আড়বাঁশিটি পাশে শোওয়ানো। গায়ের সাদা পশমের চাদর পাথরের ওপর উপচে পড়ে আছে। কোঁকড়া চুলে চিরুনি পড়েনি। গালে না-কামানো দাড়ির কালচে আভা। মুখখানা যেন এই কদিনেই শীর্ণ হয়ে গেছে।

ঈষৎ ফেরানো ওই মুখ, দীর্ঘ পথের ছায়ায় ব্যথাতুর দুটি চোখ যেন সবলে রুকুর সমস্ত সংযম ভেঙে চুরমার করে দিল।

নীচের ঝরা ফুল ও হলুদ পাতার ওপর হাঁটু গেড়ে বসে রুক্মিণী

নিজেরই অজান্তে কখন মাথা রেখেছে নওরোজের কোলের ওপর।

এই মুহূর্তে ওদের দুজনেরই চোখে জল, নওরোজের দুটি হাত রুকুর খোলা চুলে।

কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, কেন এমন করছ তুমি নওরোজ ?

আমার কষ্ট দেখতে পাচ্ছ না ? এখানে কেন এলে রুকু ? সব যে ভেঙে-চুরে গেল !

ওর শেষ কথাটায় কী যেন ছিল। রুক্মিণী মুখ তুলল।—আর কাউকে ভাববাস না তো ? দু' হাতের পাতায় রুকুর মুখ। নওরোজ জিজ্ঞাসা করেছে।

রুকু আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল, নাঃ।

এই মুহূর্তে ওর মনের কাছাকাছি, আত্মার একান্তে আর তো কেউ নেই একজন ছাড়া।

তবুও প্রশ্নটা নওরোজকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে হল ওর।

তুমি ভালবাসনি কাউকে ?

নওরোজ স্তব্ধ।

কথা বলো, নওরোজ !

নওরোজ স্তব্ধ, কেবল চোখ দুটি অব্যক্ত উচ্চারণে আর্দ্র হয়ে উঠেছে। পাইন অরণ্যের ঝাপসা সবুজের পিছনে দিগন্তলীন পাহাড়শ্রেণী। ওই দিকে তাকিয়ে লাহুলের যুবক ভাবছে নিজের শৈশব-কৈশোরের কথা।

গদ্দী উপজাতি হাজার হাজার ভেড়ার পাল চরাতে নিয়ে চলে যায় পর্বতসানু থেকে তৃণভূমি। সারা শীত তারা ঘরছাড়া। সমতলের ঘন ঘাসের জমি, উত্তাপ তাদের ডাকে। নওরোজের বাপ-জ্যাঠারা কাঁধে নিত গুলিভরা বন্দুক, সঙ্গে লোমশ শিকারি কুকুর। ওই দলে ছোট্ট এক দেবশিশু একবার রাতের বেলা ঝুপড়িতে বই-পড়তে বসেছিল। জ্যাঠা এক থাপ্পড় মেরে ফুঁ দিয়ে দীপ নিভিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল, আর যদি কখনও দেখি, মেরে হাড় ভেঙে দেব !

গ্রীষ্মে ঘরে ফিরে মায়ের কোলে মুখ রেখে কেঁদেছিল বালক নওরোজ। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।—মা, আমাকে তোমার কাছে রেখে দাও। আমি স্কুলে পড়ব।

রুগ্ণ মার কথা ঠেলতে পারেনি নওরোজের রাগী বাপও। মার কাছে থাকবে, এই জন্য পরের বার ওকে ছেড়েই বেরিয়ে পড়ল ভেড়ার পাল নিয়ে।

জানুয়ারির এক বিকেলে, বরফ পড়ছে, আট কিলোমিটার দূর স্কুল থেকে ছুটতে ছুটতে বাড়ি আসছে নওরোজ। ন' বছরের ছেলে। স্কুলেই মনে পড়ে গেছে, আজ যে ওর জন্মদিন—মা-কে বলতে হবে, মা সুজির পায়েস করতে বলবে জেঠিকে।

ফিরে দেখেছিল, ঠাণ্ডা কনকনে দেওয়ালের পাশে আগুনের মালসা। হাত দুটি দু পাশে, চোখ বোজা, মা চলে গেছে ঘুমের মধ্যে। জেঠি গরুর জাবনা

দিচ্ছে গোয়ালে, পাশে কেউ নেই।

রুকু, আমি ওই দিনটা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

ওই দিন থেকেই ঠিক হয়েছে, এ জীবনে কোনও কিছুই পুরোপুরি পাওয়া হবে না আমার। নইলে তোমার সঙ্গে এতদিন দেখা হল না কেন?

জানো, গত বছর চণ্ডীগড় য়ুনিভার্সিটি এম-এ-র রেজাল্টের জন্য সোনার মেডেল দিল। আমি স্টেজে দাঁড়িয়েও ভাবছি, জ্যাঠার সেই এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিয়ে দেওয়া, আর জন্মদিনের বিকেলে বাড়ি ফিরে এসে মায়ের শব সৎকারের উদ্যোগ। আমার জীবনটাই এ রকম।

হ্যাঁ, আমি একজনকে কথা দিয়েছি। একজন চেয়েছিল আমায়। আমিও তো ভালবেসেছি তাকে। জেঠিমার সইয়ের মেয়ে। জম্মুর সীমান্তে ফুলপুরে থাকে সোনাল আর ওর মা। সোনালের বাবা নেই। ওরা আবার ব্রাহ্মণ। আমাব মতন অজাতের ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা করার অপরাধে সোনালের মা একঘরে হয়ে গেছে। গ্রাম ছেড়ে ফুলপুরে চাকরি নিয়েছে গ্রামসেবিকার। সব ঠিকঠাক ছিল—কথা ছিল, সামনের এপ্রিলে ওদের এখানে আনব। সোনালকে বিয়ে করব।···তোমাকে দেখে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে রুকু। আমি কিছুতেই আর অতীতে ফিরতে পারছি না। কী করব?

সাদা কালো একটা ছবি। গ্রামের কোনও স্টুডিওতে তোলা। দু' পাশে ঋজু দুই বিনুনী, সবুজ পাতার মতন এক তরুণী, গভীর কালো দু' চোখ—সোনাল। পাথরটার ওপর রাখা ওই ছবিটা, চিঠির খাম। সোনাল পথ চেয়ে আছে। নওরোজ কথা দিয়ে এসেছে। রুক্মিণীর চোখের সামনে দুলে ওঠে দূর পাহাড়, আকাশের রং ঝাপসা হয়ে একখানি গোলাপি ওড়না হয়ে যায়, মাটিতে ঝরা আবির ফুলের রাশ।

মা মারা যাবার পর জেঠিই বুকে তুলে নিয়েছিল নওরোজকে। পরের বাড়ি দুধ বেচে, বিচালি কেটে, জ্যাঠার দেওয়া হাতখরচের টাকা নিঃশব্দে সরিয়ে নানাবিধ উপায়ে ওর পড়ার খরচ চালাত।—'তোর মা চেয়েছিল তুই পড়ালিখা আদমি বনবি। আমাকে মরার দিনও বলে গেছে। তুই আর চরাগাহ্ যাস না নওরোজ।' জেঠি যদি না থাকত, আজ নওরোজ বন্দুক কাঁধে আর এক বংশানুক্রমিক মেষপালকে পরিণত হত।

সেই জেঠির সঙ্গে সই পাতিয়েছিল সোনালের মা। সেই সূত্রেই সোনালদের বাড়ি যাতায়াত করত নওরোজ। বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সোনালের বিধবা মা নিজেই। তক্ষুনি খেপে উঠে জেগে বসল সমাজ। নওরোজ নিজের পায়ে দাঁড়ায়নি তখনও। গ্রাম ছাড়তে হল মা-মেয়েকে।

নওরোজ, কথা রাখতেই হবে তোমাকেও—আমি ভাঙতে দেবো না।

রুক্মিণী বিশ্বাস করো, তোমাকে দেখার পর থেকে সব কেমন ঝাপসা হয়ে গেছে। ওই আমাদের গ্রাম, সোনাল আমার অতীত। আমি চিনেছি

তোমাকে। এ জন্মে হয়তো এর আগে দেখা হয়নি, কিন্তু তার আগে? তোমাকে আমি সমস্ত কিছুর মূল্যে চাইছি রোজ, রাতদিন—গত এক মাস ধরে। প্লিজ, আমাকে ফেরাবে না বলো!

নিজের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে গিয়ে কথা রাখতে বলছ আমাকে?

নওরোজ আর্তের মতন রুক্মিণীর একটা হাত ধরেছে, তুমি পূর্বজন্মে বিশ্বাস করো না? বলো আমাকে রুকু! হাতটা গলে যাচ্ছে নওরোজের আঙুলের চাপে।

করি তো। মৃদু হেসে রুক্মিণী উঠে দাঁড়ায়, নওরোজের এলোমেলো চুলে বিলি কেটে দিয়ে।—আমি গতজন্ম এজন্ম, আগামী জন্ম—সব কিছু মানি।

নওরোজ আনমনা ছিল, লক্ষ করেনি। এক ফাঁকে সোনালের চিঠি ও ছবি চালান হয়ে গেছে রুকুর বুকের মধ্যে।

অদ্ভুত দিনটা। রবিবারের সকাল শেষ হয়ে ঝিম-ধরা-দুপুর নেমেছে। নীল টয় ট্রেনটা ঝিকঝিক করে কালকা অভিমুখে চলেছে আবার। আকাশে ভেসে আছে একটা মাত্র চিল।

শীত গিয়ে বসন্ত আসে একদিন। একসময় বসন্তেরও যাবার সময় হয়ে আসে। পাহাড়ের দেশে বাতাস এখনও স্নিগ্ধ শীতল। আকাশ আজও ঝকঝকে মরকতলীন। কেবল নানা রঙের ফুলগুলি হাত নাড়তে নাড়তে চলে যাচ্ছে। বেশ রাত। পায়ে চলা পথটা ধরে জ্যোৎস্না মেখে বড় রাস্তায় উঠে এসেছে রুক্মিণী আর নওরোজ। চতুর্দশীর চাঁদের আলো পৃথিবীকে কেমন নীলাভ এক রহস্য বলয়ে ঘিরে রেখেছে। দূর পর্বতশ্রেণীর কোলে বরফ গলেছে। এখন পাখিরা উত্তর থেকে উঠে আসবে বাসা বাঁধতে, ঠোঁটে খড়কুটো। দেবদারুর উঁচু ডাল থেকে ভীতু একটা উড়ন্ত কাঠবিড়াল ঝটপট করে চলে গেল অন্য গাছে।

একটু দূরে ছোট্ট স্টেশনটা, তার হলদে বোর্ড। একদিন ওখানে নওরোজ এসেছিল রুক্মিণীকে নিতে। আজ ওদের শেষ নিভৃত আলাপচারিতা।

আগামী কাল ভোরের ট্রেনে এসে পৌঁছোবে সোনাল আর ওর মা। নওরোজ ওঁদের আনতে যাবে। থাকার ব্যবস্থা মোটামুটি হয়ে গেছে, বিয়ের সামান্য যা আয়োজন। আজ রুকু আর নওরোজ খুঁটিনাটি বাজারও শেষ করেছে। কনের জন্য পিওর সিল্কের শাড়ি, সবুজ কাঁচের চুড়ি, সিঁদুর। অবশ্য টাকার জোগাড় তেমন ছিল না নওরোজের।

রুকু বলল, লকেটের ডিজাইনটা তোমার পছন্দ হয়েছে তো? ওই একটাই তো সোনার জিনিস যা দিচ্ছ সোনালকে, এখানে কোনও ভ্যারাইটি নেই, কিছু মনে কোরো না। কলকাতা-দিল্লি হলে এই সোনাতেই—

নওরোজ হেসে বলে, ভীষণ জেদি আর একগুঁয়ে মেয়ে তুমি। ওদের এনেই ছাড়লে শেষে! কবে থেকে যে লুকিয়ে চিঠি লিখছ সোনালকে, জানতেই পারিনি, আমি তো হাঁদা একটা।

অপরিচ্ছন্ন, আঁকাবাঁকা হাতের লেখা। তবু ফুলপুরের সোনাল পরম বিশ্বাসে চিঠি দিত ওর 'দিদি' রুক্মিণীকে।

দিদি বলেছে ওদের বিয়ের সব ভার নেবে নিজে হাতে, কনে সাজানো থেকে শুরু করে। জ্বালামুখী দেবী কথা শুনেছেন এতদিনে। সোনালের প্রতীক্ষা শেষ হতে চলেছে এই বসন্তে।

নওরোজের হাতের মধ্যে রুক্মিণীর নরম মুঠি। নিজে তোমাকে যে কিছুই দিতে পারলাম না রুকু।

নওরোজের অধীর ওষ্ঠাধরের ওপর সুগন্ধি আঙুলগুলি রেখে রুক্মিণী বলে, দিলে তো! আজীবন বন্ধুত্ব।

রবিবারের সেই শীত-সকালে চৌরির মঞ্জরী আঁকতে পারেনি, আঁকতে পারেনি আকাশ। আজ রুকু পারবে।

চোখের জল কীভাবে জ্যোৎস্নায় মিশে একাকার হয়ে যায়, ও আজ আঁকতে পারবে বিনা রঙেই।

চোখ খুললাম। অন্ধকার। তাকিয়ে রইলাম। প্রথমটা মনে হয়েছিল জমাট অন্ধকার আমার কপাল, চোখের পাতা ছেড়ে নড়বে না। মিনিট খানেক পর অল্প, সামান্য একটু আবছা ভাব এল। মর্মর-পেয়ালায় অন্ধকারের ডিকক্‌শন, তাতে দু'এক ফোঁটা আলোর রং নিংড়ে দেওয়া হচ্ছে। আসলে আমি গম্বুজ-আকৃতি সুন্দর সিলিংটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। চোখের পাতা দুটো ভারী, একটু যেন ব্যথা। হাতড়াতে হাতড়াতে চোখ গম্বুজ থেকে খিলানে নামল। আরও নীচে। তারপর কুন্দশুভ্র পদ্মফুলের মতন একখানা মুখ অন্ধকারের বন্যার মধ্যে জেগে উঠে স্থির হল। ভেনাস অব্ মিলো। গতকাল রাতে এরই পায়ের তলায় শুয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাঁ হাতটা কাঁধ থেকেই ছিঁড়ে নিয়েছে সময়। ডান হাতটাও খণ্ডিত। কোমর থেকে স্খলিত বসনের ঢেউ একেবারে নীচে ঝাঁপিয়ে স্থির হয়েছে, ডান পায়ের পাতার অর্ধেক দেখা যাচ্ছে সেখানে। অস্ফুট ইচ্ছের মতন শিউরে ওঠা দুটি স্তন, বেপথু নাভিকমল। কাল রাতে অনেকক্ষণ ধরে একে দেখেছি। পুরুষ হলে কী হত জানি না, ভেনাসকে দেখে আমার বিষাদই জেগেছিল আগাগোড়া। ম্যাথিউ-এর লাইটারটা আমার জ্যাকেটের নীচের পকেটে ছিল। কখন যেন দুষ্টুমি করে ফেলে দিয়েছিল ওখানে। হঠাৎ হঠাৎ চমকে ওঠা আলোয় আমি ভেনাসকে দেখছিলাম রহস্যভরে। এক সময় পা দুটো ব্যথা করে এসেছিল, সারা দিনে কত মাইল যে হেঁটেছি! ক্লান্তি, খিদে। পকেটে একটা চকোলেট বার ছিল, আধ প্যাকেট সল্টেড পী-নাট্‌স্। জল নেই। গলার ভেতরটা জ্বালা করছে অল্প অল্প। তার পরেই, আচম্‌কা শীতভাবটা আঁকড়ে ধরল আমায়। প্রথমে মাথাটা, টুপি তো ছিলই না, ঘাড়ের পেছনটা, কোমরের কাছে। জ্যাকেটের চেন লাগিয়ে নিলাম। জীন্‌স্ পরা ছিল, জুতো মোজা—অথচ গতকালও আমি মোজা ছাড়া স্যাণ্ড্‌ল্ পরে টই টই করে ঘুরেছি। তসরের একটা স্কার্ফ পকেটে ছিল। সেটা ঘাড়ের তলায় দিয়ে আমি পাথরের মেঝেতে ভেনাসের পায়ের তলায় শুয়ে পড়লাম। ভাবিনি, ঘুম আসবে কখনো; অথচ দুলতে দুলতে ঘুম এল। ঘুমের মধ্যেই, স্বপ্নে আমাকে কাঁপাচ্ছিল ইংলিশ চ্যানেল পেরোনোর সময়কার খোলা ডেক্-এর কন্‌কনে হাওয়া। মাথার ওপর তারা ভরা রাত। অবচেতন বলছিল, সত্যিই কি এত শীত? ডোমিনিক্‌দের বাড়িতে রাতে হীটিং থাকে বলে বোঝা যায় না; এখানকার পাথরগুলি, তুমুল সব দেওয়াল অগস্টের মাঝরাতের সবটুকু হিম গায়ে মেখে ডাকাতের মতো বসে আছে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমার খেয়াল ছিল না কোথায় শুয়েছি, অথচ সমান্তরালভাবে আমি সাগর পেরোনোর সেই রাতটায় ফিরে গেছিলাম।

ডোভারের ব্লাস্ট করা সাদা পাথরের দেওয়াল ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, অথচ রাতের দিগ্‌বলয়ে ‘ক্যালে’ বন্দর জেগে ওঠার অনেক দেরি তখনও, ঘন সবুজ জল, জাহাজের চাকার পাশে সাদা ফেনা নিঃশব্দ আক্রোশে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। চলন্ত রেস্তোরাঁর মধ্যে মৃদু মিউজিক, আমি অন্যমনস্কভাবে বাইরে তাকিয়ে আছি, অন্ধকারে এখন আর কিছু দেখা যায় না দূরে, শুধু শীত, আর শীতটা কিছুতেই যেন ছাড়বে না আমাকে—তারপর একের পর এক কারুকার্যময় করিডর আসতে আরম্ভ করল, উদ্ভাসিত শয়ে শয়ে খিলান, দীর্ঘ দীর্ঘ, পথ ধরে আমি হাঁটছি, চারপাশে রঙীন ভিড়ের হিজিবিজি কাটাকুটি, ঝাপসা কালো মাথা, কিন্তু আমি চেনা কাউকে পাচ্ছি না ; ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারলাম, ঠিক একমুহূর্ত আগে আমি চেঁচিয়ে “ডোমিনিক্” বলে ডেকে উঠেছিলাম। অন্ধকারে চোখ খুললাম, নিজের ডাকটা তখনও কানে লেগে···

চেতনা একটু স্বচ্ছ হতে ভাবার চেষ্টা করলাম আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম সকালে।

কাল ও পরশুর মতন চিকণ ভোর ছিল আজও, গত দুদিনে একবারও বৃষ্টি পড়েনি। লেস্-এর পর্দার ফাঁক দিয়ে কোমল আলো ফুটে উঠে আমার ঘুমন্ত দুচোখের কার্নিয়া ছুঁয়েছিল। তখনও কিন্তু আমি জেগে উঠিনি। একটা হালকা পারফিউম ভাসতে ভাসতে খাটের কাছে চলে এসে উঠেছিল, তারপর বিছানার ওপর বসে পড়ে, আমার মুখের ওপর ঝুঁকে ডোমিনিক বলে উঠেছিল, এই রিটা, ওঠ, কত ঘুমোবে।

ঘুম জড়ানো চোখ মেলে চাইলাম।

ডোমিনিকের হাসিভরা মুখ, রিমলেস চশমার পেছনে উজ্জ্বল বাদামি দুই চোখ, সোনালী চুল পেছনে খোঁপা করে বাঁধা, গাঢ় গোলাপী ঠোঁট দুটির মাঝখানে নিপুণভাবে সাজানো দাঁতের সারি, ডোমিনিক প্রায় পুরো শরীর দিয়ে আমার ওপর শুয়ে পড়ল। সাদা, হাতির দাঁতের বর্ণ ওর দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে রাগের সঙ্গে বলল, ওঠো বলছি। জোটি (জ্যোতি) এখনও ঘুমোচ্ছে, তুমি উঠছ না, ব্রেকফাস্টের কত দেরি হয়ে যাবে বলো তো। আঃ ডোমিনিক্, প্লীজ ! আর একটু ঘুমোতে দাও আমাকে। মাঝরাতে ডোমিনিকের মায়ের পোষা কালো বেড়ালটা উঠে আমার পায়ের নীচে, লেপের মধ্যে গুটিশুটি হয়ে শুল। আমার বেড়ালে ভীষণ ঘেন্না। হীটিং চালানো হাল্কা শীতের মধ্যে পায়ের কাছে নরম-গরম ছোঁয়া মন্দ লাগার কথা নয়—কিন্তু আমার গা শিরশির করছিল, কিছুতেই এখানে শুতে পারবো না আমি। সীটিং রুমের কার্পেটে জ্যোতি আর ডোমিনিক পানীয় নিয়ে বসেছে, ওদের হাল্কা হাসি, কথাবার্তা ভেজানো দরজার মধ্যে দিয়ে কানে আসছে। আগামী কাল সকালে লুভর্, আটটার সময় বেরোতে হবে, আজ সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা হয়েছে, অথচ জ্যোতির ভ্রূক্ষেপ নেই। শোওয়ার কথা

বলতে উঁচু করে হেসে বলল, আরে ঘুম কি পালিয়ে যাচ্ছে নাকি! এসো এসো, গল্প করি। এটা আমার সঙ্গে ভদ্রতা করা হল। আসলে ও ডোমিনিককে নিয়েই বসতে চায়। ভীষণ রাগ হয়েছিল তখন। নাঃ, আমার মাথা ধরেছে—বলে উঠে চলে এসেছি।

ডোমিনিক নিজেই এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল, যাতে সীটিং রুমের আলো আমার চোখে না লাগে। কিন্তু বেড়ালটা আসায় আমার মনের সব শান্তি আবার ছিঁড়েখুঁড়ে গেল। গৃহস্বামীর বেড়ালকে কি আর লাথি মেরে নামিয়ে দেওয়া যায়, তাও আবার প্যারিসের মতন শহরে। মমার্ত-এর সুপার মারকেটে গিয়ে বেগুন কিনে যে নিদারাণ গ্লানি বোধ করেছিলাম, এ যে তার চেয়েও খারাপ। ডোমিনিককেই বলি বেড়ালটার কথা। উঠে খাটের নীচে রাখা স্লীপার পরলাম। আধো-ঘুম-লাগা-চোখে বেডরুমের দরজাটা ভেতর থেকে খুলেই দ্রুত বন্ধ করে দিতে হ'ল। না দিলেও অবশ্য সাঙ্ঘাতিক কিছু হতো না। সীটিং রুমের শ্যাণ্ডোলয়ারের নীচে জ্যোতি বসে বসেই ডোমিনিককে জড়িয়ে ধরে আছে, ডোমিনিকের সোনালী ঋজু চুলে ভরা মাথাটা জ্যোতির কাঁধে, দুজনেরই চোখ বন্ধ। বাকি রাতটা আমি আর ডোমিনিকের মায়ের বেড়াল পরস্পরের প্রতি কীরকম হিংস্র মনোভাব পুষে সহাবস্থান করলাম, তা কাউকে বলার মতন নয়। ভোরের দিকে একটু তো ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমিয়েছি, তাও মেয়েটা কাকভোরে ঠেলে তুলে দিচ্ছে। অথচ এমন নিষ্পাপ হাসিমাখা মুখ, যেন কাল রাতে কী হয়েছিল কিছু জানে না!

আমি আর একবার দু' চোখ বন্ধ করে নিতেই ডোমিনিক খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, আর য়ু অ্যাংগ্রি? রাগ করে উত্তর দিলাম না।

এবার ডোমিনিক ঝুঁকে পরে একটা ক্ষিপ্র চুমু খেল আমার ঠোঁটে, তারপর বিছানা থেকে উঠে পড়ে বলল, বাট উই ডিডন্‌ট্‌ ডু এনিথিং, আমরা কেবল পরস্পরকে জড়িয়ে বসে ছিলাম। চলো চলো, এরপরে 'বাগেৎ' পাবো না। বাইরে থেকে টেনে দিলে দরজা লক্‌ড্‌ হয়ে যায়। জ্যোতি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি আর ডোমিনিক পথে নামলাম। দুটো লেন পেরোলে ছোট্ট একটা সুপার মারকেট। বেকারি তার লাগোয়া। এখান থেকেই আমাদের যাবতীয় জিনিস কেনা হয়। এইরকম তাজা রুটি কোথাও নেই, এমন ভালো শাকসব্জি কোথাও নেই, তিরিশ চল্লিশ রকমের বিদ্‌ঘুটে গন্ধঅলা চীজ, আমি তার কোনো তারতম্য বুঝি না। ডোমিনিক্‌ তাদের নাড়ী-নক্ষত্র বিষয়ে কলকল করে কথা বলে যায়।

নরম ভোর। কোনো শব্দ না করে দ্রুত এদিক ওদিক যাচ্ছে গাড়িরা। রাস্তার ধারের গাছগুলি রোদে ঝলমল করছে, ফুটপাথে একটি দুটি হলুদ পাতা গড়াচ্ছে, এমন সকাল—এ যেন প্যারিস নয়, আমি আর ডোমিনিক বালিগঞ্জের কোনো রাস্তায় হাঁটছি।

পথে জ্যোতি আমার ভারী জ্যাকেট নিয়ে, আর হাতে ছাতা নেওয়ার জন্য একটু হাসিঠাট্টা করল। তবে আমাদের মধ্যেকার মেঘ কাটেনি বোঝাই

যাচ্ছিল। কাল থেকেই মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে। জ্যোতির ধারণা আমি ইম্প্রেশনিস্ট ছবি কিছু বুঝি না, সেই জন্য মুসি দ্য অখ্সেতে তাড়াহুড়ো করছিলাম। ওর আরও সময় দরকার ছিল। অথচ আমি কাল সকালেই ব্রেকফাস্টের সময় বলে দিয়েছিলাম রঁদ্যাঁর বাড়ি আমি দেখবই। ছদিনের জন্য আসা এত কষ্ট ক'রে, ওই ভাস্কর্যগুলি না দেখে ফেরা যায়? হ্যাঁ, ক্লদ মনের লণ্ডনের ওয়েস্ট মিনস্টারের ছবি—কুয়াশায় ঝাপসা নীল ও অরেঞ্জে আঁকা, ভালো লেগেছিল, ভালো লেগেছিল সেইন নদীর ছবিগুলি, পল গঁগ্যাঁর প্যাসেজ দ্য প্রভেন্স দেখে কেমন একটা কষ্ট হয়েছিল, অথচ ভ্যান গখ্কে তেমন করে পেলাম না, সানফ্লাওয়ার নেই—তখনই ঠিক করেছি আমস্টার্ডামের ভ্যানগখ্ আকাদেমীতে যাই বা না-যাই, রঁদ্যাঁর নিজস্ব সংগ্রহের ভ্যান গখ্-গুলি দেখবো না? নির্জন, লম্বা একটা রাস্তা—নানা বাঁক ঘুরে রঁদ্যাঁর মিউজিয়ম খুঁজছি, তখনই বুঝেছি জ্যোতির্ময় চুপ, ও আমার সঙ্গে কথা বলছে না। না বলুক।

অবশ্য জ্যোতি রাগ করতেই পারে। এই আমিই তো বলেছি, লুভর্-এ পনেরো দিন একটানা কাটালেও কিছু না। না দেখেই এত, এ্যাঁ!

তখন কি জানতাম রাতের ৯টা ঘণ্টা পনেরোদিনের মতনই দীর্ঘ, স্বপ্ন-বহুল হবে লুভর্-এ।

আকাশ অল্প মেঘলা, বৃষ্টির সম্ভাবনা হাওয়ায় ঝুলছে। সেই চাপা রঙের বিপরীতে লুভর্-এর পাণ্ডুর হলুদ রং, ডানা ছড়ানো রাশভারী স্থাপত্যের মেজাজ-বুকের মধ্যেটা কেমন যেন কেঁপে উঠেছিল, সম্মোহিতের মতন আমি, জ্যোতির একটা আঙুল ধরে পেই-এর তৈরি সেই কাঁচের পিরামিডের ম্যাজিকের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলাম। পিরামিডের দুধারে উল্সে উঠেছে ফোয়ারা, ত্রিকোণ জলভূমির মধ্যে লুভর্-এর ছায়া ঘুলিয়ে একাকার। তাহলে সত্যিই রূপনগরের এত কাছে পৌঁছে গেছি আমরা! তক্ষুনি ডোমিনিক মুখ ফিরিয়ে হেসে 'হাই' বলে উঠেছিল, কারণ ম্যাথিউ পিছন থেকে এসে ওর কাঁধে আলতো টোকা দিয়েছিল। ডোমিনিকেব সঙ্গে ম্যাথিউ-এর বিলেতে আলাপ, আমরা চিনি না বলে আলাপ করিয়ে দিল। দু'জনে একই ব্যাচের স্টুডেণ্ট ছিল, অবশ্য ডোমিনিক আইন পড়ত আর ম্যাথিউ সাহিত্য। আজ ম্যাথিউ-এরও প্যারিস সফর, আমাদেরই মতন। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স হবে, কপালের ওপর কোঁকড়ানো সোনালি চুল, তরুণ রোমান দেবতার মতন ম্যাথিউ জীবনীশক্তির প্রাচুর্যে ছটফট করছে—এই ছবি তুলছে দ্রুত, কাঁধের ব্যাগটা কোথায় রাখবে বুঝতে পারছে না, পকেট থেকে নরম হয়ে যাওয়া চকোলেট বার করে আমাদের দিল, আমাদের বেশ জমে গেল ম্যাথিউ-এর সঙ্গে।

ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অদৃশ্য টেনশন আরম্ভ হয়ে গেল আমাদের মধ্যে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে আমি একা পড়ে যাচ্ছি।

প্রথমেই আমাদের একটু তর্কাতর্কি হল—ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্টিকুইটিস বা

মিশর, মেসোপটেমিয়া, সুমের, আক্কাদ এসব ওদের কাছে ভীষণ ভারী, বোরিং, ওরা দেখবে না। অথচ আমি ওখান থেকেই আরম্ভ করব।

শেষমেশ দেখা গেল ভেতরে ঢোকার নিয়মকানুন বেশ প্যাঁচালো, তার ওপর জ্যোতিও একটুও সাপোর্ট করল না আমাকে, ডোমিনিকের চাপে আমরা গ্রেট গ্যালারির ফ্রেঞ্চ পেন্টিং থেকে আরম্ভ করলাম। ম্যাথিউ দেখলাম যতটা না দেখতে এসেছে, তার চেয়ে বেশি এসেছে মজা করতে, গোড়া থেকেই ওর চিন্তা হচ্ছে কীভাবে একটু আধটু ঘুরে ফিরে তারপর বীয়ার নিয়ে কোথাও বসবে, ওপরে কোথাও একটা সুন্দর টেরাস ক্যাফে আছে নাকি। ছবি দেখতে গিয়েও টেনশন—ওরা ল্যান্ডস্কেপ ভালোবাসে না। দু'একবার ডোমিনিক আমার কাছে কাছে থাকার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভেতরে ক্লান্তিকর ভিড়, আমাদের কেবল হেঁটে যেতে হচ্ছিল, না হলে আবার দলটা টুকরো হয়ে যায়। ইতালীয় রেনেশাঁ সেকশনে গিয়ে জ্যোতি ওর আদেখলেপনা আরম্ভ করল, বিশেষ করে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, কিন্তু মোনালিসার সামনে অশ্লীল ভিড়, হাজার খানেক ফ্ল্যাশ চমকাচ্ছে, দেখেই আমার গা গুলিয়ে উঠল। জাপানি, জার্মান, ইংলিশ ছবি দেখিয়েরা প্রায় গুঁতোতে বাকি রেখেছে পরস্পরকে—আচ্ছা মোনালিসার সামনে নিজেকে দাঁড় করিয়ে ফটো তুলে কি হবে, বাড়িতে গিয়ে দেখাবে লুভর্-এ গেছিলাম, এই তো!

শেষে যখন জ্যোতি ম্যাথিউকে বলল, মোনালিসার সামনে আমি আর রিতা দাঁড়াচ্ছি তুমি একটা ফটো নাও—ওফ্ ডিস্গাস্টিং, আমি প্রায় ছুটে পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে এবং একটা করিন্থিয়ান প্যাঁচা-আকৃতি মৃৎপাত্র খুঁটিয়ে দেখার সময় জ্যোতি কানের কাছে দাঁত চেপে বলল, রিতা, ন্যাকামি করবে না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ফিরে গিয়ে মজা দেখাব।

তাকিয়ে দেখি জ্যোতির পাতলা ক্রুর ঠোঁটে একটু হাসি ঝুলে আছে। অর্থাৎ এটা রাগও, আদরও। ওর দৃঢ় ধারণা মেয়েদের একটু টাইট না দিলে তারা মাথায় চড়ে বসে, মাঝে মধ্যেই ট্রিটমেণ্ট দরকার হয়। যখন খুব হোমসিক্ ফিল করি হঠাৎই, অথবা কোনো কারণে হয়তো মনটা খারাপ, তখনও জ্যোতি যে চুপ করে দুমিনিট পাশে বসে থাকবে, অথবা খালি হাতটাই ধরল, এমন কখনো হয় না। "অল ইউ নীড ইজ এ গুড···" এই একটাই ওষুধ ওর জানা। আজ দু' বছর আমরা লিভ-টুগেদার করছি। জ্যোতি ছেলেপুলে চায় না এখনই। আমিও বিয়ের কথা তুলি না আর। প্রথম দিকে মনে হ'ত বিয়ের ব্যাপারটা আমাদের নতুন করে কী দেবে! একই তো! এখন ভাবি কোনো একটা পিছুটান থাকলে ভালোই হত বোধ হয়। মেয়েদের সঙ্গে জ্যোতি চট্ করে একটা সহজ বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিতে পারে, এটা ওর আগে থেকেই ছিল। কিন্তু আজকাল ওর স্বভাবে মাঝে মাঝে ঝিলিক মারে লোভ, সেটা আমাকে নানা অনিশ্চয়তায় ফেলে দেয়—নাকি পুরোটাই আমার কল্পনা—কে জানে! আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে আমার নাকি? নাহলে কেন ভাবি যে আজ থেকে বছর পাঁচেক পর, চল্লিশের গোড়ায়, কোনোদিন ভোরে

ঘুম ভেঙে উঠে দেখব আমার পাশে, বিছানায় উত্তাপ নেই, ফাঁকা!

টেরাস ক্যাফে থেকে নামার পরই মনে মনে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলি। বেলা তিনটে বাজে, হাতে সময় কম, অথচ প্রায় কিছুই দেখা হয়নি। গ্রাফিক আর্টের ধারে কাছে যাইনি, ভাস্কর্য দেখেছি আধা-খ্যাঁচড়াও বলে না তাকে, গ্রীক রোমান প্রাচীন শিল্পকলার পাশ দিয়ে হেঁটে এসেছি বললেই হয়— আমার মধ্যে অশান্ত একটা হতাশা, রাগ ছটফট করতে লেগেছে। চারিদিকে মানুষের মাথা, ভিড়—, ম্যাথিউ, ডোমিনিক, জ্যোতি কেমন আলতোভাবে গল্প করতে করতে এগোচ্ছে, যেন ওদের কোনো তাড়া নেই, ওরা সকলেই যেন আজন্ম প্যারিসের বাসিন্দা, যে কোনো বিকেলে আবার বেড়াতে চলে আসবে এখানে। শ্রান্তভাবে, কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই, আমি দীর্ঘায়িত গ্যালারিদের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি, অজস্র খিলান, ছাত আমাকে ওপর থেকে দেখে না দেখার ভান করছে, আমার দু' চোখ ভারী, এত সৌন্দর্য, এত অল্প সময়ের মধ্যে মাত্র দুটি চোখে ভরে নেওয়া কী সম্ভব!

মিউজিয়ম বন্ধ হয়ে আসার মুখে জনস্রোত নানা দরজায় উপচে পড়ছে। বেরোবারও একটি নির্দিষ্ট কলা আছে, তারই নিয়মে ব্লু-সুট পরা গম্ভীর রক্ষীরা দু'হাত দুপাশে ছড়িয়ে আমাদের আটকাতে লাগল—অর্থাৎ, উঁহু এদিক দিয়ে নয়, ওদিকে যাও—

আমি ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছি। একটু যেন অনুকম্পা দেখিয়েই ডোমিনিক বলল, আমরা সুমের আক্কাদ-এর সেক্শনটা দিয়ে বেরোই, ম্যাথিউ ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল, জ্যোতি কিছু বলল না। সেক্শনের দরজায় মোটা দড়িটা টাঙিয়ে ক্লোজ করার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা বড় ঢেউ বেরোল ভিড়ের। তাদের মধ্যে ডোমিনিক-এর অরেঞ্জ টী-শার্ট আমার চোখে ডানার ঝাপট দিল। তার-পরেই আস্তে করে আমি হামুরাবির অনুশাসন (১৭৯২-১৭৫০ খৃঃ পূঃ)-এর পেছনে চলে গেছি। আক্কাদীয় ভাষায় খোদাই করা আড়াই মিটার উঁচু এই নিকষ কালো ব্যাসাল্ট আমাকে আড়াল করেছে মায়াভরে। বুক ঢিবঢিব করছে এত জোরে যেন লুভর্-এর রক্ষীরা সত্যিই শুনতে পাবে। আস্তে আস্তে মেহগনির বিশাল সব দরজা বন্ধ হয়ে সুন্দর নগরীর ভেতরে রক্তাভ সন্ধে ঘন হয়ে এল। স্তব্ধ, নির্জন। একটি পাখির ডাকও নেই। একজন ঘোষক 'এনিবডি হিয়ার' ফরাসিতে বলতে বলতে করিডর-চত্বর পেরিয়ে গেছে একটু আগে, যেমন রোজ যায়। আমি সাড়া দিইনি। হাত তুলে মুখে চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি। পাতলা অন্ধকার ঘন হয়েছে, অথচ একেবারে নিশ্ছিদ্র হয়নি। খিলানের ভাঁজে ভাঁজে চাপা আলো, ডানায় ঠোঁট গুঁজে বসে আছে, তাইতেই।

আমাকে অন্ধের মতো হাত ধরে ঘুরিয়েছে এই দীর্ঘ করিডোরের দুই পাশের শিলীভূত, চিত্রার্পিত সময়। পাগলের মত আমি ক্লান্তিহীন ঘুরেছি। 'শামাস্-সূর্য'ও ন্যায়ের দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হামুরাবি ও তাঁর আক্কাদ লিপি, সুমেরীয় রেনেশাঁ যুগের নৃপতি গুডেয়া, তার উপচে পড়া

মৃৎপাত্র, নিনিভ ও খোরসাবাদ থেকে তুলে আনা বিশাল সব রিলিফ, প্রাসাদের তোরণে ছিল ওই ডানাঅলা, মানুষের মাথাঅলা বিশালাকায় ষাঁড়—হাতির দাঁতের হাতলে যুদ্ধের দৃশ্যের কারুকাজ, ওয়েবেল-এল্-আরক্ ছুরি প্রাচীন মিশরের আমি ওদের সবাইকে একক ও আলাদাভাবে দেখেছি, ছুঁয়েছি চোখ দিয়ে। মোনালিসার হুজুগে ওরা আমাকে ভার্জিন, দ্য চাইল্ড ও সেইণ্ট গ্যানের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি, আমি সেইণ্ট-এ্যাল-এর অপূর্ব মমতামাখা কপালটা এবার বুকভরে দেখে নিয়েছি। হ্যাল্স্-এর জিপসি মেয়ের দু' চোখে কেমন ছলনাময় চাউনি, রেম্ব্রান্ড্ট-এর গোধূলিবেলার ধূসর আত্মপ্রতিকৃতি দেখতে দেখতে আমি কন্স্টেব্ল্, বলিংটন আর টার্নারের রোম্যাণ্টিক ল্যান্ড্স্কেপ্স্গুলির কাছে গেছি। প্রতিটি হারানো পথ, ঝাপসা নদী, পাশ-ফেরানো পাতার মরচে ধরা রং আমি যতক্ষণ ইচ্ছে দেখব, আমায় কেউ বিরক্ত করবে না এখন।

তুমি যখন উচ্চারণ করো, শেষের রটা শোনাই যায় না একেবারে, আমি ডোমিনিককে বলেছিলাম। ওর মুখে শুনে মনে হয়েছে 'লুভ্' বলছে ও। উঁহু, চেস্টনাট রঙের চুলের চাল দুলিয়ে ডোমিনিক বলেছে, ভালো করে শোনো। এটা হচ্ছে নরম 'র', এই দেখো, আমার ঠোঁটের দিকে তাকাও তাহলে বুঝবে, লুভর্—লু—ভ—র্, বুঝেছ ?

গাঢ় গোলাপি দুই ঠোঁট, ঝক্ঝকে দাঁত, তাদের ফাঁকে মোহময় ছোট্ট একটি জিভের তালুর প্রত্যন্তদেশ ছোঁয়া, জ্যোতি তাকিয়ে আছে, আমি জানি কেবল তাকিয়ে তাকিয়েই নেশা ধরে গেছে ওর, কী এমন নেশা, এই অন্ধকারে আমি যে লাইটার হাতে দাঁড়িয়ে আছি, ওর একশো হাজারগুণ উন্মাদনা আমার শরীরের সমস্ত শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। রিমঝিম্ সুমের অববাহিকার বৃষ্টি আমার রক্তে বাজছে।

সাইকি ও কিউপিড আলতো বাহুবন্ধনে স্তব্ধ ; জ্যোতি পাশ কাটিয়ে গেছে আমাদের। সাপকে নিষ্পিষ্ট করতে থাকা সিংহের উন্মাদনা দেখতে দেখতেই ও চোখের সামনে তুলে ধরেছে হাতঘড়ি, বহমানা ডোমিনিক হাওয়ার ঘূর্ণির মত ম্যাথিউ, মিকেলেঞ্জোর 'মুমূর্ষু ক্রীতদাস'কে দেখেও তোমাদের কারো বুক কাঁপেনি···

হ্যাঁ, ওই করিন্থিয়ান প্যাঁচা-পাত্রটির পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে আমি গ্রীক্ ও রোমান প্রাচীন ভাস্কর্যের নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করি একেবারে শেষে···

পা দুটো ব্যথা করছে, ঘাড়পিঠ টনটন করছে, চোখ ভারী। এত রূপ, এত প্যাশন, এত অস্ফুট ভালবাসা, ক্রোধ অতি বিস্ময়-ক্যানভাসে, ব্রোঞ্জে, ব্যাসাল্টে, মর্মরে আমার সারা চেতনার ওপর টুপটাপ জুঁই-এর মতন ঝরে পড়ে প্রায় ঢেকে দিয়েছে আমাকে, চৈতন্যের মাস্তুলের আগাটি বুঝি জেগে আছে এখনো।

মাটিতে শুয়ে পড়ার আগে সামোথ্রেস-এর ডানা মেলা সেই নৌবিজয়ের প্রতীক মূর্তিকে চুপি চুপি দেখলাম, হাওয়ার প্রবল তোড়ের মুখে দাঁড়িয়ে

আছে খৃষ্টপূর্ব দুই শতাব্দী থেকে। নরম বসনের ভাঁজ রহস্যময় ছলাকলায় উন্মোচিত করেছে আড়ালের সেই নারীশরীরের মায়া—আচ্ছা, এর ডান হাতটা নাকি বিচ্ছিন্ন, পাওয়া গেছে খুঁজে চল্লিশ বছর আগে, বিজয়ের ভঙ্গিতে উঁচু করে সামনে বাড়ানো ছিল নাকি, তবু মিলোর ভেনাসের ছিন্ন বাহুটি পাওয়া গেল না তো! আর কতদিন লোকচক্ষুর নিরাবরণ শূন্যতায় দাঁড়িয়ে থাকবে ওই নির্দোষ সৌন্দর্য, কে তাকে এমন শাস্তি দিল! কোমরের নীচে বহু ভাঁজে ভেঙে পড়া তার স্খলিত বসনাঞ্চল ঊর্ধ্বাঙ্গের নগ্নতাকে ভারসাম্য দেবার জন্য লোটাতে থাকবে, আর ছিন্নবাহু নারী চাইলেও লজ্জানিবারণ করতে পারবে না। অন্ধকারে শাদা একটি পদ্মফুলের মতন জেগে থাকে ভেনাসের মুখ, নীচে ঠাণ্ডা মেঝেতে আমি শুয়ে পড়ি। শীত-শীত ও খিদের বোধের মধ্যে হাস্যকরভাবে আমার মনে পড়ে যায় সেইনের কাছের রাস্তায় ডোমিনিকের ফাঁকা বাড়িতে আজ আমার ছায়া নেই। ডোমিনিক ও জ্যোতি দুজনে একা! শ্যাণ্ডেলিয়ার-এর নীচে আলিঙ্গনের পরবর্তী ওদের সম্ভাব্য প্রেম-পর্যায় আমাকে কোনোভাবেই ঈর্ষাতুর, উত্তপ্ত করে না, আমি যেন নোঙর হেঁড়া একটি নৌকোর মতন বহুদূর মাঝসমুদ্রে চলে গেছি···প্রেম, বিবাহ, বিবাহের প্রতিশ্রুতি, সন্তানের জন্ম-সম্ভাবনা ছাড়াই বিজন দ্বীপে দু হাজার বছরেরও বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ছিন্নবাহু এক নারী। তখন ঠিক বুঝতে পারিনি, এখন মাঝরাতের পর ঘুম ভেঙে মনে পড়ছে, হারিয়ে যাওয়ার আগে এইরকমই মনের ভাব হয়েছিল আমার, আলোমাখা; জ্যোতিকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম, ম্যাথিউ এর জন্য ভালোবাসা জেগেছিল, হ্যাঁ ডোমিনিক্, তোমাকেও···আইফেল টাওয়ারের বিশাল আর্চের তলা থেকে তুমিই না দেখিয়েছিলে প্যারীর রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ।

ঘুম ভাঙার ঠিক একমুহূর্ত আগে আমি চেঁচিয়ে "ডোমিনিক্" বলে ডেকে উঠেছিলাম।

সুধন্য বগর্তী তার বাপের দিকে তাকাল। তাকিয়ে লজ্জা পেল ভীষণ। আড়চোখে চারদিকে দেখে নিল কেউ দেখছে না তো। কী যে আদেখলেপনা করে তার বাপটা। লোকে কী ভাববে ? সামনের দাঁত কটা অনেকদিনই নেই। মুখটা হাঁ করে, নাক কুঁচকে ওপরে চেয়ে আছে। ধুতিটা ডান হাঁটুর ওপরে উঠে আছে। বাঁ হাতে অন্য হাঁটুটা খামচে ধরে আছে অবাক বিস্ময়ে।

আলতো করে ধুতিটা হাঁটুর নীচে টেনে নামাল সুধন, তারপর ফিসফিস করে বলল, বাপা, বাপা, এই বাপা আগে দেখ্। সভা শুরু হয়ে গেছে।

দিয়া বগর্তী আশ্চর্য হয়ে ওপরের ঝাড়বাতিটা দেখছিল। এত বড় বড়, এতগুলি বাতি একসঙ্গে সে কি কোনোদিন দেখেছে! মল্লারপুরের জমিদার বাড়িতে ভাঙাচোরা যে আলোগুলি আছে, তারা আজ আর জ্বলে না। তাদের জৌলুস উঠে গেছে চিরতরে। হাতির দাঁতের রঙের মস্ত এই সভাঘর, নীচে নীল রঙের নরম কার্পেট, হাঁটতে গেলে পা ডুবে যায়। সেই নীল গালিচার ওপর গদিআঁটা সিংহাসন মার্কা চেয়ারে ওদের বসতে দিয়েছে। সামনে একটু দূরে ধবধবে সাদা কাপড়ে-মোড়া টেবিল। তাতে গণ্যমান্যরা কনুই রেখে, কেউ চেয়ারে এলিয়ে বসেছেন।

ঝাড়বাতিগুলি এক একটি মহীরুহসদৃশ। শীতাতপ মোড়া এই ঘরে বাতাস আসে না বহুদিন, তবু যেন বাতাসের কোনো শৈশবস্মৃতির আবেশে আলোরা অল্প অল্প দোলে। কাঁচের শাখা-প্রশাখায় দাঁড়করানো মস্ত মোমবাতিগুলি আরোঝলমল করে ওঠে তখন। আলোর হিল্লোল দেখতে দেখতে দিয়া বগর্তী নিজের রোদে-পোড়া ফাঁকা জমির কথা ভুলে যাচ্ছিল। সুধন তাকে জামা খুলতে দেবে না এই দেড় দিন, আজ আর আগামী কালের অর্ধেকটা। খাদির কোঁচকানো জামাটা খড়মড় করে দিয়া বগর্তীর সব শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছিল, তার পিঠ অবিরাম কুটকুট করছিল। তবু ওই অপরূপ আলোগুলি সত্যিই সব কিছু ভুলিয়ে দেয়।

অবিরল ভাষণ হয়ে যাচ্ছিল। প্রথমে সাফারি পরা মোটামতন একজন, তারপর চিফ ইঞ্জিনিরার, মাঝখানে রোগা খড়কে-কাঠি-মার্কা এম এল এ, সবশেষে বিভাগীয় মন্ত্রী। কোনো কথাই সুধনরা বুঝতে পারছিল না। সব ইংরাজি। ইঞ্জিনিয়ার সুদেব শাস্ত্রী আবার একটা শাদা পর্দার ওপর আলো ফেলে নানারকম আঁকাজোকা দেওয়া পাতলা প্লাস্টিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। হাতে লম্বা এক স্টিলের লাঠি। ড্যাম আর ক্যানাল বানিয়ে তাদের দেখভাল করতে কত কোটি টাকা খরচ হয় সরকারের, একি ছেলেখেলা ?

এ অঙ্ক ক্রমশ বেড়ে বেড়ে আকাশ ছুঁতে চলেছে। আর জলকরের বেলায় চাষিদের ফক্কা। আড়াইশো কোটি খরচের পিঠে পাঁচ কোটি টাকার আদায়। টাকা চাইলেই চাষি নাকে কাঁদে, কেউ বলে মোটে জল পাইনি, কেউ বলে ধান জ্বলে গেছে, কেউ বলে রাতবিরেতে সমাজবিরোধীরা স্লুইস ভেঙে নিয়ে চলে গেছে। এই জমাখরচের হিসেব কে মেলাবে বলো দেখি! সরকারের হিত চিন্তায় সুদেব শাস্ত্রী ঠান্ডাঘরের মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠছিলেন, টাইয়ের গিঁট আলগা করার চেষ্টা করছিলেন অন্যমনস্ক আঙুলে। শেষে ক্লান্ত হয়ে বসে আড়চোখে বিভাগীয় মন্ত্রীর দিকে তাকাতে থাকলেন, এক বছর চাকরির এক্সটেনশন হবে। ঘোড়েল সহদেব বিশ্বাস ফাইলের ওপর বসে আছেন। সরকারি দলের চিফ হুইপ দুবেলা তাগাদা দিচ্ছেন তাই। চিফ হুইপের মেয়ের সঙ্গে সুদেবের ছেলের বিয়ে হয়েছে। অথচ সহদেব বিশ্বাস অনড়। টাকাপয়সার যদি মামলাই হয়, ইশারায় বললেই তো হয়, তাও বলবে না।

সুদেবের জন্য বুকের মধ্যে একটু আধটু কষ্ট হচ্ছিল সুধন বগর্তীর। বাবুদের কী ঝামেলা! সত্যিই তো, সুধনরা জল পায় না আজ কত বছর হল। দশ বছর তো বটেই। জলকর আদায় করতে আমিন ভয়ে নিজেই আসে না। ক্যানালের টেল-এর দিকটা ক্রমশই ভেঙে-মজে যাচ্ছে। ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে তার ফলে। শাস্ত্রীবাবু একা-হাতে কত আর করবে? আর সেইজন্যই তো এই সভা ডাকা। একে বলে কর্মশালা, কামারশাল নয়। এখানে বড় বড় মাথা এক হয়ে পরামর্শ করবে, চাষিরা কীভাবে ক্যানালের দায়িত্ব নিজেরা কো-অপরেটিভ করে নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে, জলকর তারাই আদায় করবে—সরকারকে তারাই জমা দেবে আমিন-টামিন আর লাগাবে না, একে বলে স্বায়ত্তশাসন।

ফুরফুরে লাল শাড়িপরা একটা মেয়ে কয়েকজনকে লেখার কাগজ আর পেনসিল দিয়ে গেল। সুন্দর একটা বাস লেগে রইল ঝাড়বাতি দোলানো হালকা হাওয়াতে। সুধনকে দিল না। কেন? ও কি দেখে বুঝতে পেরেছে সুধন লিখতে জানে না? জানত এককালে, এখন লিখতে গেলে ওর হাতে পেনসিল ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

মেয়েটা ঘুরে সুধনের ঘাড়ের কাছে এল আবার।

সুধন বুকে সাহস এনে ঘাঁউ করে বলে উঠল, আমাদের কাগজ পেনসিল দিন!

আমাদের মানে? মেয়েটা ভুরু কুঁচকে আছে।

এই আমাকে আর বাপাকে।

তাচ্ছিল্য-ভরে এনে দিল মেয়েটা। ওই পেনসিল দিয়া বগর্তীর কোল থেকে গড়িয়ে নীল গালিচায় ডুবে গেছে সিগ্রেটের আলোর মতন। সেইজন্যই মেয়েটা দিচ্ছিল না। ওরা মানুষের চেহারা দেখলেই বুঝতে পারে কার কী এলেম।

সকালে এখানে পৌঁছনোর পর হলের এককোণায় পোঁটলাপুঁটলি রেখে

সুধন, দিয়া আর বিশ্বনাথপুরের রসিক ওঝা একটু ঘুরতে বেরিয়েছিল। বাইরে শীতের নরম হলুদ রোদ। দুটো রিকশাওলা সিটের ওপর পা তুলে ঘুমোচ্ছে। সামনে সারি সারি দোকান রাস্তার ওপারে। এই শীতেও ভেতরটা মেশিন চালিয়ে ঠাণ্ডা করে রেখেছে 'কর্মশালা'রা। একটু একটু সকালই ওদের পৌঁছে দিয়েছিল সবুজ জিপটা। চার ঘণ্টার রাস্তা। কাকভোরে বেরিয়েছে। জিপটা আবার কোথায় যেন শহরে কাকে আনতে যাবে। অতএব নামো, নামো, নামো।

ফিরে আসতে গিয়ে আর ঢোকার পথ পাচ্ছিল না সুধনরা। বড় রাস্তায় একটা ঝকঝকে ট্রাফিক পুলিশ গজিয়ে উঠেছে কোত্থেকে। হোটেলের মুখটা পুলিশে ছয়লাপ। সুধনদের ঠেসে চেপে কোণায় রেখে দিল। আর তক্ষুনি কোনো শব্দ না করে কুমিরের মতন কালো কাঁচে ঢাকা এক গাড়ি ঢুকে এল গাড়িবারন্দার তলায়। সামনে পেছনে জিপ। গাড়ি থামতেই জিপ থেকে ঢিল-পাটকেল পড়ার মতন কালো পোশাক পরা ষণ্ডাগুণ্ডা কারা যেন নেমে বিভাগীয় মন্ত্রী সহদেব বিশ্বাসকে ঘিরে ধরল।

ওনাকে মারবে না তো?

মারবে মানে? ওরাই বডিগার্ড। ব্ল্যাক ক্যাট। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বলে উঠল।

ভিড়টা ঘুরে উঁকিঝুঁকি মেরে সুধনদের দেখছিল।

সহদেব বিশ্বাস মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করতেই কালো বেড়ালরা হটে গেল। এবার মালা। ফুল। টি ভি ক্যামেরা। বিভাগীয় মন্ত্রী হলে কী হবে, দলের সত্তরজন বিধায়কই সহদেব-এর কাছের মানুষ। তথ্য ও সম্প্রচারকে তাই একেবারে স্ট্যাণ্ডিং ইন্‌স্‌ট্রাকশন দেওয়া থাকে, উনি যেখানে যাবেন পিছু নেবে।

সভার মধ্যে এবার সহদেব বিশ্বাস বলতে উঠেছেন। চেহারা পালটাননি, জামাকাপড়ও না, তবু ক্যামেরাগুলো একেবারে কাছ ঘেঁষে এসে ওঁর ছবি নিতে আরম্ভ করল। একটা ছাপা কাগজ খুব কাছে এনে, দেখে দেখে, ভাঙা গলায় পড়তে আরম্ভ করতেই, পেছন থেকে আপত্তি উঠল, ইংরিজি নয়, ইংরিজি নয়।

সহদেব বিশ্বাস একটু দমে গেছিলেন প্রথমটা। পেছনে বসে আছে রমেন দাস আর ওর বউ লিলি। রমেন আর লিলি গলা মিলিয়ে বলে উঠেছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চালায়। দেশবিদেশের টাকা পায়, মাঝে মধ্যে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা ঘুরে আসে। বিশ্বনাথপুরের পঞ্চায়েত-সমিতি চেয়ারম্যানের লোক। বিশ্বনাথপুরের চেয়ারম্যান সহদেবের বিরোধী ক্যাম্প। হুমদো চেহারার একটা বেড়াল দুলতে দুলতে গিয়ে সহদেবের কানে কী সব বলে এল।

বোধহয় রমেন লিলির জন্মবৃত্তান্ত।

সহদেব সামনে তাকিয়ে আনমনে ঘাড় নেড়ে, একটা শাদা রুমালে মুখ

মুছে আবার ছাপা কাগজটা দেখে দেখে ইংরাজি পড়তে লাগলেন। এতখানি এগিয়ে এসে আবার ভাষণের অনুবাদ করে বলা ওঁর পক্ষে সম্ভব না।

লিলিরা একটু মিষ্টি হেসে চুপ করে রইল।

ইয়াসিন, তালেব ওরা এল না।

দিয়া বগর্তী মাঝে-মধ্যে পেছন ঘুরে দেখার চেষ্টা করছে—বাপা, তুই সামনে তাকা তো।

সুধন বগর্তী ভয় পাচ্ছে। বাপের হাতে বিপজ্জনকভাবে ঠকঠকাচ্ছে দামী কাঁচের কাপ-প্লেট। পড়ে যায় যদি। চা-টা অবশ্য ভাতের মাড়ের মতন খেতে। পাশের মণ্ডগুলো যে চিনি সেটা রসিক কামড়ে খেয়ে বলে না দিলে বোঝা যেত না। ওদের সবাইকে চা খেতে বড় টেবিলে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু বাবুরা সবাই মশগুল। ঘাড় গুঁজে হাতের কাগজে হিজিবিজি লিখছে। কেউ উঠতে চাইল না। কাজেই সুধনদেরও ওঠা হল না। তার বদলে শাদা উর্দি-পরা কিছু বেড়াল ওদের হাতে কাপ-ডিশ ধরিয়ে দিয়ে গেল। চা চলকে পড়ে বিস্কুটগুলো ন্যাতা হয়ে গেছে। সুধনদের বলল, কাপ ভাঙবেন না, কার্পেটে ফেলবেন না—মনে থাকবে?

ইয়াসিন, তালেব, শঙ্কর ওরা তিনজন বাহাদুরি করে নিজে নিজে আসবে বলেছে। জিপে আসত আরামে। না, নিজে এলে হাতে ক্যাশ টাকা দেবে ভাড়ার।

দেখ দেখি গেল কোথায়! এখনো তো পোঁছালো না!

বিশ্বনাথপুর থেকে কামারপাড়া, কামারপাড়া থেকে বাস-এ বেহরমপুর হয়ে শহরে। অনেকটা পথ।

ভরদুপুরে সুধনই গেছিল ওদের ডাকতে।

জিপে করে এসে সুগন্ধ-মাখা দুজন বাবু বিশ্বনাথপুরে প্রান্তিক চাষি খুঁজছিল, যারা এগারো নম্বর কেনালের ল্যাজের দিকে থাকে। দিয়া বগর্তী খাটিয়ায় শুয়ে শীত-রৌদ্রে মৌজ করছিল। ঝক্‌ঝকে নীল আকাশের আভা লেগে কেবলই বুজে আসছিল দিয়ার ঘোর-লাগা চোখ।

পরশু যেতে হবে। সকালে জিপ এসে নিয়ে যাবে। দেখো, আবার সট্‌কিও না যেন। বড় হোটেলে কর্মশালা। সেখানেই খাওয়া। রাতে চাষিদের হস্টেলে রাখব। দুদিন যদি চাষবাসের ক্ষতি হয়, তা পুষিয়ে যাবে। শহর দেখবে।

চাষবাস কই যে ক্ষতি হবে? মরা-হাজা এই কেনালে জল আসে না গত দশ বছর। খরিফে ধান তুলে দেয় কোনোমতে, তবে ভাদ্রের শেষে বড় কষ্ট।

কিন্তু রবি চাষ এ অঞ্চলে হয়ই না। সুধন বড় বড় দাঁত বার করে হাসে।

ওসব বলতে হবে না তোমার। ছোটবাবুটি রেগে ওঠে। বড়বাবুটি আঙুলের নীলা-পান্না-চুনির আংটিতে রোদ খেলায়। মিটি মিটি হাসে। বলে, মিত্তির, তুমি আর পাগলাকে দিয়ে সাঁকো নাড়িও না, বুঝলে! বছর বছর কেনাল রিপেয়ার করিয়ে বিল তো দিচ্ছ বাপু।

তারপর দুজনে মিলে বাঁশগাছের ছায়াতে দাঁড়িয়ে লম্বা লিস্ট দেখে। দাগ দেয় রাঙা পেনসিলে।

কামাখ্যাপুর। ক্যানালের হেড এরিয়া। ওখান থেকে আসছে সম্পন্ন চাষিরা। পার্বতীপুরের আখচাষিরা একটা বড় দলে। ওদের মুখিয়া হোটেলের মালিকের সম্বন্ধী। প্রান্তিক চাষি চারজন। শেষে এসে ছোট-বাবুটি হাঁকে, ভূমিহীন ?

ভূমিহীন কই ?

বড়বাবুটি অবজ্ঞাভরে বলে, ভূমিহীন কী হবে ? দেখছ প্রান্তিক চাষি জল পাচ্ছে না আজ দশ বছর !

না স্যার, স্পেনসারের নাকি ফোন এসেছিল। ওয়াশিংটন থেকে দিল্লি অফিসকে বলেছে, ভূমিহীন চাই।

ওদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে হবে। তাছাড়া কেনাল-কমাণ্ডপিছু প্রতি কো-অপরেটিভে একজন ভূমিহীন থাকবে···।

পরশুদিন সেমিনার। আজ ভরদুপুরে ভূমিহীনের ধুয়ো তুলো না তো মিত্তির !

কেন, এই গ্রামে যদি কেউ থাকে। সুধন !

আজ্ঞে। ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে লাজুক সুধন উঠে দাঁড়ায়। আঙুলে কুচি ঘাস, মাটি।

ষড়যন্ত্রকারীর মতন সস্নেহ নৈকট্যে ঘাড় এনে মিত্র বলে, তোদের গাঁয়ে ভূমিহীন নেই ?

সেদিন সুধন্য হেঁটেছিল মিত্রবাবুকে নিয়ে। মিঞা টোলিতে, ঘাসি পাড়ায়। তালেব, ইয়াসিন, শঙ্করকে পাওয়া গেল। প্রায় পুরো পাড়াটাই গাঁ ছাড়া। মেয়ে বউ ছাড়া। রবির মরশুম আরম্ভ হয়েছে। এখন আখের জমিতে লেবার দরকার। কাজের শোরগোল পড়েছে পাশের জেলাতেও। শঙ্কর খুব ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠল পুজোর মরশুমে। তালেব, ইয়াসিন রায়পুর থেকে ফিরেছে হপ্তাখানেক আগে। তালেবের হাঁটুতে চোট। একটু খোঁড়াচ্ছে এখনো। ওরা রাজি হওয়াতে বাবুদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। নিশ্চিন্দি। কিন্তু তালেবরা জিপে যেতে রাজি হল না, কেন কে জানে ! ক্যাশটাকা ভাড়া হাতে পাবে নিজেরা গেলে, তার ওপর বাসে, ট্রেনে টিকিট না কাটলে পুরোটাই লাভ।

সুধন জানত, রাস্তা চিনতে পারবে না ওরা কিছুতেই। এ শহরে ঠিকানা খোঁজা কি মুখের কথা ! তাই হয়েছে। ভূত তিনটে এখনো এসে পেঁছোতে পারেনি।

দিয়া বগরতীর মাথায় কোনো একটা চিন্তা ঢুকে গেলে আর বেরোতে চায় না। কেন এল না ? বার বার ঘুরে ঘুরে দেখছে। প্রত্যেকবারই তার মাথার মধ্যে ঝাড়বাতিগুলি দুলে উঠছে।

সুদীপ্ত একেবারে পেছনের সারিতে বসেছিল। চায়ের বিরতির পর উঠে

দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পুরো দলটাকে এখন তিনভাগ করে তিনজন দলপতির নেতৃত্বে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সিবিল ইঞ্জিনিয়ার, সমাজসেবী, চাষি আমলা সবাইকে চানাচুরের মতন ঝাঁকিয়ে মিশিয়ে দল গড়া হয়েছে। যাতে সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব একেবারে সুষম হয়। মন্ত্রী চলে গেলেন। এখন চেলাচামুণ্ডাদের উৎপাত চলছে। কেউ মাগনায় চা চাইছে, কেউ দুপুরের খাওয়ার সময়ের আগেই কাটলেট চেখে দেখতে চায়।

বিশ্বনাথপুরের ফোকলামতন বৃদ্ধ বিশেষ স্বস্তি পাচ্ছে না। ওঁর ছেলেকে অন্য গ্রুপে দেওয়া হয়েছে। এক পরিবারের দুজন এক গ্রুপে নয়, কিছুতেই না। মতামতে নাকি বায়াস ঢুকে পড়বে। বুড়ো ওর ছেলের হাত চেপে ধরেছিল, কিছুতেই ছাড়বে না। একেবারে ধ্যাধ্‌ধেড়ে গোবিন্দপুরের লোক মনে হচ্ছে। সকালবেলা বাথরুমের নব্‌ উলটোদিকে ঘুরিয়ে ভেঙে ফেলছিল প্রায়।

সুদীপ্ত গিয়ে পড়েছে ভাগ্যিস!

কী হয়েছে, আমাকে বলুন।

বাহ্যি যাব কোথায় বাপ আমার?

সুদীপ্ত টয়লেটের দরজা খুলে দিল।

এইসব অসুবিধের কথা মনে রেখেই ও পঞ্চায়েত-ভবনে সেমিনারটা রাখতে চেয়েছিল। বিনা খরচায় হত। রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা জনাপাঁচেক রসুয়ে বাসুন হাঁড়ি কড়াই নিয়ে এসে করে দিত। শেষ মুহূর্তে জায়গা বদলাতে হয়েছে। সুদীপ্তর মন সায় দেয়নি তবুও। বিশাখাপত্তনমের নারায়ণ রাও আড়াই কোটি টাকা খরচ করে এই হোটেল বানিয়েছে। এই পোর্টিকো, ভেতরে ফোয়ারা, ঝুলন্ত বাগান—স-ব। সেই হিঁচড়ে হোটেলে তুলে আনতে হচ্ছে। উদ্বোধন করেছেন বিভাগীয় মন্ত্রী সহদেব বিশ্বাস নিজে।

ওনার 'কর্মশালা' এখানে হবে না, হবে পঞ্চায়েত-ভবনে?

টাকা তো দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক, তোমার পকেট থেকে তো যাচ্ছে না!

সহদেব বিশ্বাস ভুরু তুলে সুদীপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন।

না, আমার পকেট থেকে যাচ্ছে না। (মনে মনে) তোমার বাপের পকেট থেকেও না! বলে সদীপ্ত বেরিয়ে এসেছিল সেদিন রাগ করে।

আজ ও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, 'সুপারভাইজ' করার জ্বালা কতখানি। একে তো প্রেসের নানারকম হুল-বেঁধানো প্রশ্ন। হাউস ম্যানেজার বারবার ছুটে ছুটে সুদীপ্তর কাছে চলে আসছে। কে কার্পেটে চা ফেলেছে, কে বাথরুমের ফ্লাশ টানেনি। কে গ্লাসের জলে এঁটোহাত ধুয়েছে। এখন ফোয়ারায় কুলকুচি করাটা বাকি আছে কেবল। সুদীপ্ত জেরবার। দুপুরে খাওয়ার সময় আরো ঝামেলা হবে। মোটা চালের ভাত খায় মামুলি চাষিরা। তাদের ওই কটকটে আধসেদ্ধ চালের ফ্রায়েড রাইস আর হাড়জিরজিরে মুরগির টুকরোয় পেট ভরবে?

কামাখ্যাপুরের, পার্বতীপুরের চাষিরা গম্ভীর মুখে আলোচনা শুনে

যাচ্ছে। ওরা কেউ বিশ্বনাথপুরদের সঙ্গে কথা বলছে না। নারায়ণ রাওয়ের সোহাগের পার্টি সব। খাবার সময় কেটারিং ম্যানেজার নিজে এসে ঝুঁকে ঝুঁকে ওদের প্লেট শুঁকে গেল। বিকেলের মুখে রমেন দাস শোরগোল তুলে মাৎ করে দিল। ওকে বলতে বলা হয়নি তখনো কিছু, রিটায়ার্ড কৃষির অধ্যাপক খড়ি দিয়ে বোর্ডে কী সব লিখে চলেছেন। রমেন দাস বলবেই।

—এসব হল ভাঁওতা। পাঁচতারা হোটেলে আমাদের ডেকে ষড়যন্ত্রের শরিক বানানো। জলের বণ্টন চাষি করবে? অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে? পার্বতীপুরের জোতদারদের কাছে জমি বেচে এত লোক পালিয়ে গেল। ধানের জমিতে মাইলের পর মাইল আখ হচ্ছে। টেল-এ জল আসে না কত দিন। এগারো নম্বরে এ বছর আড়াই কোটির রিপেয়ার হবে? এই যে টাকা ঢাললে দশ-পনেরো বছর ধরে, কোথায় গেল? আজ বলছ, জলকর থেকে খরচা উঠছে না। তাই জলকর বাড়াবে একর-প্রতি একচল্লিশ থেকে আশি টাকা। আমাদের মত চাও! তোমাদের আমিন যা পারেনি, চাষিরা মিলে খালি হাতে সেই বকেয়া জলকর তুলবে! চাই না এমন স্বায়ত্তশাসন!

চটাপট হাততালি। স্পেন্সারের সেক্রেটারি তানিয়া বলে মেয়েটি শর্টহ্যান্ড বই আর পেনসিল নিয়ে সুদীপ্তর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এসব স্পেশাল রেসপন্স। টাইপ হয়ে ফ্যাক্সে বিদেশ যাবে।

ইংরেজি ও গাঁওলি ভাষার এমন ফুলঝুরি ছুটিয়েছে রমেন! সুদীপ্ত গম্ভীরভাবে দু-একটা বাক্য অনুবাদ করে দিল তানিয়াকে। লিলি বেশ আলো-হওয়া-মুখে এঘর ওঘর করছে। তানিয়া একসময় ওর সঙ্গে আলাপ করে নিল। চাষির জলবণ্টনের অধিকার নিয়ে এর পরের সেমিনার দিল্লিতে, তার পর টার্কিতে।

রমেন আর লিলি কি ইণ্টারেস্টেড? তানিয়ার কাছে প্রিণ্টেড ফর্ম রাখা থাকে সবসময়।

আধপেটা খেয়ে শরীর পাত। রাতে দমচাপা গরমে আইঢাই করে দেহ। ফ্যাকাশে চায়ে তার রুচি নেই। পরের দিন সকাল থেকেই দিয়া বগরতী বাহিড় যাবার বায়না ধরেছে।

সুধন্য নিজের গ্রুপ থেকে পালিয়ে বাপের কাছে এসে বসেছে কাল বিকেল থেকেই। সুদীপ্ত চোখ টিপে ঘাড় নেড়ে দিয়েছে একবার। কিন্তু বাড়ি যাওয়া যায় নাকি এভাবে? দুপুরের খাওয়া, আবার চা। চারটের সময় সাম-আপ। তারপর আবার ভাষণ। কালো বেড়াল। টি ভি ক্যামেরা।

তালেব, শঙ্কর ওরা কি⋯।

সাম-আপের সময় দরজায় ঝটাপট—এসে গেছে, এসে গেছে। হাঁপাচ্ছে ওরা তিনজন। উশকোখুশকো চুল। গায়ে ঘাম। পেট ভেতরে ঢোকা। সুধন্য পেছনে তাকিয়েছিল। আর থাকতে না পেয়ে আইনের শাসন ভেঙে তালেবদের হাত ধরে বাইরের চাতালে নিয়ে গেল, যেখানে ফোয়ারা চলছে অবিরাম।

কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ওরা হাঁ করে ছাত, কার্পেট, ঝাড়লণ্ঠন দেখে যাচ্ছে। যা দেখে সুধন্য-দিয়ার পেট এতক্ষণে জয়ঢাক।

পকেটের কাগজে কেবল হোটেলের নাম লিখে এনেছিল। ঠিকানা নেই, রাস্তার নাম নেই। গতকাল ভোরে বাস থেকে টইটই করে হাঁটাপায়ে ঘুরেছে। রাতে বাস ডিপোর চাতালে ঘুম। সকালে আবার হাঁটা। শেষে একজন লোক খবর কাগজের রিপোর্ট পড়ে জায়গাটা বাৎলে দেয়। তালেবের রাস্তা পেরোতে ভয়। ভুলভাল পথে বেঁকে গেছে কতবার।

বড় মন্দিরে যাসনি ? চিড়িয়াখানায় ?

কিছু দেখা হয়নি। তবু ধুলোপায়ে এসে যে পৌঁছেছে শেষপর্যন্ত এতেই কৃতার্থ তালেবরা।

রিসেপশন ডেস্কের লোকেরা ওদের ঢুকতেই দিচ্ছিল না। বলছিল, সব তো শেষ—এখন এসে কী করবে ?

যারা ওই টেবিলে বসে নামধাম ঠিকানা টোকে, সরকারি লোক, তারা ব্যাজার মুখে বলে, এরা তো অ্যাটেণ্ডই করেনি, এদের বাসভাড়া দেব কি ?

সুদীপ্ত হেসে তানিয়াকে ডেকে বলল, ইয়োর ল্যাণ্ডলেস্' হ্যাভ অ্যারাইভড।

অ্যা, তানিয়া কাছে এসে তালেবদের দেখে।

সুধনের মধ্যে একটু একটু নেতাভাবের জোয়ার আসছে এই দেড়দিনে। ও দাঁত বার করে, হাত জুড়ে বলে, ম্যাডাম, ওদের ভাড়াটা দিতে বলুন না। গাঁটের পয়সা খরচ করে এসেছে।

সুদীপ্তর মধ্যস্থতায় এক এক প্লেট কড়কড়ে ভাত আর ঝোল খেয়ে ভূমিহীনরা সন্তুষ্ট। টাকা পাওয়া গেছে। ভিড় ভাঙার মুখে শঙ্কর একটু থমকে গিয়ে দাঁড়ায়। সন্ধের মুখ। সভা ভাঙছে। মানুষজন বাড়ি যাচ্ছে। গাড়িবারান্দায় হুস হুস করে এক একটা গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে, পেটের মধ্যে সায়েবমেমদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

সুধন্য, দিয়া দুজনেই নিজেদের ফোলিও ব্যাগ আঁকড়ে, দাঁড়িয়ে তাতে ব্রাউনের ওপর শাদা দিয়ে লেখা ঃ 'চাষিদের জলবণ্টন ও সিসটেম রক্ষণাবেক্ষণ কর্মশালা'। আমাদের ওইরকম ব্যাগ দেবে না ?

ব্যাগ না নিয়ে পৌঁছলে বিশ্বনাথপুরে কেউ কি বিশ্বাস করবে ? রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল কেরামতি করতে গিয়ে এ খবর তো চাউর হয়ে যাবে আগেই।

এখনো ডাঁই করা কিছু ব্যাগ টেবিলে, তবু কেরানীবাবুরা গোঁজ হয়ে বলে, না না, দেওয়া যাবে না। অ্যাডেণ্ট করেনি,—কিছু না, ব্যাগ কীসের !

সুদীপ্ত বলে, আরে দিয়ে দিন না দুটো ! কতদূর যাবে !

স্যার, দুটো কি পাঁচটা সেটা ব্যাপার নয়। অডিট ধরবে যে। ওদের জায়গায় অন্য তিনজনকে লোকালি নিয়ে আসা হয়েছে, তারা টি. এ নেয়নি, ব্যাগ নিয়ে গেছে তো !

সুদীপ্ত হেঁকে বলে, আপনাদের পকেট থেকে যাচ্ছে নাকি! আশ্চর্য তো, দিয়ে দিন!

বাড়তি ব্যাগগুলো হাতবদল হয়ে কোথায় যাবে ওর জানা।

কামারপাড়ায় বাস থেকে নেমে সুধন বলে, আয় হাঁটি। বাসে ভিড় ছিল না। ওরা ভালোমতন বসেই এসেছে। এত রাতে আপ বাসে কে চড়বে! বিশাখাপত্তনম্, বিজিয়ানগরমের ব্যবসাদাররা ট্রেনই পছন্দ করে বেশি, রাতের মাদ্রাজ মেল।

ঘোরলাগা কুয়াশায় দেহে শীত জড়িয়ে সুধন্যরা হাঁটে। দুই প্রান্তিক চাষি, তিনজন ভূমিহীন। ফোলিও ব্যাগগুলিকে কাঁখের শিশুর মতো সযত্নে নিয়েছে। হাতে থলে, পোঁটলা। খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পেরে দিয়া বগরুতীর পাঁজরের হাড় আনন্দে উঠছে পড়ছে। কামারপাড়ার টেম্পো, ট্রেকারঅলারা ঘুমোচ্ছে। এত রাতে কেউ যাবে না। আড়াই ক্রোশ তো রাস্তা বিশ্বনাথপুরের, এক ঘণ্টায় পেরিয়ে যাবে অনায়াসে।

রসিক ওঝা ওদের সঙ্গে ফেরেনি। পুরীর মন্দির দেখবে বলে রাতের উলটো বাস নিয়েছে। কিন্তু যাবার আগে একটু বিষ ঢেলে দিয়ে গেছে সুধন্যর প্রাণে।

রমেন দাস প্রথম দিন যে হম্বিতম্বি করছিল, দ্বিতীয় দিন কেবল মুচকি হাসি, মুখে কুলুপ। কেননা তুরস্ক-মুরস্ক কোথায় নিয়ে যাবে ওকে, ওর বউকে, সায়েবদের হুকুম। ওতেই তেজের দফারফা। কিন্তু যা সব বলছিল ও, সেই হিসেবগুলো কি মিথ্যে? প্রথম দিনের কথাগুলো?

কত-শো কোটি টাকা যেন ঋণ নিয়েছে সরকার, ওই কেনাল-সিস্টেমের নামে—চাষিদের বলেনি তো! একশো হাজারে লাখ হয়। একশো লাখে কোটি!

নতুন বাঁধ-কেনালে আখ হবে, তামাক, সূর্যমুখী, ফলফুলুরি। ধানের দিন শেষ। এই দক্ষিণের নোনা অঞ্চল থেকে হাজারে হাজারে চাষি জমি হস্তান্তর করে চলে যাচ্ছে কাজের খোঁজে। অন্য জেলা, পাশের রাজ্যের বড় চাষিরা বেনামে চষছে, অথবা কিনছে সেই সব জমি।

অত টাকা লোনের সুদই আরও কত কোটি টাকা! যদি জলকর চাষিই তুলবে তবে সবচেয়ে আগে চাষিদের মতামত নিলে না কেন? রমেন গর্জে উঠছিল প্রথম দিন বিকেলে। এখন ও ছ্যাঁকা-খাওয়া সার্কাসের বাঘ।

সারা দেশের হিসেব মেলালে এত টাকা লোন নেওয়া হয়েছে বিদেশীদের কাছে যে এখন থেকে যে বাচ্চা মায়ের পেটে আছে, সেও মাথাপিছু কতশো টাকার কর্জ নিয়ে জন্মাবে!

সুধন্যর মনটা খচখচ করে। ওর বউ পোয়াতি। আগামী বোশেখেই নতুন বছরের গোড়ায় ছেলে কি মেয়ে আসবে কিছু একটা। ধার নিয়ে জন্মাবে সুধনের প্রথম সন্তান। বাপের ধারই তো শুধতে পারেনি সুধন, আর এ তো না-হওয়া সন্তান। অথচ ওরা সবাই দুদিন হোটেলে খেয়ে মৌজ করে,

ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ঘরে এল। মুখে তালা আঁটার জন্য ঘুষ। ঘুষই তো বলে একে। সায়েব মহাজনের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা।

সেদিন মিত্তিরবাবুকে নিয়ে মিঞা টোলি, ঘাসে পাড়ায় কেন যে গেল সুধন! কেন যে ওভারসিয়ারের সবুজ জিপে বসতে গেল! সুদ দিতে-দিতেই সুধনের পলকা জীবনটা বেরিয়ে যাবে এবার।

বন পাহাড়ের রাজা

শশীবাবুকে আমি প্রথম দেখি মেজদাদের ঢেনকানলের বাড়িতে। ঠিক শহরে নয়, শহরতলি যেখানে আরম্ভ হয়েছে, রাস্তার দুধারে বাড়িঘর পাতলা হয়ে এসেছে, তারপর শালের চারা ও মহীরুহে আকীর্ণ টাঁড় জমি—। তারই কাছ ঘেঁষে ছোট একটা টিলার ওপর বাড়িটা। টিলার কোমরে বেড় দিয়ে পিচ রাস্তাটা সিঁড়ির নীচে পেঁচিছে। কুড়ি বাইশ ধাপ সিঁড়ি ভাঙলে তবেই বাড়ির ঢাকা বারান্দা। বাড়িটা ওখানকার রাজাদের কোনও জ্ঞাতিরই ছিল, তারা দেখাশোনা করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। তাই মেজদাদের সুতো কলকে লম্বা লিজ-এ দিয়ে দিয়েছে। ওই ঢাকা বারান্দা থেকে ডেনকানল শহরের ঘর-বসত চোখে পড়ত, নীলাভ ঢেউখেলানো পাহাড় দিগন্তে পিঠ দিয়ে ঘুমোত, বাড়ির কাছেই রোদে ঝলমল করে উঠত শালের জঙ্গল।

আমার বয়স তখন সাড়ে সতেরো। আমি এমনিতেই যাকে বলে ঠ্যাঙঠেঙে রোগা, রং কালো। বাড়িতে ফ্রকই পরি, কারণ শাড়ি পরার নানান ঝামেলা। জেঠিমা বলত, শাড়ি পরতে তিন-তিনটে জিনিস লাগে, ফ্রকে একটাই। আর তোর যা চেহারা, খুকি, তাতে কেউ তাকিয়েও দেখবে না—বলে চোখ মটকে হাসত। আমার লজ্জা হত, অপমানও। কারণ আমি তো নতুন শাড়ি-শায়া কিছুই চাইতাম না ওদের কাছে। মায়ের পুরনো শাড়িই পরতাম। বড় জোর দুটো নতুন ব্লাউজ ঘরে মা-ই বানিয়ে দিত। কিন্তু ওই বয়সে বেড়ে না ওঠার লজ্জাটা শাড়িতে যেমন ঢাকা যায়, ফ্রকে ততটাই প্রকট হয়ে পড়ে পথেঘাটে। সেটা আমাকে ভীষণ কষ্ট দিত। কিন্তু বাবা মারা যাবার পর মা নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। এই সব ব্যাপারে জেঠিমার ওপরে কারও কথাই চলবে না জানতাম।

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতন আমি এইরকম বয়সে জলবসন্তে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লাম। অসুখটা আমার ভাই বাপ্পা স্কুল থেকে বাধিয়ে এনেছিল। বাপ্পার থেকে আমার হল। বেশ ভালরকমই হল। প্রবল জ্বর, সারা শরীরে ব্যথা, রাতে প্রলাপ বকা থেকে দিনে নানা কুস্বপ্ন দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠা! মায়ের রাত জাগা, দিনে রান্নাবান্না। চোখে চশমা ছিলই, কিন্তু দৃষ্টি আরও ক্ষীণ হয়ে গেল বসন্তের পর। মুখে, হাতে, গলায় এত দাগ যে মা-জেঠিমার মাথায় হাত। নাকের পাটার ওপর একটা গুটি খুঁচিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা একটা খোয়া যাওয়া নাকছাবির দাগের মতন দেখাত।

এইরকম সময়ে মেজদা আমাদের বাড়িতে এল। মেজদাদের হেড অফিস ছিল কলকাতায়। তিন চার মাসে একবার কলকাতায় আসত কাজে। মেজদা

আমার পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে বলল, চল বুঁচি, আমাদের বাড়ি চল। শরীরটা সারিয়ে আসবি। আমার ভাল নাম অনিন্দিতা, ডাক নাম টিয়া। কিন্তু জেঠিমা-জেঠু খুকি বলেই ডাকতেন। আর সবাই ইচ্ছেমতন নাম বদলে বদলে ডাকত। এটাও আমার একদম ভাল লাগত না।

মেজদা আমার নিজের দাদা নন, মায়ের বড় মাসির ছেলে। বিহারে জন্ম, ওখানেই মানুষ। কিন্তু বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, মেজদা একবার তিনমাস আমাদের বাড়িতে ছিল, কলকাতায় নানা লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করত। সেই কৃতজ্ঞতার রেশ চাকরি পাওয়ার ও আরও ওপরে উঠে যাওয়ার পরও উবে যায়নি।

মা শুনে কৃতার্থ হয়ে গেলেন। তবু একটু ভয়ে-ভয়েই বললেন, মৌসুমী জানে না তো! মৌসুমী মানে মেজবৌদি। মেজদা হেসে বলল, আমরা গেলে দেখতে তো পাবেই। মেজদার এই স্নেহও অবশ্য পুরোপুরি নিঃস্বার্থ ছিল না, সেকথা আমরা সকলেই জানতাম। ওদের ছেলে টুবলা তখন মাস চারেকের, দেখাশুনোর জন্য স্থানীয় লোকজন আছেই। মেজদার শাশুড়ীর বক্তব্য হল, নিজের ভাষা অনবরত না শুনলে ছেলের মুখে বুলি ফুটবে না। সুতো কলের জি. এম-এর বৌ-বৌদির অনেক কাজ ঘরে ও বাইরে—সামাজিক দায়। কাজেই টুবলার কানে কলকলানোর অনেকটাই আমাকে করতে হবে।

তবুও আমার ভাল লেগেছিল মেজদার সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে চলে আসতে। কলকাতা থেকে রাতের গাড়িতে কটক। সেখান থেকে ঢেনকানল। মটরগাড়ি চড়ার উল্লাসে মনের মধ্যেটা কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। পিছনের সিটে আমি আর মেজদা। সামনে ওদের মিলের একজন ভদ্রলোক। মালগোদাম অঞ্চলটা ঘিঞ্জি, ট্রাকে বোঝাই। কিন্তু একটু এগিয়ে ডাইনে ঘুরে চেক-গেট পেরোতেই হলুদ রোদে দূরের পাহাড়শ্রেণী, উঁচু নীচু জমি, জঙ্গল ঝলমল করে উঠল।

মেজদাদের বাড়িতে পেঁছোনোর সম্ভবত তিনদিনের মাথাতেই আমি শশীবাবুকে দেখি। তেল দিয়ে পাট করে আঁচড়ানো ঘন চুল, ঘি রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা, চুলের মতনই পুষ্ট কালো গোঁফ, মুখে একটা কৃতার্থ হয়ে যাওয়া মৃদু হাসি।

মৌসুমী বৌদি তখন নিত্যানন্দ, মানে, যে ছেলেটা বাজার আর রান্না করে তাকে বকছিলেন, আলু-পেঁয়াজ আনেনি বলে।

শশীবাবু বারান্দার সামনে নুয়ে দাঁড়িয়ে ক্যাকটাসগুলোকে খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তলার নুড়িগুলোকে উল্টেপাল্টে দিচ্ছিলেন। বারান্দার পাশ দিয়ে গেলে বাড়ি থেকে বেরোনোর একটা খিড়কি পথ ছিল, সেই পথে নীচে আসার সিঁড়ি ভাঙতে হত না।

মেজবৌদি বাইরে আসতেই শশীবাবু কেমন একটা সন্ত্রস্ত মুখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, হাতজোড় করে নমস্কার করার সময় ওঁর ঘাড়টা কাত হয়ে গেল। উনি যে কোনও কাজে এসে থাকতে পারেন, দেখলাম মেজবৌদি সেটা খেয়ালই করলেন না। বেশ তেজী গলায় বলে উঠলেন, এই যে শশীবাবু, দু

কেজি আলু আর এক কেজি পেঁয়াজ এনে দিন তো। আপনি তো ওদিকেই থাকেন।

বাজারের দিকেই শশীবাবুর বাড়ি। কিন্তু আলু-পেঁয়াজ পৌঁছতে গেলে ওঁকে আবার এদিকেই ফিরতে হবে। এমন ধরনের অনুরোধের মধ্যেই একটা প্রচ্ছন্ন অন্যায় আছে।

শশীবাবু হাসিমুখে বলে উঠলেন, এ আর বেশি কথা কী মা, দিন—একটা থলে দিন না।

সাইকেলটা নিয়ে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন, ফিরেও এলেন সেইরকম খর-রৌদ্রে, পিঠের কাছে পাঞ্জাবিটা ঘামে ভেজা। থলে না খুললেও বোঝা যায়, যেরকম যত্নে ভদ্রলোক ক্যাকটাসের টবের নুড়িগুলোকে উল্টেপাল্টে দিচ্ছিলেন, সেই একই মমতায় প্রতিটি নিখুঁত আলু আর নিষ্কলঙ্ক পেঁয়াজ বেছে এনেছেন।

বাজার দেখে মেজবৌদির মুখ প্রসন্ন হল, শশীবাবু কিন্তু কোনও সম্ভাষণ বা ধন্যবাদ পেলেন না।

শশীবাবুর বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে বলেই মনে হত। নিশ্চয়ই ঘরে ওঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছিল। তাদের কথা অথবা শশীবাবুর জাগতিক কুশল নিয়ে কোনওরকম আলাপ শুনেছি বলে আমার এখন মনে পড়ে না। গরমের দিনে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল অথবা এক কাপ চা শশীবাবুকে কেউ কখনও দিত না। কলকাতায় আমাদের গরিব ঘরে কেউ এলে আমি নিজে থেকেই চা-জল দিতাম, বলতে হত না। জি. এম-এর বাংলোয় আমার সে সাহস হয়নি। মেজবৌদি বলত, বেশি খাতির করলে এখানকার লোক মাথায় চড়ে বসে। অথচ শশীবাবুর মতন একজন মাঝবয়েসী লোক শোবার ঘরে দিনদুপুরে ঢুকে পড়েছেন, মানে ওঁকে ডেকেই আনা হয়েছে, এতে কারও কিছু মনে হত না।

লোকটির কাছে একটা কালোর ওপর লাল সুতোর কাজ করা ঝোলা সর্বদাই থাকত। কখনও কাঁধে, কোনও দিন সাইকেল-এর কেরিয়ারে রেখে আসতেন। সেই আশ্চর্য ঝোলার মধ্যে একটা মহা পৃথিবী ধরে যেত। নাট-বল্টু, স্ক্রু ড্রাইভার, টেস্টার, গালা, কাঁচি, সুতো, ছুঁচ, মোম…কী নেই! একবার অসময়ে বাড়িতে লোকজন এসে পড়েছেন, মেজবৌদি মশারির দড়ি খুঁজতে গিয়ে রাগের মাথায় ড্রয়ার টেনে ফেলে দিচ্ছেন, এমন সময় শশীবাবুকে কে যেন বাইরে থেকে ডেকে আনল। উনি একটা লাইব্রেরির বই ফেরানোর জন্য নিয়ে যেতে এসেছিলেন। শশীবাবু পাম্পশু শ্রদ্ধাভরে বাইরে খুলে রেখে ঝোলা থেকে একরাশ দড়ি বার করে বৌদিকে দিলেন। সায়া বা পাজামায় পরানোর জন্য আনকোরা নতুন দড়ি। ছ-সাত মিটার মতন। তাও ওই লোকটি সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সত্যিই একদিন মাঝদুপুরে ওঁকে বৌদিদের শোবার ঘরে দেখেছিলাম। টুবলাকে যে দেখে সেই হিরণ পিছনদিকে নিজের ঘরে খেতে গেছে, মেজদা

অফিস থেকে লাঞ্চ-এ ফিরেছেন। ডাইনিং টেবিলে মেজবৌদি মেজদার সঙ্গে খাচ্ছেন। আমি টুবলার কাছে বসে আছি।

এমন সময় ব্যস্তভাবে শশীবাবু এসে ঢুকলেন। সঙ্গে একটি রোগা ছেলে, মাথায় কোঁকড়া ঝাঁকড়ামতন চুল। তার কাঁধে মই। দেওয়ালে টিউবলাইটের ফ্রেম ইত্যাদি লাগানোই ছিল। বৌদি কয়েকদিন ধরেই বলছিলেন ছোট বাল্বে ভাল আলো হয় না, খরচও বেশি—তাই ইলেক্ট্রিসিয়ান এসে ফ্রেমটা ফিট করে দিয়ে গিয়েছিল, হয়তো বাল্বটা তখন কাছে ছিল না। ছেলেটা মই ধরল দু' হাতে চেপে। শশীবাবু স্নেহভরে আমাকে বললেন, খুকু আসুন তো, আমাকে একটু বাল্বটা তুলে দেবেন। 'খুকু'র সঙ্গে 'আসুন' আমায় মুগ্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝলাম, এ বাড়িতে আমাকেই শশীবাবু ডাকতে পারেন। উনি আবছাভাবে বোঝেন, কে কোথায় দাঁড়িয়ে। শশীবাবু তাহলে বিজলির কাজও জানেন! টুবলাকে বিছানায় রেখে আড়াআড়ি লাঠির মতো আলোটা ওঁর হাতে তুলে দিলাম। ঘরে একটা ষাট পাওয়ারের বাল্ব ছিল, তার মাথায় সেকেলে ধাঁচের টোপর। গম্ভীর মুখে শশীবাবু মইটার জায়গা বদল করে সেইটাও টেস্ট করতে গেলেন। দেখা গেল বাল্বটা জ্বলছে না।

ইস্, ফিউজ হয়ে গেছে!

কী হবে! মেজবৌদির হয়ত খেয়াল চাপল আজ সন্ধেবেলা ওটাই জ্বালবেন!

বেশ তো। ঝোলাব্যাগে হাত দিয়ে আর একটা বাল্ব বার করে আনলেন শশীবাবু।

আপাতত এটা লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, আমার নিজের জিনিস, পরে দিয়ে দিলেই হবে। বলবেন বৌদিমণিকে।

পরে জেনেছিলাম এই সব ঝড়তি-পড়তি কাজই আসলে শশীবাবুর জীবিকা। এই বাড়িতে কোনও কাজেরই মূল্য পেতেন না উনি। শহরে এমন কত বড় বাড়িতে এ ধরনের ফাইফরমাশ খাটতেন, আন্দাজ করার চেষ্টা করিনি। খাটতেন নিশ্চয়ই। কারণ, মনে হত, এই সব পরিবেশে আপনমনে কাজ করেও উনি আনন্দিত, কৃতার্থ বোধ করছেন। হয়তো তোবড়ানো ডেকচির পোড়া তলদেশের মতন ওঁর একটা সংসার আছে, যেটার কথা শশীবাবু কাউকে বলতে চান না। বাড়িতে দুটো মোটে ঘর, বারোয়ারি বাথরুম, সেখানে আড্ডা বসানো যায় না। বাড়িতে হয়তো ওঁর হাঁপানির রোগী আইবুড়ো বড় ভাই থাকে, বৌয়ের ছেঁড়া শায়া সস্তা শাড়ির নীচ দিয়ে উঁকি মারে, দুটো অসুন্দর ছেলেমেয়ে সারাদিন খাই-খাই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে—নেহাত ঘুমে শরীর জড়িয়ে না এলে বা ক্ষিদেয় পেটে মোচড় না দিলে শশীবাবুর ওই বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছেই করে না।

একদিন হঠাৎ সব কিছু বদলে গেল। মেঘের ঊর্ণাজাল ভেঙে যেমন পূর্ণিমার চাঁদ বার হয়ে আসে, তেমন সাংসারিক ঝুলকালিমাখা সঙের মুখোশ খুলে ফেলে শশীবাবুর অস্তিত্ব চিরে একজন মানুষ বের হয়ে এল।

সেই কথাটা এতদিন পরেও যতবার ভাবি, আমার গায়ে রোমাঞ্চ হয়।

অথচ শশীবাবুকে কোনওদিন যে কেউ বসে বাঁশি বাজাতে বলবে এটা আমার মনেই হয়নি। দুটো কথা বলার জন্যই ওঁকে বসতে বলেনি কেউ। দাদাই বলেছিল, শশীবাবু, আপনি বাঁশিটাশি বাজান না! একটু বাজিয়ে দেখান না এদের!

এদের মানে মেজবৌদির ভাই, ভাইয়ের বৌ, তাদের দুই বন্ধু, বন্ধুর অল্পবয়সী মেয়ে ইত্যাদিদের। এরা কলকাতা থেকে গতকালই এসে পৌঁচেছে। শালবন, সূর্য ওঠা এই সব দেখে বিস্ময়, মুগ্ধতা কিছুই কাটেনি। সবতাতেই এ ওকে ঠেলে গড়িয়ে যাচ্ছে। মেজবৌদির বানানো লিস্ট থেকে রান্না হচ্ছে। দুপুরের খাওয়া শেষ হতে বিকেল হয়েছে। কাজেই রাতের রান্না এগারোটার আগে হওয়ার কোনও আশা নেই। দক্ষিণের বারান্দায় সতরঞ্চি পেতে হারমোনিয়াম রাখা হয়েছে। সন্ধে থেকে নানা শৈলীর রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, গণসংগীত শুনে আমি হয়রান হয়ে গেছি। আমি নিজেও একটু-আধটু গাই, ওদের চেয়ে খুব খারাপ যে তাও নয়, কিন্তু বৌদি আমাকে গাইতে বলবে না আমি জানি। তার ওপর টুবলা আমার কোলে। নটার পর টুবলা ঘুমোলে আমি হাতদুটো মাথার ওপর তুলে টান-টান করে নিলাম। মায়ের একটা পুরোনো চাঁপারঙের শাড়ি পরেছি, নিজের নতুন ব্লাউজের সঙ্গে। বারান্দার ফাঁক ঘুরে গানের আসরের পুরোনো থামগুলির কাছে ফিরে আসতে আসতে আমি শশীবাবুর মৃদু লজ্জিত আপত্তি শুনছিলাম।

না না, সে আবার কি, আমার আবার···

বৌদির ভাই সুমন্ত্রদা বেশ ভারিক্কি চালে বলে উঠলেন, তাতে কি, বাজান না—আমরাও কি আর আসরে গাই!

•

মেয়েরা কেউ কোনও আগ্রহ প্রকাশ করল না। অথচ বিস্ময়মাখা নিস্পৃহতা নিয়ে শশীবাবুর সামান্য নুন-পড়া গাছের মতো ভঙ্গি দেখতে লাগল। শশীবাবুর মতন মানুষকে শিল্পীর আসনে চট করে বসাতে এদের যে মান টনটনিয়ে উঠছে বোঝা গেল। শশীবাবু আবার কৃতার্থভাবে হেসে নুয়ে পড়ে বললেন, আমি সামান্য লোক, আপনাদের সামনে···

দাদা ব্যস্তভাবে বসার ঘরের দিকে হেঁটে চলে গেলেন। তাতে শশীবাবুর সম্ভ্রম আবার ঝট্ করে নেবে গেল। মেজবৌদি অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলেন, বাজাবেন তো বাজান না, অত সাধাসাধির কী আছে, দেখছেন তো রান্না শেষ হতে ঢের দেরি···

ওদেশে তখনও টিভির জমানা শুরু হয়নি, এটা বলা প্রয়োজন এখানে।

শশীবাবু একটু ইতস্তত করে ডেকে উঠলেন, খোকন, অ্যাই খোকন!

সেই ছেলেটা এল দেখলাম। এরই নাম খোকন। শশীবাবুর ভরদুপুরের বিজলি বাতির শাগরেদ, যে মই ঘাড়ে এসেছিল। লিকলিকে রোগা, ঝাঁকড়া

চুল। কোথা থেকে বেরিয়ে এসে একটু উঁকি মেরে, দাঁড়ান, আনছি বলে চলে গেল। এরা যেন বড় এই অন্যমনস্ক বাড়িটার ফাঁকে-ফোঁকরে কোথাও অনায়াসে লুকিয়ে থাকে। এক লহমায় ফিরে এল ডুগিতবলা সঙ্গে নিয়ে। এটাও কি বসার ঘরের কোনও কোণায় থাকে অথবা রান্নাঘরের পিছনে! আত্মমগ্নভাবে হাতুড়ির ঠুক্ ঠুক্ আরম্ভ করে দিল খোকন।

যেন দম বন্ধ করে থাকতে থাকতে নিজেরই পাঁজর ফাটিয়ে হা-হা করে ছুটে এল হাওয়া। আকাশে তারা দেখা যায় না, হাল্কা আগুনের মতো অন্ধকার তার অবয়বে জড়িয়ে রয়েছে, ওরা কি মেঘ?

শালবনের আদিম গন্ধ বকুলের স্মৃতি ভারাতুর সুবাসে মিশে যাচ্ছে টের পাচ্ছিলাম।

শশীবাবু ঝোলা হাতড়ে একটি চিকন কালো আড়বাঁশি সাবধানে বার করে আনলেন। প্রথমে দারুণ স্নেহে একটি আঙুল বুলিয়ে আনলেন বাঁশির সর্বাঙ্গে, যেন মীড় দিচ্ছেন। তারপর চোখ বন্ধ করে মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে বললেন, মিয়াঁ কি মল্হার বাজাই?

কেউ উত্তর দিল না। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে শশীবাবু তাঁর হাওয়া-যন্ত্রে ঠোঁট রাখলেন। ঘরের ভেতর থেকে আমি একদৃষ্টে ওঁকে দেখছিলাম। দেখছিলাম চুম্বনযোগ্য দূরত্বে প্রেমিকার সান্নিধ্যে এলে প্রেমিকের মুখ যেমন প্রেমে ও কাতরতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমন আলোমাখা তন্ময়তায় শশীবাবু বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। প্রথম দু'এক মিনিট কিছু বোঝা গেল না। আলাপের লজ্জা কাটিয়ে সুর যেন শালবনে অন্ধকারে খেলা করে বেড়াচ্ছে, এমন মৃদু অথচ বিহ্বল। তার পরে বাঁশির চলন দ্রুত হল। আকাশের কোথায় কী হচ্ছে স্পষ্ট না হলেও আমার মনে হচ্ছিল, আমাকে ঘিরে বৃষ্টি পড়ছে। আমি যেন এক কিশোরী শালতরু। আমার মাথায়, কাঁধে, বাহুতে বৃষ্টি পড়ছে। অতিথিরা সামান্য অবিশ্বাস নিয়ে শশীবাবুকে দেখছেন। শশীবাবুর চোখ দুটি বন্ধ।

আজ আমি বুঝি, সেদিন যদি শশীবাবু মিয়াঁ কি মল্হার না বাজিয়ে দরবারী কানাড়া বাজাতেন, তবুও বৃষ্টি আসতই। কিন্তু সাড়ে সতেরো বছর বয়সে বৃষ্টির প্রায় আছড়ে পড়া সুবাস বুক ভরে নিতে নিতে আমি কোনও বিশ্লেষণমুখী দৃষ্টিকোণে দাঁড়াবার অবস্থায় ছিলাম না। আমি ভাবছিলাম বাঁশি বৃষ্টি আনছে, মলহার বৃষ্টি আনছে।

এবং বৃষ্টি হল—সত্যিই।

ঝলকে ঝলকে পাগল হাওয়া, বৃষ্টি। সুমন্ত্রদার বন্ধুর মেয়ে ছাঁট থেকে শরীর ও আঁচল বাঁচাতে সরে অনেকটা দেওয়ালের দিকে এল, সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা। কিন্তু তিনদিক খোলা বারান্দায় বৃষ্টি কোনও বাধা, আব্রু মানল না। শেষে মেয়েরা ইস্ মাগো অসভ্য বলতে বলতে ঘরের ভিতর ঢুকে এল। ছেলেরাও গম্ভীরভাবে হেঁটে ভিতরে। বসার ঘরের সোফা দুটো ভরে গেল। আমি আরও পিছনে দাঁড়িয়ে, প্রায় দরজার পাল্লার আড়ালে।

দ্রুততম সঞ্চারে পৌঁছে মল্‌হার তখন কান্নায় ভেঙে ভেঙে পড়ছে। শশীবাবু ভিজছেন। ওঁর পিঠ, চুল, কপাল, সারা শরীর বেয়ে জলধারা গড়াচ্ছে। চোখ দুটি একবারও খোলেননি। পাথরের মতন স্তব্ধ, কেবল আঙুল কটি প্রিয় ওষ্ঠাধরে খেলা করেছে। খোকন বিস্ফারিত চোখে বাজিয়ে যাচ্ছে। সাপের মতন অগোছালো চুল ওর কপালে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে। কৃশ গলাটা পল্‌কা ঘাড়ের ওপর নড়ছে। কখনও ক্রূর ভাবে হাসছে খোকন, কখনও ভুরু কোঁচকাচ্ছে। ও-ও আপাদমস্তক ভিজে গেছে। গান্ধারকে লঘু পায়ে অতিক্রম করে ঋষভ থেকে মধ্যম পঞ্চমে যাচ্ছে বাঁশি, আবার মধ্যম থেকে ঋষভে নামার সময় রোমাঞ্চ তুলছে শরীরে।

আমি যেন বুঁচি বা খুকি নই, বাঁশি আমাকে যুবতী রূপলাবণ্যময়ী মল্লারিকা করে দিয়েছে। চাঁপাফুলের মতো গায়ের রং, কেশদামে চাঁপার মালা, দুই কানে চাঁপাফুলের কর্ণভূষণ, বাহুবন্ধে কঙ্কণও চাঁপার, যেন রাতের দ্বিতীয় প্রহর সত্যিই অতীত, ঘন বর্ষার নিঃসঙ্গ নিশি। শোকাকুল মল্লারিকা মল্‌হারের বিরহে অস্থির চঞ্চল হয়ে শেষে ক্রন্দন করতে করতে লুটিয়ে পড়ছেন। মায়ের পুরোনো শাড়ির নীচে সদ্যোদ্ভিন্ন, লোকলজ্জা-কাতর আমার বুক দুটি যেন সত্যিই উদ্ধত কঠিন হয়ে উঠতে চাইছিল।

সেই মুহূর্তে, এবং সেই একটি মুহূর্তে শশীবাবু আমার সামনে মেঘভাঙা চাঁদের মতন উদ্‌ভাসিত অবয়ব নিয়ে বেরিয়ে এলেন। নির্মীলিত চোখ, স্তব্ধ, আপাদমস্তক ভেজা ওই সামান্য লোকটি হয়ে গেলেন সেই সন্ধের বৃষ্টিস্নাত বন ও পাহাড় শ্রেণীর রাজা, মল্‌হারের প্রাণ। ওঁর প্রতিদিনের গ্লানি ও তুচ্ছতার অপমান আমায় নিজের সুন্দরতার দেয়ালে মিশে থাকার লজ্জায় প্রথমে লীন হয়ে গিয়ে, একেবারে ধুয়ে মুছে মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে জেগে রইল কেবল একটি আড়বাঁশি, মুগ্ধ বিহ্বল সিক্ত দুটি ঠোঁট।

একসময় বাঁশি থামল—সঙ্গতও। বৈঠকখানায় সোফায় কেউ ছিল না, সবাই চলে গেছে। শশীবাবু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস চেপে উঠলেন। তারপর উনি আর খোকন যত্ন করে হারমোনিয়াম, তবলা তুলে ভেতরে রেখে এলেন। ভেজা সতরঞ্চিটা ভাল করে পাট করলেন, কেন জানি না। আমাকে ওঁরা কেউ দেখতে পাননি।

তারপর ওই বড় বাড়িটার নিস্পৃহ ভাঁজে কোথায় যেন খোকনকে রাতের মতো লুকিয়ে রেখে আপাদমস্তক ভেজা শশীবাবু ধীরে ধীরে হেঁটে গেট পার হয়ে চলে গেলেন।

বিরিয়ানির জাফরানের গন্ধ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে কিছুটা দূর ওঁর পিছু নিয়েছিল। শেষটায় না ছুঁতে পেরে ফিরে এল।

ফুটপাথে উবু হয়ে বসে যতীন গামছা বাছছিল। আচমকা একটা 'বাবা' ডাক তার অবচেতন ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। এখানটায় দিব্যি ছায়া। যতীনের যৌবন-কালে শ্রাবণের শেষে কী ভাদ্রের গোড়ায় এমন ছায়া থাকত না এই পথে। বছর কুড়ি আগে একটা গুলমোহর, দুটো বাদামগাছ কীভাবে যেন তরতরিয়ে বেড়ে উঠে আকাশটাকে নয়নপথ থেকে আড়াল করে দিয়েছে। ফুটপাথের কংক্রিটে গাঁথা বুক থেকে কী যে আনন্দ পেয়েছে গাছ তিনটে, ক্রমাগত হেসে হেসে পাতার ঝাঁক এ-ওর গায়ে ঠেলে দিচ্ছে। তবে গাছ মানেই পাখিপাখালি। গামছাওলা প্রিয়নাথ তাই একখানা নীল প্লাটিক টাঙিয়ে নিয়েছে দোকান বাঁচাতে। সামনে ছোট একটা লণ্ড্রি, বাইরে তাদের তোলা উনুন, একটা মিষ্টির দোকান, এ ছাড়া বাকি সব গৃহস্থবাড়ি দু'ধারে। শ্যামানন্দ রোড সোজা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই মন বদলে বকুলবাগান হয়ে গেছে এক সময়। এখানকার এক অনিশ্চিত বাঁকে যতীন দু'কিলোমিটার হেঁটে গামছা কিনতে এসেছে। একটু আগেই মথুর অয়েল মিল থেকে সরষের তেলও কেনা হয়েছে, যতীনের পাশে থলে তার ভিতর তেলের গাদমাখা টিন। হাঁটুর ঠিক নিচটায় চোট পেয়েছিল কদিন আগে, এখনও ডান পা তুলতে গেলে ব্যথাটা টন্‌টন্‌ করে ওঠে, যদিও সমতলে পা ফেলতে অতটা কষ্ট হয় না। সেই যুক্তিতে যতীন ভালরকম হেঁটে বেড়ায়, হেঁটে আনন্দই পায়, বলা যেতে পারে। কালীঘাটের দেড় কামরার ঘুপচি বাসায় তার হাঁপ ধরে এমন দুপুর বেলা।

বেরুবার মুখে অভ্যেসবশে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিল, আর কিছু আনতে হবে নাকি ? তোমার কিছু চাই ?

সোহাগবালা স্টোভে কেরোসিন ভরছিল। পিঠের ওপর ছড়ানো কাঁচা-পাকা কোঁকড়া চুল। শীর্ণ হাতে ব্রোঞ্জ ও কাচের চুড়ি মিশিয়ে পরা। সাদা ব্লাউজ, আধময়লা সাদা প্রিণ্টের শাড়ি, কালো ফ্রেমের চশমার পিছনে চোখ দুটোও হেসে উঠেছিল। আর সব একে একে হরণ করে নিলেও সোহাগের চোখ ও ঠোঁটের যুগপৎ হাসিখানি নিতে পারেনি সময়। সোহাগ ঘাড় দুলিয়ে তরুণীর মত বলেছিল, আমার জন্যে ? কি আনবে বল তো ? তা আজকের দিনে একখানা গামছাই এনো না হয়—লাল !

রাঙা গামছা একখানা ? বেশ।

কালীঘাটের মোড়ের ফুটপাথে বসত প্রিয়নাথ। কিছুদিন হল সে দোকান তুলে চলে এসেছে এতদূর শ্যামানন্দ রোডে। প্রিয়নাথের সঙ্গে যতীনের সম্পর্ক বলতে গেলে সেই পঞ্চান্ন সাল থেকে। পঞ্চান্নই, কারণ টুলু হয়েছিল সে বছর। দীর্ঘ ফুটপাতের নানা খাঁজ-খোঁজ থেকে যতীন তার নতুন পোয়াতি

বউয়ের জন্য টুকিটাকি সওদা করছিল—চুলের কাঁটা, চিরুনি, মশারির দড়ি, চপ্পল। আর হ্যাঁ, একটা ভাল অ্যালুমিনিয়ামের মগ এনো তো, সোহাগ বলেছিল। সেবার গামছাটা ছিল যতীনের নিজের সংযোজন। প্রিয়নাথ যেমনটি বোঝে তাকে, তেমন আর কেউ বোঝে কি? যতীনের নাড়িনক্ষত্র জানে প্রিয়নাথ। প্রথমে সে কিছুই বলবে না, কিছু দেখাবে না, অন্যদিকে তাকিয়ে থাকবে। তারপর সন্তর্পণে পাঁচহাতি একটা গামছা খুলে দেখাবে, অবাস্তব একটা দাম বলবে। পাঁচহাতি যতীন চায়ই না, সাড়ে তিন হাত পর্যন্ত তার দৌড়। তিন হাতের অনুপাত মনে মনে করে যতীন একটা বিশ্রী রকমের নিচু দাম বলবে। শ্লেষে ফেটে পড়বে প্রিয়নাথ। বলবে, জিনিস কিনতে এসেছেন, না শুঁকে দেখতে! ওই রকম বা ওর চেয়েও খারাপ কিছু! লম্বা পায়ে হেঁটে যাবে ক্রুদ্ধ যতীন, ভিড়ে-ভরা হকার্স কর্নারের ফুটপাথ ধরে। নানা মানুষের ভিড়ে তার অবয়ব হারিয়ে যাওয়ার আগেই, প্রিয়নাথ একটু নামবে, তবু ফিরে তাকাবে না যতীন, তখন প্রিয়নাথ আরও নামবে। যতীন যদি তখনও ফিরে না আসে, পাতা ইঁট ছেড়ে ফুটপাথের মাঝবরাবর উঠে আসবে প্রিয়নাথ, জোরে জোরে ডাকবে তাকে, ও মশাই, মশায়, আরে হলটা কী বলে। তখন যতীন ফিরবে, শ্লেষ ফুটবে যতীনের গলায়। এইভাবে চলতে চলতে কমপক্ষে আধঘণ্টায় একটি গামছা রফা হবে, তাও যদি রঙ উঠে যায়, তা হলে পরের দিন আবার···এ এক অদ্ভুত খেলা তার ও প্রিয়নাথের। এর তাৎপর্য লোকচক্ষে স্পষ্ট নয়। শ্যামানন্দ রোডের স্নিগ্ধ ও তুলনামূলকভাবে অনাবিল ফুটপাথে এই খেলা একটু সতর্কভাবে, অন্য প্যাটার্নে খেলতে হয়। সুযোগ যখন পেয়েছে আজ, এখানেই চলে এসেছে যতীন।

হুমড়ি খেয়ে বসা অবস্থাতেই যতীন আবার শুনল—বাবা! এবার আর অবচেতন নয়, কানের কাছ ঘেঁষে বেশ স্পষ্ট ডাক—চাঁছা গলা।

মাথা পুরো না ঘুরিয়েই হলুদ শাড়ির ঝলক দেখতে পেল যতীন, কালো পাড়, স্যাণ্ডেলের ফাঁক দিয়ে, উঠে যাওয়া নখপালিশ। তারপর থলে সমেত তেলের টিনটা হাতে করে শাস্তি পাওয়া ছেলের মতন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে।

এইটুকু সময়ের মধ্যেই হাঁটুর কলকব্জা জমে গেছে। তুমি এখানে কী করছ? খুকুরানীর ভুরু কুঁচকে আছে। গলায় ঝাঁজ। দেখ দিনকাল—যতীন ভাবল কোথায় সে শুধোবে, এই দুপুররোদে চন্দননগরের ইস্কুল পালিয়ে তুই এখানে কী করছিস, না এই একরত্তি মেয়ে আগবাড়িয়ে তার কৈফিয়ত চাইছে!

প্রিয়নাথ বুঝেছে দরাদরি আর হবে না, সময় খারাপ। একটা পুরনো কাগজে গামছাটা মুড়ে বেঁধে নিঃশব্দে যতীনের দিকে বাড়িয়ে দিল।

অল্প এগিয়ে খুকু আর একটা গাছতলায় বাবাকে আবার কোণঠাসা করে ধরে।

তেল কিনতে এসেছিলাম।

তেল কিনতে এতদূর! আচ্ছা কী বলব তোমাকে বল তো বাবা! সর্বত্র

আজকাল পলিপ্যাকে তেল পাওয়া যাচ্ছে!

ওসব মুখে দেওয়া যায় না, ঝাঁজ নেই—ছোটবেলা থেকে তো দেখছিস, এখান থেকেই বরাবর নিয়ে যাই। তুইও এসেছিস কতবার! দোকানের তেলের খালি প্লাস্টিকের বোতল একবার তেলকলে নিয়ে গিয়েছিল যতীন। ঘানির তেল ন'শ ধরল ওতে, বেশি না—মানে প্রত্যেকবার একশ তেল কম পাচ্ছে, তাই তো! এদিকে দাম বেশি, ওদিকে ওজন কম। বছরের যদি বারো ইনটু আড়াই, মানে তিরিশ কেজি তেল কেনে, তাহলে কত টাকা বেশি পড়ছে—এসব খুকুকে বোঝাবে সাধ্য কার! হয়তো বলবে, ওই কটা টাকা বছরে বাঁচাতে এতদূর হাঁটা, কোনও মানে হয়? তোমার পা পুরো ভাল হয়েছে? হয়নি, খোঁড়াচ্ছ—দেখি? নতুন ডাক্তারের মতন একটু পিছিয়ে, বেঁকে দেখতে চায় খুকু।

ময়লা পায়জামাটা অপরাধীর মতন তুলে ধরে যতীন মেয়েকে কাটা দাগটা দেখায়। এখনও কাঁচা, আশপাশের চামড়ায় কালশিটের দাগ। এখন তো পায়ে ব্যথা নেই, ব্যথা কেবল সিঁড়ি দিয়ে উঠতে, তবু মেয়ে বলবে—খোঁড়াচ্ছ! কী আর বলতে পারে যতীন, জোর যার মুলুক তার!

তুমি এখানে দাঁড়াও।

হুকুম দিয়ে মেয়ে চলে যায়। যতীনের গলা থেকে একটা কাতর নিষেধ বেরোতে গিয়েও বেরোয় না। পাগলটা ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি ডাকতে গেল নিশ্চয়ই। ও কি জানে, এই পা নিয়ে আর এইভাবে কত হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছে যতীন! মেয়ের উড়ন্ত আঁচল, গম্ভীর খোঁপা, কালো ব্লাউজের ওপর গ্রীবার শ্যামল রঙে চিক্‌চিক্ করে ওঠা হারখানি, চোখে বেশ লাগে যতীনের ওর হাঁটার মিলিটারি ভঙ্গি। নাঃ, মেয়েটা বেশ স্মার্ট হয়ে উঠেছে বলতে হবে। কেমন যতীনকে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গেল! ইজের আর টেপফ্রক পরা ন্যাড়া-মুণ্ডি এই খুকু হারিয়ে গিয়ে কী নাকালই না করেছিল যতীন আর সোহাগকে! ও যখন ফিরে এল তখন নাকের শিকনি, চোখের জল, কাজল-ফাজল সব গালে লেপে-পুঁছে একাকার।

মিছিমিছি ট্যাক্সি করালি, এইটুকু পথ তো হেঁটেই যাই! মিনমিন করে যতীন বলে। বলে পিছনে ঘাড় হেলিয়ে বসে সে ট্যাক্সির ভেতরে ছুটে আসা এলোমেলো হাওয়ার স্বাদগন্ধ পায়। ভালই তো লাগছে। চেনাশোনা এই পথঘাট, গলি, সিনেমার পোস্টারের পাশ দিয়ে বহু দশক সে এমন ঝড়ের মতন যায়নি। বাড়ির দিকে না ঘুরে ট্যাক্সি আরও এগোয়। এবার যতীনের চিন্তা হয়, কোথায় যাচ্ছে মেয়েটা?

দূরে দূরে থাকে। স্কুলের চাকরিতে বছর দশেক হয়ে গেলেও যতীনের চোখে মেয়ে আজও নিতান্ত নাবালিকা। চন্দননগরের তেলেনিপাড়ায় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, ওই স্কুলেরই আরও দুজন দিদিমণির সঙ্গে ভাগ করে। অল্প একটু জমি নিয়ে একতলা বাড়ি। বাইরে প্লাস্টার হয়নি। লেবুর গাছ, পেঁপে, লঙ্কা, জবাফুল সব মিলেমিশে বাড়ছে। লম্বা ছুটিতে, গরমে, পুজোয় বাবা-মা-র কাছে এসে থাকে। অন্য সময় কোনও ঠিক নেই। দুমদাম

করে বিনা নোটিসে আসছে-যাচ্ছে, কখনও মাসে দুবার, কখনও দুমাসে একবার। একরাত থেকেই, পরের দিন ভোরে দৌড় দিল হয়তো। বাসে, ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারি ওর পোষাবে না, চাকরিতে ঢোকার কিছুদিনের মধ্যেই বুঝে গেছিল খুকু।

দূরে থাকে বলেই ওর প্রতি মমতার ভাগটা একটু বেশি কি যতীনের! নিজেরই অগোচরে সে কতবার অন্যমনস্কভাবে কচুর শাক নিয়ে এসেছে কিংবা চাল্‌তে। মাছের মাথা সোহাগকে দিয়ে রাতে ভাজিয়ে দুদিন ধরে বাসি রেখে দিয়েছে। অথবা সস্তা পেলাম বলে দুম্‌ করে সন্ধের মুখে একটা ছাঁচি-কুমড়ো। কে জানে, খুকু হঠাৎ এসে পড়ে যদি!

বিয়েটা দিতে পারলাম না। এই বয়সে ছেলে-মেয়েতে কোল ভরে থাকার কথা, ডান হাতটা খালি খালি···

কী বিড়বিড় করছ, বাবা?

বলছি, তোর বিয়েটা দিতে পারলাম না!

বিয়ে আবার কেউ দেয় নাকি, ফোঁস করে ওঠে মেয়ে, আমি বিয়ে করলে তো হবে।

এই নিয়ে বছর ছ'সাত আগে পর্যন্ত কত টানাটানি, কান্নাকাটি, ভাতের থালা ঠেলে উঠে যাওয়া। যতীন মাঝেমধ্যেই ঝিকিয়ে উঠত, নরম মনের সোহাগ নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছে। আর মেয়ে সাপিনীর মত ফুঁসেছে। একবারই মাত্র কনে দেখা পার্টির সামনে হাতের ওপর চিবুক রেখে বসতে হয়েছে খুকুকে, তারপর আর নয়। যেটুকু করার, এরপর থেকে মুখের কথাতেই সেরেছে যতীন।

ঠিক আছে, মেয়ে দেখতে এলে পোস্টকার্ডে জানিয়ে দেব—বলে দরজার কাছ পর্যন্ত যতীনকে এগিয়ে দিয়েছে ওরা।

প্রতিবারই গলা পরিষ্কার করে নিয়ে, তারপর খাটো করে বলা : আমার মেয়ে প্রণতির গায়ে একটা সাদা দাগ আছে—একটাই দাগ, বাড়ছে না। গত পাঁচ বছরে বাড়েনি। কোনও সংক্রমণের সম্ভাবনা নেই, ডাক্তার বলেছে। তবে আপনাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করি।

প্রথমবার, খুকুর চাকরি নেওয়ার অনেক আগে, সাঁতরাগাছির ওরা এসেছিল। সেই শেষ দেখা। ছেলেটির নাম ছিল অশোক—অশোকই তো, নাকি? যাওয়ার আগে ওর কাকা যতীনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিল, মেয়ে আমাদের মোটামুটি পছন্দ হয়েছে। আর খালিহাতে মেয়েকে পাঠাবেন না যে তা আপনাদের দেখেই বুঝেছি। তবে ওই দাগটা বললেন না, চোখে তো পড়ল না, যতটুকু দেখেছি—তাই একটু দেখব ভাবছি। না না, আপনারাও থাকুন না—আপনি, আপনার স্ত্রী, আমি আর অশোক, অশোকের বাবা। আমার বন্ধু আছেন ডাক্তার, স্কিন স্পেশালিস্ট।

না, যতীনের হাত ওঠেনি সেই মুহূর্তে। কোনও খারাপ গালাগালও দেয়নি। যেহেতু বাপ হয়ে দাগটা সে নিজে আজও দেখেনি, তাই বলে অন্য

লোকের এক্তিয়ার নেই না আছে, এই গূঢ় তর্কের সমাধান করতে না পেরে নিজেকে ভীষণ দুর্বল বোধ করেছিল যতীন, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়নি। অনেকক্ষণ পর, জীবনে সেই একবারই যতীন বলেছিল, আমি আপনাদের চিঠি দিয়ে জানাব।

সেদিন রাতে ন্যাড়া-ছাতে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরেছিল যতীন। মুহুর্মুহু বিড়ি খাচ্ছিল। এতক্ষণ ওপরে ছিল—যে ভয় পেয়ে সোহাগ আর খুকুও ওপরে চলে এসেছিল শেষ পর্যন্ত। কে জানে, হয়ত এত পণ চেয়েছে বা সোনা, ছাদ থেকে লাফিয়ে-টাফিয়ে পড়বে নাকি লোকটা! ছেলে অলক অথবা টুলু ঘুমিয়ে পড়েছে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়ানো মা ও মেয়ে দুজনকে দেখল যতীন। কয়েক মুহূর্ত পরেই ওদের স্তব্ধ করে দিয়ে রাতের বুক চিরে যতীনের প্রেত বলে উঠেছিল, ওরা তোমার দাগটা দেখতে চায়, মাগো!

বাবা!

চাপা আর্ত উচ্চারণ। নিমেষে চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছিল খুকুর। নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দ্রুত কলতলায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল মেয়েটা। যেন একযুগ পরে যতীনের হাত ধরেছিল সোহাগ। কঠিনভাবে বলেছিল, চল—নিচে চল। আমার মাথার দিব্যি, আর কোনওদিন মেয়ে দেখাব না।

সেই শেষ।

আজ ১৯৯৭ সালের ১৭ই আগস্ট। এখনও পথে ছেঁড়া ফ্ল্যাগ ইতস্তত পড়ে। ফেস্টুন হাওয়ায় লটপট করছে। অনেক জায়গায় পতাকা নামানো হয়নি এখনও। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের উৎসব চলবে আরও মাসখানেক। জলসা, সভা, আলোচনাচক্র, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাঁজাকোলা করে তুলে এনে সংবর্ধনা। গত দু-রাত ধরে যতীনদের পাশের গলিতে হিন্দি গান বেজেছে লাগাতার। সোহাগ ঘুমোতে পারেনি, তারই মধ্যে ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুমিয়ে নিয়েছে যতীন।

এই তুই কোথায় যাচ্ছিস বল্ তো?

দু' মিনিটে আসছি। লেক মার্কেটের কাছে ট্যাক্সি থেকে নেমে গেল মেয়ে। একটু এগিয়ে ফুলের দোকানে দরাদরি করছে। মিটার চালু। যতীনের বুকের মধ্যেটা টেনশনে হাঁসফাঁস করে। খানিক পরে ফিরে এল খুকু। হাতে একগোছা রজনীগন্ধা আর গোলাপ কলাপাতায় মোড়া, আর কী যেন বুকের কাছে চেপে ধরা।

দ্যাখো, ভাল গন্ধ না বাবা! যতীনের খুব নাকের কাছে এনে ধরেছে ফুলগুলো। বৃদ্ধ বলীবর্দের মত ঘোঁৎ করে যতীন। ওর ঘোলাটে দুই চোখে অন্য ভাবনাচিন্তা।

এসব কেন কিনতে গেলি! আমাদের বাড়িতে ফুল রাখার জায়গা আছে নাকি?

এগিয়ে গিয়ে, ট্যাক্সি ঘুরিয়ে আবার বাজারের মুখে। যতীন গম্ভীরভাবে

বলল, খুকু, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে—মিটার উঠছে কিন্তু। ট্যাক্সিওলা পেছনে তাকায়ও না, এত নির্বিকার—যেন সে খালি ওই মেয়েরই হুকুম নেবে, আর কারও নয়।

আঃ বাবা, আসছি এক্ষুনি! বলে বাজারের গেটের ভিতর ঢুকে মিলিয়ে যায় রোদের হলুদ।

এত বেলায় মাছ কোত্থেকে পেলি?

সনাতনকে বলে গিয়েছিলাম সেই কবে, রেখেছে আমার জন্য। অ্যাডভান্স দিয়েছিলাম। অসময়ের ফুলকপিও কিনেছে। একটা নয়—একসঙ্গে দুটো।

গা কর্‌কর্‌ করে যতীনের। কী বলবে? সত্যিই তো, ইলিশের কিলো একশ পঞ্চাশ ছাড়ানোর পর বহুদিন ইলিশ-মুখো হয়নি যতীন। কালো জিরে, কাঁচা লংকা, সর্ষেবাটা দিয়ে ঝাল। কোলের মাছের ডিমটা আগে থেকে থালার এক কোণে সরিয়ে রাখা—সবশেষে একটুখানি গরম ভাত দিয়ে মুছে নেওয়া যায়। তাই বলে খুকুর কি এমনভাবে টাকা ওড়ানো উচিত! না বাবা হয়ে যতীনের সেটা দেখা উচিত বসে! যতীন নিজে খেয়েদেয়েই বেরিয়েছে। দশটার মধ্যে সে ও সোহাগ দুপুরের খাওয়া সেরে নেয়। ওবেলার ডাল-তরকারি রাঁধা আছে। রুটিটা খালি করে নিলেই হবে। এখন আবার সোহাগকে মাছ কুটে, ধুয়ে রাঁধতে হবে অবেলায়। তা রাঁধবে সোহাগবালা। মেয়েকে দেখেই আহ্লাদে গলে জল হবে। মোটেই আপত্তি করবে না। তোলা উনুনে আঁচ নিযে গুজ্‌গুজ্‌-ফুস্‌ফুস্‌ গল্প হবে মা-মেয়েতে।

মিষ্টি কেনা হল সামনের দোকান থেকে।

যতীন এতক্ষণে হাল ছেড়ে দিয়েছে। মিটারের দিকে তাকালে বুক ধড়ফড় করবে, তাই ওদিকে তাকাচ্ছে না আর।

আচ্ছা টুলুটাকে ডেকে আনলে হয় না? এক বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল, খোকা আসে না। এসপ্ল্যানেড-দমদম সোজা মেট্রো হয়ে গিয়ে যতীনের হিম্মৎ বেশ বেড়েছে। না-আসুক ছেলে, খবর পেঁছিতে তো আধঘণ্টা, যদি তেমন কিছু হয়। খোকাও তো বাপের বেটা। নকল পা আর ক্রাচের ভরসাতেই দাপিয়ে বেড়ায় শহর, অফিস, বাজার। বাঁ হাঁটুর নিচে পেছন থেকে থ্রি নট থ্রি-র গুলি এসে লেগেছিল। বের করার তরসয়নি, তার আগেই পুলিসহাজত থেকে জেলহাজত। গ্যাংগ্রিণ হয়ে মরে যেতে পারত টুলুটা—মরেনি, অর্ধেক পা খোয়া গেল। তাও জেল থেকে বেরিয়ে ল' পড়েছে। এম এ করেছে ডাকযোগে। এই চাকরিটা ভাগ্যিস পেয়ে গেছিল দু-তিন অফিসে হাতবদল হয়ে, তাই চলছে। এখন বাড়িতে টিউশনিও করে, সপ্তাহে তিনদিন।

ওই আর এক পাগল! অদ্ভুত অভিমান! এতদিন পরে কীভাবে জানতে পেরে গেছে, কি বন্ধু আশুতোষ বাড়ি বয়ে এসে বলে গেছে, যতীন আর আশুতোষ স্যার কীভাবে সেরাতে থানায় দৌড়ে গেছেন, কীভাবে যতীন দু'হাতে পায়ের জুতো দুটো চেপে ধরেছিল ও-সির—এই এতদিন পর মানে

হয় কোনও! টাকা শোধ দেবে না আশু, তাই নিয়ে কথা-কাটাকাটি, তারপর এই—আশুর কি উচিত হয়েছে ওভাবে শোধ তোলা?

বাইশ বছর পর এই কথার কী মানে আছে এখন!

পল্লব আর অর্ণব দুজনেই পুলিসের গুলিতে মরেছিল—হৃদয়নাথ স্যারের দুই ছেলে। হরিশ পার্কের পাশ দিয়ে নুয়ে পড়ে, রাস্তা হাতড়ে হেঁটে যেতেন মাস্টারমশাই, হেঁটেছেন মারা যাওয়ার আগের দিনটি পর্যন্ত। খোকা জেল থেকে বেরোবার পর একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেছিল। প্রণাম করতে পারেনি টুলু, হাত দুটো কাছে এনে বুকের, ঝুঁকেছিল কেবল। না না, ঝুঁকো না, বেঁচে-বর্তে থাক, এমনিই আশীর্বাদ করছি, বলেছিলেন হৃদয়নাথ, আমার ছেলে দুটোকে কেউ কখনও 'বেঁচে থাকো' বলেনি বাবা!

মাস্টারমশায়ের চেয়ে তো যতীনের বরাত ভাল। বেঁচে-বর্তে আছে টুলু। এখন তো ইউরোপের বুকের ওপর প্রতিদিন সীমান্ত সব ভাঙছে-গড়ছে, রাশিয়া হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, অথচ অলক ওই অদ্ভুত অকারণ রাগে বাবা-মা'র কাছে আসা বন্ধ করেছে। মানিঅর্ডারে টাকা পাঠাবে অথচ আসবে না।

খুকু আম মাছ কিনল, ফুলকপিও, সন্ধেবেলা রান্নার জাঁকজমক একটু তো হবেই। মাছভাজার, ভাতের গন্ধ বেরলে টুলুর কথাও মনে পড়বে যতীনের—পড়বেই। সোহাগবালা বেশ বুদ্ধি ধরে। বোধহয় জানত খুকু আজ আসবে। বাপ-মেয়েকে একসঙ্গে দেখে বুঝে নিয়েছে কিছু একটা ব্যাপার। ট্যাক্সি থেকে দুজনে নামল। মেয়ের হাতে ফুল, মিষ্টির বাক্স। যতীন একহাতে মাছের ও তেলের থলে নিয়েছে, অন্য হাতে কাগজে মোড়া রাঙা গামছাটা। সোহাগ বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। এলাহি ব্যাপার!

ঘরে এসে আবার মায়ের ওপর চোটপাট, ও কি, শেষে এই ন্যাতা শাড়িটা পরলে! না না, তসরটা বার কর বলছি!

ওরে দাঁড়া দাঁড়া, এই গরমে! এই তো ভাল। কাচা, ইস্ত্রি করা তাঁতের শাড়ি, পাড়ের রঙটা জমিতে লেগেছে, তাই···

সোহাগের সিঁথিতে নতুন সিঁদুর, কপালে লাল টিপ, ওর দিকে তাকিয়ে কেমন বিহ্বল বোধ করে যতীন। ঘ্যাঁচ করে রজনীগন্ধাগুলো কাঁচিতে ছোট করে একটা পেতলের ঘটিতে দ্রুত সাজিয়ে ফেলল খুকু, লাল গোলাপের সঙ্গে মিশিয়ে। সাদার গা ঘেঁষে রক্তিম, যেন কড়ি ও কোমল-মধ্যম পাশা-পাশি। কলাপাতায় মোড়া রজনীগন্ধার মালা বার করে একটা থালায় সাজায়। মিষ্টির বাক্সটাও খুলেছে।

যতীন যেন সদ্য আসা অতিথি, হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

এই যে বাবা, ধরো—এই মালাটা পরাবে মাকে বুঝেছ, কই ধরো!

আনাড়ির মত সিক্ত মালাখানি হাতে নিয়ে যতীন একবার সোহাগের দিকে, একবার মেয়ের দিকে তাকায়। খুকু হাসছে। সোহাগের মুখেও বেশ দুষ্টু দুষ্টু হাসি। তাই বুঝি বলেছিল, আজকের দিনে গামছা এনো একখানা! বেশ! যতীন খেয়ালই করেনি।

ওই কপাল, ওই অকলঙ্ক টিপ, ওই মৃত্যুঞ্জয় হাসি—ও কি আজকের? ঘষা কাচের ওপর জমে থাকা বাষ্পকে যেন অলীক হাতে মুছে দিচ্ছে, আস্তে আস্তে যতীনের সামনে ফুটে উঠছে লজ্জামাখা এক কিশোরী মুখ—সামান্য লম্বাটে, চাপা নাক, ভাসা ভাসা কাজল পরা দু-চোখ, কপালের চন্দন মুছে এসেছে, সারা শরীরে সঙ্কোচ আর ত্রাস। গতকাল সন্ধেতে বিয়ে হয়েছে। বেনারসীর বড় শখ ছিল বুঝি, তাঁতের একটা লাল শাড়িই শেষ পর্যন্ত কপালে জুটেছে। কুসুমডিঙে ভাল করে না হতেই তোলপাড় হয়ে উঠেছে চারদিক। পাড়ায় শোরগোল, চাপা কান্না—পালাও, পালাও! কালরাত্তির কাটেনি, ফুলশয্যা তো অনেকদূর, যতীনরা সেই পালাতে আরম্ভ করেছে।

কদিন আগে থেকেই কানাঘুষো, ফিসফিস চলছিল। এক ধরনের চাপা উত্তেজনা। যতীনরা তবু এখান থেকে যাওয়ার কথা ভাবেনি। সব হিসেবের গরমিল ছাপিয়ে স্বাধীনতা দিবস এক সুস্বাদু উন্মাদনা এনে দিয়েছিল। বুকে জেদ বাসা বেঁধেছিল মানুষের। খাজা নাজিমুদ্দিন কলকাতা থেকে ঢাকা রওনা হলেন, ধক্‌ধক্‌ স্টিমারের মাথায় মুসলিম লিগের ফ্ল্যাগ। নদীর দু-ধারে মানুষ আনন্দে চিৎকার করেছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলেছে। গানে, স্লোগানে মাতোয়ারা পথঘাট। অথচ পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা ওড়েনি ঢাকা শহরেও। নাম বদলে গেছে দেশের, যাক্‌। যাবে না যতীনরা। এখানেই মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। এমন ধানজমি, আম-ডুমুর, বাঁশঝাড়—সব ছেড়ে পালানো! অথচ ষোলই আগস্ট বিকেল থেকেই কেমন যেন অস্থির ভাব, মানুষ পাগলের মতন ঘর ছাড়তে আরম্ভ করেছে। সীমান্তের দিকে মিছিল চলেছে হাঁটাপায়ে, ট্রেনে, নৌকায়। বিয়ে চুকে যাওয়ার পর পাশের বাড়ির বুড়ো তাহের জেঠা নিজেই এসে যতীনের বাবাকে বলে গেলেন, ভট্টাচার্যি মশায়, ঘরে কচি বউ—যতীনকে বলুন এবার যেন কলকাতা চলে যায়!

ঝিকরগাছা থেকে কলকাতার ট্রেন, সে কি গুঁতোগুঁতি ভিড়! ছাতেও মানুষ—থিকথিক করছে মানুষে। তোরঙ্গের ওপর দুজনে কোনওমতে বসে সারারাত জেগে এসেছে। শ্রাবণ মাসের শেষ দিনটিতে বিয়ে, আর কালরাত্রির রাতে, ভাদ্রের মুখে ঘর ছেড়েছে দুজন। সোহাগের মুখের দিকে তাকানোর অবস্থা নেই তখন যতীনের। নিজের বুকের ধুক্‌ধুক্‌ শব্দ কানে তালা ধরাচ্ছে। ট্রেনে বসেই দেখা যায়, আলপথে মানুষ হাঁটছে, ছেলে-বুড়ো, ঘোমটা-টানা বউ, মাথায় বাক্স-প্যাঁটরা—যা পেরেছে সঙ্গে নিয়েছে। যেভাবে পারছে, সেভাবে পালাচ্ছে। সীমান্তে লুট চলছে নাকি, মেয়েদের ইজ্জত যাচ্ছে। কচি বউটিকে কোনওমতে বাঁচিয়ে নিয়ে কলকাতায় পৌঁছতেই হবে যতীনকে। বাবা-মা, কাকা-কাকীমা রইল ভিটেতে। তারা কবে আসবে কেউ জানে না। বাইশ বছরের বর, পনের বছরের বউ। জীবনটা আরম্ভ হতে-না-হতেই কেমন দু-টুকরো হয়ে গেল! ভাবলে আজও যতীনের বুকের মধ্যেটা ফাঁকা হয়ে যায়। স্লেটের সব লেখা-জোকা ন্যাতা দিয়ে মুছে দিল কেউ যেন। তারপর কলুটোলায় পিসতুতো ভাইয়ের একচিলতে বাসায় জীবন আরম্ভ।

বারান্দায়, রান্নাঘরে শোয়া। পিসিমার খোঁটা উঠতে-বসতে, বিপিন একা হাতে আর কত টানবে, একটা আলাদা বাসা দেখ যতীন!

কতদিন পর্যন্ত যতীন নির্বোধের মতন ভেবেছে, এ দেশ তার না। এখানে তাকে ভাড়াটে বলে, বাঙাল বলে লোকে, যদিও তাদের যশুরে ভাষায় কোনও বাঙালে-টান নেই। কতদিন বাজারে ছোট মাছ বাছতে গিয়ে বোনাসবাবুদের রুক্ষতায় অপমানিত যতীন চোখ ভরে নিজেদের টলটলে খিড়কি পুকুরের কথা ভেবেছে। শরতের ভোর রাতে শিউলির গন্ধ তাকে কতবার তীব্র টানে সীমান্তের ওপারে টেনেছে। উঠোনের মাঝখানে সেই শিউলি গাছটা ছিল! তারপর সময়ের নানা বাঁক ঘুরে রোদে-জলে ঝরাপাতার মতন হলুদ হয়ে যতীন ভট্চাজ একদিন বুঝেছে যে, এখানকার মাটিতে শিকড় না গাড়লে, এ জীবনে ডালপালা মেলা হবে না তার!

সত্যিই কি পূর্ববঙ্গে কোনও ভবিষ্যৎ ছিল যতীনদের? ওই তো তিরিশ বিঘে ধানজমি, ইটের দেওয়াল, খড়ের চাল দেওয়া হাত-পা-ছড়ানো একটা বাড়ি, ব্যস্। খুড়তুতো-জেঠতুতো মিলিয়ে ওরা ছ'ভাই ভাগাভাগি করে কী খেত, কোথায় যেত এতদিনে? তাও তো কলকাতার ফুটপাথে জীবন আরম্ভ করতে হয়নি যতীনকে। ইণ্টারমিডিয়েট পাস করেছিল, চাকরির বাজার এত খারাপ ছিল না, তাই একরকম টিঁকে গেছে।

এই তো কলকাতা, যতীনের নিজের জায়গা। এখানেই ওর ছেলে রাষ্ট্র কাঠামোর খোলনলচে বদলাতে গিয়ে পেছন থেকে গুলি খেয়েছিল। অর্ধেক পা খুইয়ে আজ সে সুভদ্র নাগরিক বনে গেছে। এখানেই খুকুর হবু খুড়শ্বশুর ওর শরীরের অদেখা দাগ দেখতে চেয়েছিল। হ্যাঁ, শিকড় গেড়েছে তো, ডালপালাও মেলেছে যতীন ভট্চাজ, কিন্তু অস্থিমজ্জায় আজ তার কী গম্ভীর ব্যথা! পথ চলার কী দুর্বহ ক্লান্তি তার রক্তের ভিতর! আজও একখানা নিজের ঘর কোথাও নেই যতীনের। বাড়িওলার লোক রাউণ্ডে এলে শীতের দিনেও ঘেমে ওঠে যতীন—এই বুঝি উঠে যেতে বলল তাদের! দেড়খানা ঘর, একফালি বারান্দা, চিলতে রান্নাখর ধোঁওয়ায় কালো, ন্যাড়া ছাদ। এইটুকু যতীনের রাজ্যপাট।

কই বাবা, দাও!

মেয়ের ডাকে জেগে ওঠে যতীন। একটা নিঃশ্বাসকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে নিতে সে হঠাৎ বুঝতে পারে, তার ভারতবর্ষেরই মতন খুঁড়িয়ে, বুকে হেঁটে রক্ত পায়ে কখন সোহাগ ও সে অর্ধেক শতাব্দী পেরিয়ে এসেছে।

গলায় মালা, তক্তপোষে বসা সোহাগকে সন্দেশ ভেঙে মুখে দিতে গেল যতীন, ব্যগ্র সোহাগ একটু আলতো হাঁ করে মুখখানা এগিয়ে আনে। দু'জনের সমন্বয়ের অভাবে সন্দেশ ভেঙে সোহাগের কোলে পড়ে যায়। কুড়িয়ে আবার ওর মুখে দেবেই বলে যতীন স্ত্রীর খুব কাছে আসে আর তখনই সে দেখে, তাঁতের শাড়ির সাদা জমি এক ফোঁটা চোখের জলকে কেমন নিবিড় তেষ্টায় শুষে নিচ্ছে।

তুমি কবে আসবে

এই, একটা না ভীষণ মুশকিল হয়েছে!

কী ব্যাপার?

দুধ এনে সবে বাড়ি ঢুকেছি, গা থেকে মাথার চুল থেকে খাটালের কাদার গন্ধ মেলায়নি, পাজামার ওপর কোঁচকানো শার্ট। আমাদের আধভেজানো সদর দরজার সামনে তাঁতের নীল ডুরে শাড়িপরা সদ্য ঘুমভাঙা দোলা, ঘুমন্ত চূর্ণ-কুন্তল কপাল আঁকড়ে আছে, সারা মুখে ছটফট করছে হাসি।

কী ব্যাপার?

এখানে বলা যাবে না—ধ্যাৎ, বাইরে চলো!

নিঃশব্দে ভেতরে গিয়ে, পিসিমণি সবে উঠেছে, ওকে একটু আসছি বলে, দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

অক্টোবরের শেষ, পার্কের ঘাসগুলি ভেজা ভেজা, শহর এখনও ভাল করে আড়ামোড়া ভাঙেনি। এই সময় দোলার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসা দৃষ্টিকটু এ পাড়ায়, তবে ও কোনও নিয়মকানুন মানে না সবাই জানে। আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড উঠছে-নামছে। ভেজা বেঞ্চিতে আমার সামনে পা ঢেউ করে বসে হাঁটুতে মাথা গুঁজে হাসতে হাসতে দোলা বলেছিল, আসলে তোমাকে না··· ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি!

এতে মুশকিলের কী আছে?

ভালবাসা এরকম একফালি রোদের মত, সামনে এসে পড়লে কী করতে হয় আমায় কেউ শেখায়নি। মুখারবিন্দর মত দুই করতলে তুলে নেওয়া—উঁহু, সে সহজ নয় দোলা, আমি তো তোমাকে কবে থেকেই···

মানে সেই কখন থেকেই···

হাসিটাকে হঠাৎ ডানার মত গুটিয়ে ফেলে সেই ঈশ্বরী আবার মানবী হয়ে গেল। আঃ, কিচ্ছু বোঝো না। সামনের মাসে চলে যাচ্ছি বলেই তো মুশকিল। চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে অথবা লিফটের কলাপসিব্‌ল্‌ গেট ঝড়াক্‌ করে বন্ধ হয়ে যেতে দেখে কতবার ভেবেছি, দোলা যদি ওইভাবে কথাটা না বলত সেদিন!

শীতের হলুদ পাতার মত শানবাঁধানো রাস্তার ওপর পা ঘষটে ঘষটে বহু বছর পর আমি বাড়ি ফিরছিলাম, এমন সময় দোলা আমায় ডাকল। পিছু-ডাক নয়। এমনিতে দিনে-দুপুরে কী ভরসন্ধেবেলা চমকে বহুবার পেছন ফিরে দেখেছি। রা-হু-ল! ওর অলীক কণ্ঠস্বর ভিড়াক্রান্ত ফুটপাথ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে কিংবা সটান নেমে এসেছে নিয়নসাইনের অক্ষরবৃত্ত থেকে। দোলার হাসিকে কাটা ঘুড়ির উল্লাসে হেলে পড়তে দেখেছি আকাশের

কাঁধে। বর্ষায় জলে-ভরা খানা-খন্দ জামাকাপড় বাঁচিয়ে পেরবার সময় আমার চেতনায় এসে আচমকা ধাক্কা দিয়েছে দোলার শরীরের দিব্য সৌরভ। বঁড়শি-গাঁথা মাছ যেমন কল্পলোকের মায়া দেখতে গিয়ে জলতল ছেড়ে কয়েক লহমার জন্য উঠে যায়; তারপর অথৈ নীল আকাশ, ঝকঝকে রোদ তার চৈতন্যকে লাঞ্ছিত, বরবাদ করে ছেড়ে দেয়; সব শেষে পাড়ে-দাঁড়ানো মানুষগুলো এঃ হেঃ চারাপোনা বলে বড়শি খুলে হাসতে হাসতে আবার তাকে জলে ফেলে দেয়। দোলা আমাকে মায়াস্বর্গ থেকে নির্বাসন দেওয়ার পরও বহুদিন আমি সেই ক্ষণিকের দেখা রোদ-চমকানো-আকাশ, সেই মায়া ভুলতে পারিনি। বারবার ক্ষতগুলির ওপর আঙুল বুলিয়ে দেখেছি, নাঃ, ব্যথা আর নেই, দাগগুলো রয়ে গেছে কেবল। আহত তরুণ পোনার মতন জলখেলায় ফিরে যেতে হয়েছে আমায়, কিন্তু দোলা আমাকে ছাড়েনি। নানাভাবে, নানা ছলাকলায় ডেকেছে, নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। চিঠির উত্তর না দিয়ে, আবার মাঝরাতে ফোনে ডেকে তুলেছে—এই, কী করছ? না এমনিই, দেখছিলাম ঘুমোচ্ছ কিনা—বলে হেসে ফোন রেখে দিয়েছে। সারারাত জেগে আমি ভেবেছি—এই রে, ওর নম্বরটা দিল না তো। মানে ওই নম্বর না পাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘদিন দোলার কণ্ঠস্বর শোনার কোনও রাস্তা থাকবে না আমার। মানে ওই শিমুল পাহাড়ি বা রাজগাঙ্গপুর জাতীয় কোনও জায়গায়, পিনকোড না দিয়েই চিঠি লিখতে হবে আমাকে, কয়লার ইঞ্জিনের ধুলো, ভেন্ডর গাড়ির ঘাম—সব কিছু খেতে খেতে সেই চিঠি আঠার দিন কিংবা আড়াই মাসে ভাস্বরের অফিসের রিসিট ক্লার্কের কাছে পৌঁছবে। বহুদিন, বহুদিন হয়ত কোনও খবর নেই, সাড়াশব্দ নেই, তারপর একদিন মেয়ে আর বউকে কলকাতার ট্রেনে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে দেখলাম, আমাদের বসার ঘরে লাল-কালো টেবিল ঢাকাটার ওপর বিকেলের লালচে রোদ, তার ওপর টানটান শুয়ে ঘুমোচ্ছে সেই মেয়ে! হলুদ রঙা খামের মধ্যে পেঁয়াজের খোসা কাগজে বড় অক্ষরে দু'পাতা লেখা আর একমুঠো বকুল খামের ভিতর। অভিমানে আমার বুক চুরমার হয়ে যায়। চিঠিটা না পড়েই দলা পাকিয়ে ফেলে আবার দু'হাতে ইস্ত্র করি টেবিলের ওপর রেখে। ফুলগুলো নাকের কাছে ধরে ঘ্রাণ নেই। কী জানি, দোলার চুলের গন্ধ কোনও ছলে এর মধ্যে লুকিয়ে আছে কিনা! ওদের ফেলে দিতে বড় মায়া লাগে। বোন-চায়নার পিরিচে খাবার ঘরের জানলার তাকে রেখে শুতে যাই। ঘুমের মধ্যে এক অস্থিরতা জাগে। দোলা যেন ওই ঘরে আমার জন্য একা অপেক্ষা করছে। ফুলগুলোকে মাথার কাছে এনে রাখতে হয়। দোলার ওপর ভীষণ রাগ হয়, আক্রোশ বোধ করি, কষ্ট পাই…

অনেক দিন পর আজ বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে আমার বুকের মধ্যে কী যেন ছলাৎ করে উঠল। ফুলবনী থেকে বালিগুড়ার পথে হাল্কা জ্যোৎস্নায় রাস্তা ছেড়ে শালবনে ঢুকে যাওয়ার আগে একবার সঙ্গী প্রৌঢ় ভাগীরথী কন্‌হার বলে উঠেছিল, একটু দাঁড়ান, সাপ আছে—বলে দু'হাত জড়ো করে তালি বাজিয়েছিল।

কী করে বুঝলে কনুহায় যে সাপ আছে ?

আজ্ঞে আমরা জঙ্গলের কঞ্জ, সাপ ধারেকাছে থাকলে আমাদের শরীরের মধ্যে জানান দেয়।

লেটার বক্সের ভেতরে শুয়ে দোলার নীল চিঠি সেইরকম আমার আত্মাকে কোনও আদিম সঙ্কেতে স্পর্শ করল। প্রায় এগার বছর পর লিখেছে দোলা। পাড়ায় এই মুহূর্তে লোডশেডিং। রোমিলা ওপরের বারান্দায় বসেছিল মোড়াতে, রেলিংয়ে চিবুক। একে পথ চাওয়াই বলা যায়। মাসতিনেক আগে লোব্লাড প্রেসার হয়ে অফিসে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। সেই থেকে ও আমাকে অফিসের বাসেই আসতে বাধ্য করেছে—চেনা-শোনা লোকের সঙ্গে থাকবে, দরকার হলে ডাক্তার কিংবা হাসপাতাল…বাস যেখানে থামে, সেই গলিমুখ থেকে বাড়ির নিচ পর্যন্ত পঞ্চাশ মিটার মত রাস্তা বারান্দায় বসে রোমিলা আমার চলে যাওয়া, ফিরে আসা দেখে। স্ট্রিট লাইটটা জ্বলছে। অল্প হ্যালোজেন আলোয় পড়ার চেষ্টা করলাম চিঠিটা। ওপর থেকে টর্চের বৃত্তাকার আভা এসে পড়ল নীল কাগজে। রোমিলা হেসে বলল, পড় পড়, আমি আলো ধরছি। আমার করতালে উদ্ভাস, ওপরে অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়ানো রোমিলার মুখের চারপাশে দুঃখের মত কাঁপতে থাকা কাঁচা-পাকা চুলগুলি—এই দুই দৃশ্যের বিপরীতমুখী স্রোত আমাকে ছুঁয়ে যেতে যেতে বলে, রাহুল, তুমি সুখী হবে না এ জীবনে !

চিঠি পড়া শেষ করে মুখ তুলে বললাম—দোলা যেতে লিখেছে।

রোমিলার অবয়ব দেখা যায় না। ওর গলা সুদূর বনাঞ্চল থেকে হাওয়ার মত ঘুরতে ঘুরতে ভেসে আসে—যাবে ? যাও না, সেই রঙ্গন পাহাড়ি না ? ট্রেন আছে ?

না, ট্রেন নেই। শালতোড়ায় নেমে বাস ধরতে হয়। ট্রেকার, জিপও পাওয়া যায় ভাড়াতে। শালতোড়া অবধি হাতিয়া প্যাসেঞ্জারে চলে যাব।

আলো এলে আমার জন্য চা গরম করে এনে রোমিলা বলে—জান, আজ মিতুলেরও চিঠি এসেছে। জানুয়ারিতে আসবে।

বাঃ, কই দেখি! আমি হাত বাড়াই। মিতুল আমাদের মেয়ে। সদ্য বিয়ে হয়েছে। নতুন সংসার। আগামী আশ্বিনের মধ্যেই আমার আর রোমিলার মাঝখানে টলমল করে হামা দিতে আসবে এক শিশু। মিতুলের সন্তান। মায়া, উদ্বেগ আমাকে কয়েক মুহূর্ত আচ্ছন্ন করে রাখে। অথচ রোমিলা চিঠি আনতে পেছন ফিরতেই আমার বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করে ওঠে রাতচেরা ইঞ্জিনের শব্দ। আকণ্ঠ জ্যোৎস্নায় ডুবে থাকা এক লেবেলক্রশিং, পাখিরা, দোলার নিরাভরণ হাতঃ রাহুল, দোলা বলে, তোমাকে কত দিন দেখি না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বুঝি আমার ভেতরটা কাগজের মত সাদা হয়ে যাচ্ছে, ভয় হয়, শেষে কি এই তেষ্টা নিয়েই চলে যেতে হবে ? তুমি আসবে, আসবে তো ? এই শেষবার, আর কোনওদিন তোমাকে জ্বালাতন করব না, প্রমিস ! আমরা দু'জনে একবার সেখানে যাব। কোথায় বল তো ? মিতুলের হাতের

অক্ষরগুলি বুকের কাছে জড়ো করে এনেও আমি মনে মনে বলি, এই শেষবার তো ? প্রমিস করছ কিন্তু! নিজের করতল নাকের কাছে এনে ঘ্রাণ নিই, আঃ কোথায় সেই বকুলগঞ্জ !

হ্যাঁ, প্রায় পেয়েই তো গিয়েছিলাম দোলাকে। একটি ভোররাতের স্বপ্নবৎ সে আমার করতলগত হয়েই এসেছিল। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করারই যা বাকি ছিল। ভাস্বর ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কেবল রেশম আর দোলা। দোলার নার্ভাস ব্রেকডাউনের মত অবস্থা।

একা, কাতর, রাগী দোলা অন্ধের মত আমাকেই ডেকেছিল। রঙ্গন পাহাড়িতে পাহাড়ের খাঁজে বসানো ওদের প্রাসাদোপম বাড়ি হা-হা করছে হেমন্তের হাওয়ায়। ভাস্বর কলকাতা চলে গেছে। বিবাহবিচ্ছেদ চাইবে। রেশম এই সব হাহাকার উৎখাতের মধ্যে টলমল করে বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকে দেখে বাঘিনীর মত দৌড়ে এসে কাঁধে মাথা রেখেছিল দোলা। ওর এলোমেলো কোঁকড়া চুল আমার বুকে। চোখের জলে জামার বুক ভিজিয়ে দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে নিয়ে এক দুরন্ত ঘূর্ণির মধ্যে নেমে গিয়েছিল। আমার বেকারত্ব তখন সবে ঘুচেছে। নতুন চাকরি ফার্গুসন অ্যাগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর হেড অফিস থেকে তার এসে আমার কলকাতার বাসায় জমছে। কেউ অবশ্য ওখানে আমাকে খুঁজে পাচ্ছে না, আমি রঙ্গন পাহাড়িতে। আমি, দোলা আর রেশম। দোলা, রেশম আর আমি। ভাস্বর বিচ্ছেদ চাইবে। দোলা চ্যালেঞ্জ করবে না। আমি আর দোলা ঘুরে বেড়াচ্ছি। জঙ্গল ভেঙে, চোরকাঁটা ভেঙে কাহ্নপুবা পাহাড়ের টিলায় চড়ে দেখলাম, চারিদিকে রাশি রাশি মেঘ, মেঘে অদৃশ্য নিচের পৃথিবী। সূর্যাস্তের আলো লাল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে মেঘরাজিকে। একটি কালো বিন্দুর মত মেঘসমুদ্রে ভাসমান পাহাড় চূড়ায় দোলা আর আমি। দোলা তার বিশাল ঢেউয়ের মত বাড়ির সব কিছু ফেলে রেখে নিজের, রেশমের জিনিসপত্র গোছাচ্ছে—বইপত্র, রেকর্ড, ক্যাসেট, জামাকাপড়। আমরা কলকাতায় যাব। দোলা বটল গ্রিন পছন্দ করে না বলে আমি ফ্ল্যাটের পর্দা, দরজার পাপোশ আমূল বদলাব ঠিকই করে ফেলেছি। এমন সময় এক সন্ধ্যেবেলা ভাস্বর ফিরে এল। যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে নিজের ঘরে ঢুকল। দোলার দিকে জলভারনত অপরাধ-মাখা চোখে চাইল, জড়িয়ে ধরে বলল ঃ ক্ষমা কর, আর ভুল হবে না।

দোলার দুই কাঁধে হাত রেখে, ওর চেয়ারের পেছনে সাদা-কালো ছবির মত সটান দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বলল—তুই চলে যা রাহুল, আর আসিস না।

সেই রাতেই চলে এসেছিলাম।

দোলা শোবার ঘর থেকে বেরোয়নি। ওর রুদ্ধ কান্নার শব্দ নিজের চওড়া কাঁধ দিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ভাস্বর বলেছিল—আয় রাহুল, তোকে স্টেশনে ছেড়ে দিই। আমি দোলার বদলে ঘুমন্ত রেশমের কপালে চুমো খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘোরানো পথ পেরিয়ে স্টেশনের দিকে চলে গিয়েছিলাম। ভাস্বরের সঙ্গে কথা বলিনি। ফোলা ঠোঁটে সজীব বঁড়শির দাগ, আমি স্বর্গ

থেকে নির্বাসিত হয়ে অন্ধকার নদীতে আবার আছড়ে পড়েছি। সে রাতে কীভাবে পায়ে হেঁটে শালতোড়ার অভিমুখে রওনা হয়েছিলাম, এখন মনে নেই। দীর্ঘ পনের কিলোমিটার রাস্তায় অনেক কিছু ঘটে যেতে পারত। বন্য ভালুকী এসে পেশল থাবা রাখতে পারত মাথায়, ধানক্ষেতে চাপ চাপ অন্ধকারের মত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারত হাতির যূথ, অথবা কোনও মোলায়েম ডাকাতিতে আমার সর্বস্ব লুটে যেতে পারত—কিছুই হয়নি। আমি নিরাপদ অক্ষত দেহে শালতোড়া পৌঁছে ভোরের ট্রেন ধরেছিলাম। কাঠের ঠাণ্ডা বেঞ্চিতে শুয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বুঝতে পারছিলাম, পায়ের দিক থেকে বিশাল এক জ্বর এসে আমাকে জড়িয়ে ধরছে। মাথাটা পাথরের জাঁতার মত ভারি—আমি কি কোনওদিন কলকাতা পৌঁছব এ জীবনে? বহু বছর আমি এক আগ্রাসী আতঙ্কে কাটিয়েছি। দড়ি, রেজর, ছুরি, কাঁচি—এই সব এলোমেলো, খোলা পড়ে থাকতে দেখলেই ভয়ে দ্রুত তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসতাম। দরকারের সময় হাতের কাছে না পেয়ে আবার রাগ হত, ছটফট করতাম।

এইভাবে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একদিন দেখলাম, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মুখ আলো হচ্ছে, আকাশের দিকে পিঠ করে রোমিলা দাঁড়িয়ে আছে। রোমিলা সেই সময় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল আমার বুকের ক্ষত-গুলিকে ভরাট করে দিতে। দাবানলে জ্বলে-যাওয়া বনের মধ্যে কোথায় একটি পাতা, একটি ফুল বেঁচে আছে—রোমিলা খুঁজে বার করার চেষ্টা করছিল। বাইরের ঝড় এসে যে জানলাগুলিকে সজোরে বন্ধ করে দিয়েছিল, রোমিলা সেগুলিকে ভেতর থেকে খুলতে চেষ্টা করছিল। এইভাবেই দিন গেছে, মিতুল এসেছে, আমি ফার্গুসন ছেড়ে ধাপ বদলে অন্য সংস্থায় ঢুকেছি। দোলা আমার রক্তে রয়ে গেছে। রোমিলা ওই রঙ্গন পাহাড়ির নির্বাসন-বৃত্তান্ত জানত। আমি পুরোটা নিজে না বললেও, আমার বন্ধুদের কাছ থেকে নানাভাবে শুনে একটা ঘটনার কোলাজ তৈরি করতে পেরেছিল আন্তরিক চেষ্টায়। রোমিলা যা জানত না তা হল, জ্ঞানচক্ষু খুলে যাওয়ার পরেই যে সৌন্দর্য আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল, তার নাম ছিল দোলা। সেই অস্থির বয়সে আমি অন্য কাউকে দেখিনি, অন্য কিছু জানতে ইচ্ছে করিনি, সিনেমা দেখে নাইট-শো থেকে ফিরে ঘুমোতে গিয়েছি। সারারাত দোলার কথা, টুকরো টুকরো হাসি আসা-যাওয়া করেছে। ভাসানের দিন কার্তিকের ময়ূরের পেখম থেকে একরাশ পালক ছিঁড়ে দোলাকে দিতে গিয়েছিলাম বলে খোকনদা লরি থেকে নামিয়ে দিয়েছিল আমাকে। আমার চারিদিকে হাজার হাজার প্রসাদলোভী কিলবিলে হাত, অষ্টমীর দিন দোলা ওর ছিপছিপে শরীর, ফর্সা, কৃশ হাত, কপালে ঝাঁপানো চুল নিয়ে ভিড় ঠেলে এগোতে পারত না বলে, প্রসাদের বারকোশ দু'হাতে মাথার ওপর তুলে ধরে আমি চেঁচিয়ে ওকে ডাকতাম। আমাদের বাড়ির পেছনের নির্জন বাই লেনে দোলারা থাকত। ওদের বাড়ির সামনে সারা বছর হলুদ রেণু-মাখা মায়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকত একটা

গুলমোহর। ট্রানস্লেশনের খাতা অথবা গ্রামার বই দোলাকে দেব—এই অছিলায় ওই গাছের নিচে সন্ধেবেলা দাঁড়িয়ে থেকেছি। কড়া নেড়েছি। এক্ষুনি দোলা বেরিয়ে আসবে। অনেকগুলি ফ্রক, তবু নিজের আদ্যাক্ষর লেখা হলুদ-রঙা ফ্রকটাই বার বার পরত দোলা। এইভাবেই আমার অবচেতনে কোথাও এক টুকরো রোদের মত হলুদ কুচি গেঁথে গিয়েছিল সেই কৈশোরেই। আমি যদি ক্লাসের ফার্স্ট বয় না হতাম, দোলা আমার সঙ্গে এমনভাবে মিশত কি? ভাল ছেলেদের একটা রাসায়নিক নিজস্বতা থাকে, তাদের কাছে মেয়েদের বর্ম পরে ঘোরা-ফেরা করতে হয় না। দোলার সেই বারো বছর বয়সের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে আকৈশোর আমাকে নিজের আগুন লুকিয়ে ফিরতে হয়েছে। দোলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে। কবে দিবি? ধূর্ত দুই নেকড়ে আর শেয়ালের মত অবিচ্ছেদ্য মধু শরাফ আর ত্রিদিব বক্সি অনেক দিন ধরেই আমার পেছনে লেগেছিল। ওরা দু'জনেই আমার চেয়ে বড়, স্বল্প পরিচিত, অথচ দোলাকে আমি চিনি বলে প্রায়ই ডেকে কথা বলে—এ কথা বুঝতে পারি। আলাপ করিয়েও দিলাম একদিন। মধুর বাপের ফার্নিচারের ব্যবসা। ও পকেটে তাড়া-তাড়া নোট নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের সবাইকে আইসক্রিম খাওয়াল। দোলাকে পরপর দু'কাপ ভ্যানিলা। পরের দিন, পরের পরের দিনও দোলাকে দেখেছি ওদের মাঝখানে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। পার্কের চারধারে কালো ফিতের মত যে রাস্তাটা পাতা ছিল সেইটা ধরে। ফোয়ারার ভাঙা রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমি ওদের গমনপথের দিকে চোখ রেখেছিলাম। আমার চোখ জ্বালা করছিল। দোলার রেশমি চুল ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, উঃ এত কথাও বলতে পারে মেয়েটা! অনবরত হাত-পা নাড়ছে। ত্রিদিব বক্সি হাসতে হাসতে মাথা পেছনে হেলিয়ে দিচ্ছে। দু'সপ্তাহ পরে একদিন ম্লানভাবে গিয়ে দোলাদের নীল দরজার কড়া নাড়লাম। ওকে না দেখে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম আমি। পার্কে আসে না। রাস্তায় দেখি না। দরজা একটুখানি ফাঁক করেই দোলার মা—এখন যাও, দোলার শরীর ভাল নেই বলে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই মহিলা চাকরি করতেন। সানগ্লাস চোখে দিয়ে অফিসে যেতেন বলে আপামর জনতা ওঁকে ঘুরে-ফিরে দেখত। দোলা ভাল নেই। কেন? ভাল হয়ে উঠে প্রথম দেখায় পার্কের এক কোণায় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দোলা। মুঠো-মুঠো চুল টেনে ব্যথা করে দিয়েছিল কপালে। জলভরা চোখ দিয়ে আমাকে মেরেছিল—বিচ্ছিরি, অসভ্য রাহুল, কেন তুমি ওই ছেলে দুটোর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে? জানো, ওরা কি করেছে?

রাইকিশোরীর সদ্যোদ্ভিন্ন বুক দুটির জোর করে ঘুম ভাঙাতে গিয়েছিল ওই দুই জানোয়ার, ভাঙা গুমটির দেওয়ালে দোলাকে চেপে ধরে। খুনসুটি করে, পরে শাসিয়ে—মাকে বলে দেব বলে। এক দিন নয়, পর পর সাত দিন।

আমি পুরোটা শুনতে পারিনি। দোলা, আমি জানতাম না, ভুল হয়ে গেছে—এই বলে অন্ধের মত দৌড়ে চলে এসেছি। মধুকে পাইনি। সেদিন

বিকেলে ত্রিদিবকে কলেজের পাশের রাস্তায় দেখে আমি মরিয়ার মত ওকে মারতে গিয়েছিলাম। তার পর ঠোঁটের ওপরে সেলাই, ভাঙা চশমা, রক্তমাখা শার্ট নিয়ে অনেক রাত করে বাড়ি ফেরা। হুলুস্থুল। ত্রিদিবের অন্য বন্ধুটি, নাম জানতাম না, বেশ ভাল ঘুঁষি চালায়। রোমিলা মাঝে মাঝে ঠোঁটের ওপর ওই কাটা দাগটাতে হাত দেয়—এটা কিগো? গোঁফের জন্য বাইরে থেকে দেখা যায় না। একটুখানি সূচ্যগ্র মাংসপিণ্ড ওখানে আজও উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যখন আমি ভেবেছি, আকাশে উড়েছি, তখনও আমি আসলে দোলার করতলের রক্তিম পরিমণ্ডলে ঘুরছি!

অনেক—আনক দূর থেকে আমি ডাকলাম—দোলা, এই দোলা! উত্তরে এল না।

ও কাচের বইরে তাকিয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় পাণ্ডুর আকাশ। বহু দূরে দিগন্ত ঘেঁষে কেরাণ্ডিমাল পাহাড়ের সিলুয়েট। কী বন্য চাঁদের আলো আজ! ওই পাহাড়ের পায়ের তলায় এক নদী আছে—শঙ্খ। এত দূর থেকে তাকে দেখা যায় না, তার ঘ্রাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু সে আছে। লেবেল ক্রশিংয়ের বাঁয়ে পড়ো একটা লাল দোতলা বাড়ি। তার জানলা দিয়ে সবুজ ফ্ল্যাগ মরণাপন্নভাবে ঝুলে আছে। এইমাত্র গুম গুম শব্দ তুলে হেঁটে গেছে গম্ভীর, সবুজ এক দীর্ঘ মালগাড়ি। এক্সপ্রেস গাড়ি আসবে, সেই জন্য এখন ক্রশিং উঠবে না নাকি। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে একটু দূরে গিয়ে বিড়ি ধরিয়েছে। গাড়ির মধ্যে আমি আর দোলা। আজ থেকে অনেক বছর আগে আমি, দোলা ও রেশম এখানে এসেছিলাম। অনর্গল কথা বলতে বলতে গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে গিয়েছিল রেশম। ওর ঝাঁকড়া চুলে-ভরা মাথাটা দোলার কোলে, পা-দুটো আমার কোলের ওপর।

লেবেল ক্রশিং ছাড়িয়ে ক্ষয়ে-যাওয়া রাস্তাটা জনকপুরের মোড় ছাড়িয়ে ডানদিকে বেঁকে গেছে। ডানদিকে ঘুরলে প্রথমে ঝুনঝুনওয়ালার কাচ ফ্যাক্টরির লম্বা হাতাধরা দেওয়াল। তার পর অনেকটা কাঁচা পথ, দু'পাশে ঝোপঝাড়, বাবলা ও শিরীষের গাছ ঝুঁকে পড়েছে। শেষে পথটা নির্বিকার একটা টিলার মাথায় উঠে গেছে। সেই পথ বেয়ে টিলায় চড়ে আমরা গোল গম্বুজ দেওয়া ভাঙা রাজবাড়ির চত্বরে গিয়ে পৌঁচেছিলাম। রাজবাড়ির দোতলার ছাদ থেকে শঙ্খনদীকে আবার দেখা যায়।

শঙ্খনদীর পুরনো ব্যারেজ রাজা ত্রিবিক্রম সিংহর আমলে সতেরশ বাইশে বানানো। ধপধপে জ্যোৎস্নায় নির্বিষ সাপের খোলসের মত পড়ে থাকা নদী আমাদের দিকে অকস্মাৎ তাকিয়েছিল। রেশম খেলা করে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে—ভাঙা বাড়ি, নিচু ছাদ—পড়ে না যায়, আর দোলা বার বার ওকে দেখার জন্য নদীর ধার থেকে মুখ ফেরাচ্ছিল। রাতের বাতাসে উড়ে যায় চুল ওর কপালে মুখে। সাদা খোলের শাড়িতে দোলার চন্দনরঙের শরীরকে মনে হচ্ছিল এক অশরীরী গাছ। সেদিন লেবেল ক্রশিংয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছিল আমাদের। দুই ট্রেনের মাঝে প্রায় পনের মিনিটের মত বিরতি। তবু

বুড়ো জেদি গেটম্যান দরজা খুলবে না—নিয়ম নেই। তাতে অবশ্য আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি। আমি ও দোলা দু'জনেই তখন ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্নে খেলা করছি।

ড্রাইভার বিড়ি শেষ করে এসে গাড়ির গিয়ারে হাত রাখল।

এক্সপ্রেস তো যায়নি এখনও, গেট খুলছে কী করে! মালখান, আমাদের চালক মুখ ফিরিয়ে হাসল।

পাঁচটা টাকা হাতে দিতেই গেট খুলে দিল।

যাক, তবে পঁচিশ বছরে এইটুকু বদলেছে।

নদীর দিকে তাকিয়ে দোলা বলে উঠল—রাহুল, তোমার মনে আছে, রেশম খেলে বেড়াচ্ছিল ওখানে! ওই তো, ওদিকটায়। তখন তুমি ছিলে, ভাস্বর ছিল, রেশম ছিল। আজ কেউ নেই আমার। তিন বছর আগে ভাস্বর মারা গেছে। রক্তচাপ, হার্টে ম্যাসিভ অ্যাটাক অফিসেরই মধ্যে। রেশম ফিলাডেলফিয়া থেকে ছুটে এসেছিল, মাসখানেক কাটিয়ে ফিরে গেছে। ওর বরের গ্রিন কার্ড। ওই বা কতদিন থাকবে! দোলা যে কোথাও যাবে না এই রঙ্গন পাহাড়ি ছেড়ে। এই পাহাড়, শঙ্খনদী, রঙ বদলাতে থাকা অরণ্য—এদের দিকে চেয়েই ওর জীবন কেটে যাবে।

আমি, রোমিলা, মিতুল—আমরা কলকাতাতেই থাকব। সকালে ঠাণ্ডা দুধে কর্নফ্লেক্স, রাতে স্টিরিওতে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল। মিতুল জানুয়ারিতে এলে ওকে চেকআপে নিয়ে যাব। রোমিলাকে গড়িয়াহাটে দুপুর-শপিংয়ে ছেড়ে আমার গাড়ি অন্যমনস্ক এলোমেলো ঘুরে বেড়াবে। দোলার পাশে খুব কাছে দাঁড়িয়ে আমি ওর চুলে হাত রাখলাম। ওর শরীরের ঘ্রাণ নিলাম। অথচ স্পর্শের ইচ্ছা জাগল না। আমাদের দু'জনের মাঝখানে যে অনির্বচনীয় সাঁকোটি আছে তার অন্য প্রান্তে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। যৌবনে দোলার হাতের আঙুলগুলির জন্যও কী রক্তরাঙা স্পৃহা ছিল আমার! কী তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল ওর সমস্ত শরীরের জন্য! আজ মনে হয়, কেবল ওর মনটিকে ছুঁয়েই আমি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।

নদীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দোলা আমার দিকে চাঁদের আলোমাখা মুখখানি তুলে ধরে বলল—তুমি কবে আসবে রাহুল? আর বেশি দিন নেই—দশ বছর, বড় জোর কুড়ি! এ জন্ম তো ফুরিয়ে এল, কী বল?

শঙ্খনদীর রেলব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছিল। থামগুলিকে আগে আগে ছুঁয়ে যাচ্ছিল ইঞ্জিনের আলো, পেছনে হাঁটছিল অন্ধকার।

আমার হঠাৎ মনে হল, ওপরে কোথাও যেন রোমিলা দাঁড়িয়ে। হাতে বাতি, আলো-ছায়া মাখা মুখের চারপাশে রুপোলি তারের মত চুল।

রোমিলা বলল—যাবে? যাও না—আমি আলো ধরছি।

সুজাতা মুখ নিচু ক'রে বসেছিল। টেবিলের ওপর কার চায়ের কাপের দাগ, কলমের কালিতে আঁকা হরফ, ছুরি দিয়ে নাম লেখার চেষ্টা—এই সব দেখছিল। পুরোনো টেবিল। সুজাতার বাঁ হাত খালি, সুদৃশ্যভাবে তার ওপর পাতিয়ে রাখা। ডান হাতে দু'গাছি প্লেন সোনার চুড়ি। তাও হাত খালি রাখলে মা খিটখিট করে বলে। বাঁ হাতে কেবল একটি পুরোনো হাত-ঘড়ি। মাসখানেক আগে সে নখ রেখে গোলাপী নখরঞ্জনী লাগিয়েছিল। এখন রং উঠে গিয়ে অসুন্দর বিবর্ণ প্রেক্ষাপট পড়ে আছে। আর আসার আগে ঐটুকু তার রিমুভার দিয়ে মুছে আসা উচিত ছিল—ভাবল সুজাতা। আর তক্ষুণি তার বড় দুঃখ হল, নিজের অদৃষ্টের ওপর দারুণ অভিমান—এই কি নখের রং নিয়ে ভাবাব সময় ?

পাশ থেকে, সুজাতা শুনতে পাচ্ছিল, উদ্বেল ভুঁড়ি সামান্য এগিয়ে দিয়ে নেপাল বসাক একনাগাড়ে বলে চলেছে, তা হলে বলুন স্যার, কমন ম্যানের কী অবস্থা ! আমাদের কোনো সিকুরিটি নেই। কেস করার মত মশলা নেই, আপনি বলছেন ? অথচ মেয়েটি, কী বলব, দেখতেই পাচ্ছেন—ইয়াং মেয়ে, সারারাত ঘুমোতে পারে না, ভয়ে চম্‌কে ওঠে, এই বুঝি…

সুজাতা ভুরু কুঁচকে নেপালের দিকে তাকাতেই সে থেমে গেল। গলা ঝেড়ে নিয়ে আবার হাঁ করতে যাচ্ছিল, তরুণের মেজমামা গম্ভীর গলায় বললেন—কিছু একটা করুন। অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গেলে তো আফসোস ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

সুজাতার ঠোঁট হাসল না, হাসল দুই চোখ। এবং হাসি চাপার চেষ্টায় তার ডান গালে টোলের আভাস দেখা দিল।

এই অফিসারটি যদি জানতে পারেন, মূল অভিযুক্তের মেজমামাই সুজাতাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, তাহ'লে ?

শানু আর তড়িৎ সুজাতাদের পাড়ার দুই বেকার সমাজসেবী নেপালের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। মালমশলা নেই, জোলো কেস—তাদের সব উৎসাহ উবে গেছে এতক্ষণে। দুজনে চটি ঘষে যাওয়ার জন্য উস্‌খুস্‌ করছে কিছুক্ষণ থেকেই। কিন্তু এরকম একটা জংশনে বেরিয়ে যাওয়াও সোজা নয়।

সেকেণ্ড অফিসার পুলক বিশ্বাস গা-ঝাড়া দিয়ে বসে ঘড়ি দেখলেন, তারপর সদ্য ঘুম ভাঙা বেড়ালের মতন শরীর টানটান করে হাত দুটো মাথার ওপর শেকল করে তুলে বললেন—আপাততঃ একটা প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করছি, ওয়াচ রাখা হবে—স্টেশনে ডায়েরী তো হ'ল। তারপর দরকার বুঝে কেস করা যাবে। মিহির, কেষ্টকে ডাক তো ?

একটি মাঝবয়েসী লোক বনবেড়ালের মত শিকারী ভঙ্গিতে দরজার পাশ দিয়ে ছায়ার মত সরে গেল। খাড়া নাক, গর্তে বসা চোখ, মাথার চুল ভাঁটার সমুদ্রের মত কপাল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ছিটের শার্টের নিচে পাজামা পরা। পুলক বিশ্বাস উঠে দাঁড়িয়ে পিঠচাপড়ানো হাসিতে সুজাতাকে বললেন, কেষ্ট সেন আপনাকে এসকর্ট করবে সারা দিন, এবার নিশ্চিন্ত?

চোখ দুটো ছোট করে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা ক'রে কেষ্ট সেন বললো, এটা ছেড়ে দিন না, পরেরটায় যাবো।

সুজাতা ঘাড় নাড়ল—এই নিয়ে তিনটে ছাড়লাম। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি যাচ্ছি, আপনি বরং পরেরটায় আসুন।

যাঃ, তা কখনো হয়! এত ভিড়—ঠেলাঠেলিতে এদিক ওদিক গুলি বেরিয়ে গেলেই…

কাল থেকে আপনার পিস্তলটা বাড়িতে রেখে আসুন। এত বাস ছাড়লে আমার চলবে না!

সুজাতা প্রায় দৌড়ে গিয়ে আগে বাসে উঠল। কেষ্ট সেন তার অব্যবহিত পেছনে জায়গা করতে গিয়ে গুঁতো খেল, পিছিয়ে গেল—এবং রয়েই যেত রাস্তায়, যদি বাস একটু এগিয়েই এক মহিলার চীৎকারে আবার না দাঁড়াতো। একটি ছোট মেয়ে পড়ো-পড়ো অবস্থায় পাদানিতে আটকে ছিল।

যেন কোমরে বাত অথবা টিউমার—এই ভাবে পিস্তলটাকে আগলে সামান্য বেঁকে কেষ্টকে দাঁড়াতে দেখে সুজাতা ভীষণ ক্লান্ত বোধ করল। ও সোজা হয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়ালো, যেন কেউ কোনোভাবে বুঝতে না পারে কেষ্টর সঙ্গে ওর সংস্রব আছে।

খানিকক্ষণ পরেই একটা গণ্ডগোলে ওকে ফিরে তাকাতেই হল।

উল্টোদিকে লেডিজ সীট খালি হয়েছিল একটা। তাতে বসে পড়েই সুজাতাকে ডেকেছে—এই যে এদিকে আসুন, জায়গা আছে।

সামনেই এক প্রৌঢ়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে। সঙ্গের যুবকটি গাঁট্টাগোট্টা, গালে কাপালিক-মার্কা দাড়ি।

এক থাপ্পড় মারব, উঠুন শীগ্‌গির—ইয়ারের জন্য জায়গা রাখা হচ্ছে! সামনে লেডিস দাঁড়িয়ে!

হে ভগবান! সুজাতা একেবারে লজ্জায় মরে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। লোকটা যেন তাকে না ডাকে আবার।

ওভাবে জায়গা রাখতে কে বলেছিল?

নেমেই সুজাতা ধমক দিল তার দেহরক্ষীকে।

আমি জায়গা না রাখলে কে রাখবে? আপনার দেখাশোনা, ভালমন্দ সবই তো এখন আমার।

কথা শুনলে গা জ্বলে যায়!

রাগ করে আগে আগে হাঁটছিল সুজাতা। বাড়ীর কাছে অক্রূর মিত্র লেন

যেখানে কাশীনাথ সেন স্ট্রীটে মিশেছে, সেখানে সন্ধের হ্যালোজেন আলোর আভা মেশা অন্ধকারে একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, আভাসে মনে হয় বলিষ্ঠ চেহারাই, মাঝারি হাইট, একটা হাত প্যাণ্টের পকেটে ঢোকানো, পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে ওদের দিকে…

ওর পকেটে কী ?

তরুণের একগাদা বখে যাওয়া বন্ধুবান্ধব—কেউ জুয়ার ঠেক চালায়, কেউ শেয়ারের দালালি করে। তাদেরই কেউ কি সুজাতাকে ওয়াচ করছে ?

লোকটা আচমকা পেছন ফিরতেই সুজাতা দু'পা পিছিয়ে গেল। ওর হাতের মুঠো ঠাণ্ডা, সারা শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। সেই অবস্থাতেই মরীয়ার মত পেছনে তাকাল সুজাতা। হাজার হোক, একটা পুরুষমানুষ সঙ্গে। রোগা-পটকা হলেও বুড়োহাবড়া নয় একেবারে। তার ওপর কোমরে একটা পিস্তল, প্রয়োজনে সেটা চালাতেও পারবে নিশ্চয়।

তাকিয়ে দেখল, কেষ্ট নেই। গলি ফাঁকা। লোকের যাতায়াত নেই বিশেষ এই জায়গাটাতেই কারণ অন্ধ গলি। লোকটা কি ভোজবাজির মতন উবে গেল, না, পালিয়ে গেল ভয়ে ? নাঃ, পুলক বিশ্বাসকে কালই গিয়ে ধরতে হবে—বদলে অন্য কাউকে দিন !

এই সময়েই কাশীনাথ সেন স্ট্রীটের দিক থেকে আসতে দেখা গেল কেষ্টকে। গোঁফে জল লেগে। একগাল হেসে যেন ভবভার মোচনের দায় থেকে মুক্তি পেয়েছে এমন মুখ করে বলল, আঃ, বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল—চলুন।

দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার অন্য হাতে একটা চেন, চেনের শেষপ্রান্তে একটা টেরিয়র তুরতুর করে মাটি শুঁকতে শুঁকতে ঘুরপাক খাচ্ছে। লোকটার শরীর কুকুরটাকে আড়াল করে ছিল এতক্ষণ।

কেষ্ট সেন বাড়ীর দরজার কাছ থেকে ফিরে গেল।

সাবধানে থাকবেন, রাতে কাউকে দরজা খুলে দেবেন না যেন, কেমন তো ? ভারী মায়াভ'রে বলে যাবার সময়। ওর উদ্বিগ্ন মুখ চোখ দেখে সুজাতার হাসি পায়। হাসি চেপে রাখতে গিয়ে গালের টোলটা বেরিয়ে পড়ে।

সদর দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে দেখে ওর আড়াই বছরের ছেলে বুবুনকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন সুজাতার মা।

বুবুনের একটা হাত খাটের বাইরে ঝুলছে।

রাতদিনের কাজের মেয়েটি দরজা খুলে দিয়েই আবার ঘুমোতে চলে গেছে।

সবাই ঘুমোয়, কেবল সুজাতা-ই বিনিদ্র।

আয়নায় নিজের চোখের নিচে গাঢ় হয়ে আসা কালি দেখে সুজাতা—ক্লান্ত মুখ, তেল না দেওয়া শুকনো খড়ের মতন চুল।

নতুন বিয়ের পর চোখমুখের অবস্থা অনেকটা এইরকম হয়ে থাকত।

তরুণের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসে বিয়ে করেছিল সুজাতা। কী ভালবাসা তখন তাদের, দুজনে দুজনকে চোখে হারায়। ক্রমশ দিন গেছে, তরুণ বদলেছে, ভাবগতিক পালটেছে ভালবাসার। পাঁচবছর পর আজ আবার সেই তরুণের হাত থেকে পালিয়ে বাপেরবাড়ীতে ঢুকেছে সুজাতা। ভাগ্যিস্ বাপের বাড়ীর দরজা খোলাই ছিল আর চাকরিটা ছিল! নাহ'লে যে কী হ'ত! ওদিক থেকে উড়ো চিঠি আসে, অফিসে উড়ো ফোন। তরুণ নাকি নজর রাখছে। কী যে লাভ হচ্ছে ওর নজর রেখে, তরুণই জানে। বাবা বেঁচে নেই, সুজাতা কিডন্যাপ্ড্ হ'লে কানাকড়িও ঠেকাবে না বাড়ীর লোক। ড্রাগের নেশায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে তরুণ। অফিস যাওয়াও বন্ধ করেছে মাস ছয়েক হ'ল। মালের কড়ির জন্য এখন সে ঘটিবাটি দেওয়ালঘড়ি—এমন কি সাঁড়াশি পেলেও বেচে দিতে পারে। বছর দুয়েক হ'ল সুজাতা একটি পয়সাও দেয় না। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না আর। তবু কত রাত ঘুমোয়নি সুজাতা—রাতে যদি জানলার বাইরে কেউ এসে দাঁড়ায়, যদি কেউ কড়া নাড়ে হঠাৎ! একটিও পুরুষমানুষ নেই এ-বাড়ীতে। হায়! কপাল চলেছে সুজাতার সঙ্গে সঙ্গে, নইলে এত লোক থাকতে কেষ্ট সেন-এর উদয় হবে কেন?

কত দেরী হয়ে গেল বেরোতে!

কেষ্ট এসেছে সাড়ে নটারও পরে। একটুখানি অপ্রতিভ হাসি মার্জারিনের মতন সারা গালে মাখানো।

ইস্, কী করলেন বলুন তো! এত দেরী করে? তিনটে ক্রশ পড়লে আজকাল হাফ্ সি-এল হয়, জানেন?

একটু চিংড়ি মাছ এনেছিলাম যে আজ! খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে ভাজতেই এক ঘণ্টা। ঘাড়ের কাছে একটা কালোমতন সুতো থাকে জানেন তো চিংড়ির, সেটা আবার বার না করলে···

চলুন চলুন, দেরী হয়ে যাচ্ছে!

সুজাতা কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে দৌড়োতে থাকে ত্রস্তা হরিণীর মতন—আপনাদের দেশে কি কালোজিরে ফোড়ন দেয়, না পাঁচফোড়ন—কেষ্ট পেছন পেছন আসছে কথা বলতে বলতে, মাঝে মাঝে হাতটা তুলে নাকের সামনে ধরে গন্ধ শুঁকে নিচ্ছে।

আমাদের জানেন তো, মানে আমার বাবার আর কি, একশো বিঘে ধান-জমি ছিল সুন্দরবনের কাছে, ধানবনেই চিংড়ি হত এত যে খেয়ে বিলিয়ে থই পাওয়া যেত না আর! এখন চল্লিশ টাকা কেজি মাছ কিনতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে!

সেই জমির কী হ'ল?

দৌড়োতে দৌড়োতেই জিজ্ঞেস করেছে সুজাতা।

এক্সচেঞ্জে তো আমরা জমি পেলাম এই নরসিংহপুরের কাছে, বুঝলেন—সেই জমি হাতিয়েছে আমার মেজ জ্যাঠার দুই ছেলে। আমি আর দাদা তো গোড়া থেকেই কলকাতায়। এখন মামলা চলছে কোর্টে, সিবিল কেস, ফয়সালা

হ'তে হ'তে আমি বুড়ো হয়ে যাবো। প্রত্যেক বছর ধানকাটার সময় ঝগড়া। আমার দুই জ্যাঠতুতো ভাই মহা বদমাশ, বাপের লেঠেল ছিল এক জমানায়। এখন ছেলেরা মস্তান পোষে। মাঝেমাঝেই ধমক দেয়, মামলা তুলে না নিলে খতম ক'রে দেবে!

তুলবেন নাকি মামলা?

পাগল!

অফিসের কাছে পার্কিং-লটের মাঝখানটায় একটা বড় গাছ, তার নিচে বসে পড়ে যত্ন করে একটি বিড়ি ধরায় কেষ্ট। স্নেহভরে হেসে বলে, যান যান, মন দিয়ে কাজ করুন। আমি আছি এখানে, দেখছি শুনছি। সুজাতার সঙ্গে ডিউটি হবার পর থেকে কেষ্টর দুপুরগুলোয় অফুরন্ত অবসর। উকিলের কাছে টুক্ করে চলে যাওয়া যায়। কেষ্ট সেনের তদ্বির তো আছেই—ব্যাপারটা যদি শুনানির স্টেজে এনে ফেলা যায় আর মাস দুয়েকের মধ্যে, তবে বছর খানেকের মধ্যেই জাজমেন্ট হয়ে যাবে নিশ্চয়ই!

তরুণের তরফ থেকে টেলিফোন, হাতচিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল আচম্কাই। শরীর খারাপ হয়ে পড়ায় জোরজার করে ওর দাদা নাকি হাসপাতালে ভর্তি করে এসেছে তরুণকে।

মেজমামা, তরুণেরই, একদিন এসে ঘুরে গেছেন এর মধ্যে। চা খেতে খেতে বলেছেন—আমি কবে থেকে বলছি, তোরা শুনছিলি না! কেমন ইম্প্যাক্ট হ'ল দ্যাখ!

সুজাতার গালে স্বাস্থ্যের আভা ফিরেছে, চোখের নিচের কালি ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছে। আজকাল সে অফিস যাওয়ার আগে আয়নার সামনে ঘুরে-ফিরে নিজেকে দেখে নেয়, নিপুণ হাতে সোজা সিঁথি কেটে বিনুনী বাঁধে, কোনো শাড়ি পর-পর দুদিন পরে যায় না।

ছটার মধ্যেই ঘুম থেকে ওঠা। সকাল আটটায় বুবুনের সারাদিনের দুধ ও খাবার নানা বোতল ও কৌটোয় ভরে ফ্রিজে রাখে, পাঁউরুটি টোস্ট করে, তার পর রুটি-তরকারী বানিয়ে টিফিনবক্সে ভ'রে নিজের ও কেষ্টর জন্য। বাইরের খাবার খেয়ে কেষ্টর অম্বলের মতন হয়ে যায় সন্ধের দিকে, আবার ওকে নিজে বানিয়ে আনতে হ'লে সকালে এক ঘণ্টা দেরী করবে, তাই এই ব্যবস্থা সুজাতাই চালু করেছে। এতে দুজনেরই সুবিধে।

বিস্তীর্ণ মাঠের পেছনে সূর্য অস্ত যায়। শ্রাবণের দিন শেষ। সারা সকাল বৃষ্টির পর মেঘভাঙা হলুদ আলোয় ভরে গেছে পথঘাট। অফিস ছুটির পর উপচে পড়ছে ভিড়।

কী যে পাগলের মতন সময় বাঁচানোর জন্য দৌড়োয় মানুষ! এই ঠেলা-ঠেলি, পাসের বাস্কে ওভারটেক্ করা! তারপর জ্যামে জড়িয়ে পেঁচিয়ে সবার আটকে থাকা—এই সব ভালো লাগে না সুজাতার!

অফিস থেকে বেরোনোর পর সে যেন টোকা মেরে দেহ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় ফাইলের ঘ্রাণ, দেওয়ালে লেগে থাকা পানের পিকের দাগ, যাবতীয়

সাংসারিক আবর্জনা। কেষ্ট বসে বসে পুরোনো কাগজ পড়ে একটা গাছের নিচে, সুজাতাকে দেখে হেসে উঠে দাঁড়াল, বলে, গন্ধ পাচ্ছেন ?

কীসের ?

কীসের আবার! আরে ভেজা মাটির, বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ! চলুন হেঁটে হেঁটে এগোই। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে বাসরাস্তা ও ট্রামলাইন পেরিয়ে আনমনে ঘাসের মধ্যেকার পায়ে-চলা-পথ ধরে চলতে থাকে সেই হলুদ আলো মেখে। সুজাতার আজ এ্যানুয়াল ইনক্রিমেণ্ট মঞ্জুর হয়েছে, অর্থাৎ পঁচিশ টাকা মাইনে বাড়ল। এসট্যাবলিশমেণ্ট-এর নৃপেনকে কম তেল দিতে হয়েছে এর জন্য ? তাও সেই সবচেয়ে আগে পেল, নৃপেন তাকে একদিন সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল, গর্বিতা সুজাতা যায়নি তবুও। তেল-নুন-মাখা সেদ্ধ মটর দুই ঠোঙা হাতে নিয়ে কেষ্ট আপনমনে বকবক করতে করতে চলেছে।

কাগজপত্র সব রেডি—বুঝলেন, পানুদা (কেষ্টর উকিল) বলছে হিয়ারিং করিয়ে দেবে পুজোর আগেই। আর হিয়ারিং হয়ে গেলে জাজমেণ্ট-এর জন্য চুপচাপ ওয়েট করব। এসব কেস তো আর চট্ করে ফুরোবার নয়! তারপর এ্যাপীল আছে—ফয়সালা হতে হতে পেনশন নেবার সময় হয়ে যাবে আমার।

দুটি লোক কিছুক্ষণ থেকেই ওদের পেছনে আসছিল, সুজাতা বা কেষ্ট কেউই দেখেনি।

একজন রোগা, ছাইরঙা সফারী পরা, মাথায় মিহি করে ছাঁটা চুল, তাকে দেখতে অনেকটা কম্যাণ্ডো গোছের, আরেকজন আদ্দির পাঞ্জাবি-পাজামা পরা, মোটা পৃথুল, বিরাট কাঁচাপাকা জুলপি। ষড়যন্ত্রকারী দুই নেকড়ে ও ভালুকের মতন এরা সুজাতার অফিসের সামনে একটি মারুতি হাজার-এ অপেক্ষা করছিল। তারপর গাড়ি রেখে পিছু ধাওয়া করেছে।

হয়তো মানুষ বাতাসে বারুদের গন্ধ পায়, তাই একসময় আচমকা পেছন ফিরেই কেষ্ট তাদের দেখল, তার মুখ থেকে কথা বেরোল না, যেন ভয়ে পাথর—হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে। কেষ্টর কোমরে আজ কেবল খোল, পিস্তল নেই!

সুজাতা একটু এগিয়ে গেছিল।

বলছিল, নৃপেন কেমন বদমাশ সেই কথা। কিছুক্ষণ কোনো সাড়া না পেয়ে সে-ও পিছনে তাকাল, কেষ্টর ভয়-পাওয়া পশুর মতন মুখচোখ দেখল। তারপর ভীত কণ্ঠে শুধোল, কী ব্যাপার ?

সফারী ততক্ষণে প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। দেখতে পেয়ে অতর্কিতে কেষ্ট সুজাতাকে জড়িয়ে ধরে গড়িয়ে গেল ঘাসের ওপর। সোঁদা ঘাস, বৃষ্টির গন্ধে চনমনে—সুজাতা নিঃশ্বাস ফেলারও সময় পায়নি। বারুদ ধোঁওয়া, ঘাসের ওপর দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার শব্দ এবং তার কনুই-এর ওপরে বাঁ হাতে অসহ্য যন্ত্রণা। গুলিটা কেবল চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেছে।

কেষ্ট ঘাসের ওপর শুয়ে। চোখ বন্ধ। ভয়ে মরেই গেছে যেন। তার সাদাটে মুখের দিকে তাকালে এই কথাই মনে হতে পারে, কিন্তু অন্যদিকে সে

প্রবলভাবে সুজাতার কোমর জড়িয়ে রেখেছে দু'হাতে। কোমরের ওপর কেষ্টর আঙুলের শিরা-ধমনীর দপ্‌দপ্‌ শোনা যাচ্ছে।

ডান হাতে আঁচল সামলে সুজাতা নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল—ছাড়ুন, অসভ্য কোথাকার!

ওরা কি গেছে? চোখ বন্ধ অবস্থাতেই কেষ্ট শুধোল তার ঘাসের বিছানা থেকে।

হ্যাঁ। সুজাতার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, সেই সঙ্গে অপমান-বোধও।

কেষ্ট দু-এক লহমা অপেক্ষা করে নিঃশব্দে উঠে বসে নিজের ফোলিও ব্যাগ থেকে ফার্স্ট এইড-এর সরঞ্জাম বার করল—টিংচার, তুলো, গজ, ব্যাণ্ডেজ, একটা ছোট কাঁচি।

দেখি, হাত দেখি!

নিপুণভাবে ক্ষতের ওপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বলল—এই চাকরিতে আসার আগে কম্পাউণ্ডারি করতাম। কিছু ভাববেন না, কাল সকালেই একটা এফ. আই. আর. করে দেব। আপনি তো আমার আপনজন—একেবারে মন খারাপ করবেন না। মাঝেমাঝেই অমন হয়—পেটের দায়ে চাকরি। ফার্স্ট এইড সব সময় সঙ্গেই রাখি!

ব্যাণ্ডেজটা মন্দ বাঁধেনি কেষ্ট। একটু টাইট অবশ্য, নিচে ক্ষতটা ছটফট করছে। করুক। সুজাতা বাঁ হাতটা বুকের কাছে ধরে আগে হাঁটতে হাঁটতে কেষ্টকে সস্নেহে বলল—পেছনে আসুন আমার।

———